জনম জনমকে সাথী

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

প্রথম প্রকাশ

…ার টাকা

'ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস'—মুদ্রাকর-শ্রীনিাইচরণ ঘোষ
১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাত৷

অভিমন্যু শিস্ দিচ্ছিলো।

জোরে নয়, মৃদুগুঞ্জনে। অধুনালুপ্ত অথচ বহুপরিচিত একটি গানের সুর। সুন্দর শিস্ দেয় অভিমন্যু, শিসের মধ্যে সুর যেন কথা কয়ে ওঠে। কবে কোথায় কার কাছে যে শিখেছিলো কে জানে, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই এটা ওর অভ্যাস।

মঞ্জরী অবশ্য বলে—'বদভ্যাস'। তার মতে শিস্ দেওয়াটা নিতান্ত সেকেলেপনা তো বটেই, এবং শালীনতারও বিরোধী। বলে, 'একালে কোনো ভদ্রলোকে কখনো শিস্ দেয়না।' অভিমন্যু তর্ক করেনা, হাসে, আর মঞ্জরীর খুব রাগের সময় একটু শিস দিয়ে ওঠে। মঞ্জরী আরো রেগে রেগে বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক একজন [illegible] উপযুক্ত বটে।'

অভিমন্যু বলে, 'তা আমি তো আর ছাত্রীদের সামনে শিস্ দিচ্ছিনা?'

'দিতে কতোক্ষণ? বদভ্যাস্ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয়—'

'এতোদিনেও যখন অতোদূর পৌঁছোয়নি, তখন তোমার শাসন কালে আর বেশী বাড়বে কি?'

'জানিনা, বিচ্ছিরী লাগে।'

অভিমন্যু আর মঞ্জরী।...বৌদিরা বলেন, 'জোড়ের পায়রা' প্রেমে প'ড়ে, অভিভাবকদের ভারিমুখকে অবহেলা ক'রে বিয়ে। তবুও সেই একান্ত মনোরমা সুন্দরী প্রিয়ার 'বিচ্ছিরী'-লাগা সত্ত্বেও, যখন-তখনই শিস্ দিয়ে ওঠে অভিমন্যু, স্বচ্ছন্দবিহারী আকাশচারী পাখীর মতো। কিন্তু তাই ব'লে তিনতলায় উঠে বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নীচের রাস্তার চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শিস্ দিয়েই চলেছে, অনেকক্ষণ ধরে দিচ্ছেই, এরকম কোনোদিন দেখা যায়না।

যেমন আজ দেখা যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে ওর যেন আজ আর কোনো কাজ নেই। হয়তো কাজ সত্যিই নেই, হয়তো আজ কলেজ ছুটি, তবু বেলা দশটার সময় যখন সমস্ত পৃথিবীর কর্ম্মচক্র উন্মত্তবেগে ঘুরছে, তখন এ কী অলসতার ভূতে পেলো ওকে?

জনম্ জনমকে সাথী

তবে সত্যি বলতে, অভিমন্যুর যথার্থ পরিচয় দিতে, না ব'লে উপায় নেই—অভিমন্যুর অলসতাতেই আনন্দ। একটি মেয়ে-কলেজে সপ্তাহে চারদিন ঘণ্টাদেড়েক ক'রে পড়িয়ে আসা ছাড়া আর কিছুই পারেনা ও, মাত্র যথেচ্ছ বই পড়া বাদে। অথচ কতো সুবিধে ছিলো ওর।

[illegible] বাড়ী গিয়ে ভাগ্নেভাগ্নীদের জ্বালিয়ে জামাইবাবুদের [illegible] হয়, এবং এরই মাঝখানে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী প'রে [illegible] গিয়ে গম্ভীরভাবে ছাত্রী পড়িয়ে আসে।
বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ এই অধ্যাপকটিকে ছাত্রীরা সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] করে।

পুর্ণিমা উঠে এসে পিছনে দাঁড়ালেন।
দাঁড়িয়ে রইলেন মিনিটখানেক।
দেখলেন, অভিমন্যু জানতে পারছেনা, একভাবে পথের দিকে [illegible]কে দাঁড়িয়ে শিস্ দিয়েই চলেছে। দেখে হাড় জ্বলে গেলো [illegible]মার। তিক্তস্বরে বললেন—'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিস্ দিচ্ছিস্? [ল]জ্জা করছেনা?'
প্রায় চমকে ফিরে দাঁড়ালো অভিমন্যু।
ফিরে দাঁড়াতেই সম্পুর্ণ দেখতে পাওয়া গেলো ওকে।
দেখতে পাওয়া গেলো ওর কাটাছাঁটা গ্রীসিয়ান-ছাঁদের মুখ, [illegible] চুলের নিখুঁৎ পারিপাট্য, মাজাঘসা শ্যামলা রঙের [illegible] ঔজ্জ্বল্য, লম্বা দোহারা গড়ন, অপ্রতিভ একটু হাসি।
মার ধিক্কারে অপ্রতিভ একটু হাসি হেসে ফিরে তাকালো [অ]ভিমন্যু। তারপর উত্তর দিলো:
'লজ্জা? কই, না তো?'
'লজ্জা করছেনা? তা করবে কোথা থেকে? লজ্জা তোর [illegible] থাকলে তো?'
'[illegible]! তাহ'লে তো জেনেই ফেলেছো।'
'[illegible]! আদিখ্যেতা রাখ্। বলি, তুই এতে [illegible]?'

অভিমন্যু মৃদু হাসলো।

'আমার মত দেওয়ার কথা উঠছে কোথা থেকে মা ? তুমি সেকেলে আছো এখনো। নাকে চশমা লাগিয়ে খবরের কাগজ তো পড়ো দেখি, জগতের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে টের পাওনা ?'

'হয়েছে হয়েছে, নতুন ক'রে আর আমাকে জগতের হাওয়া দেখাতে আসিস্‌নে তুই। যেদিনকে মাথার ওপর পাঁচটা গার্জেন থাকতে অম্লানবদনে এসে নিজের পছন্দকরা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে পেরিছিলি, সেইদিনই তো জগতের হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে, বুঝিয়ে দিয়েছিলি।'

বোঝা যাচ্ছে পূর্ণিমা দেবী মারাত্মক রকমের চটেছেন।

তবু অবোধের ভানই সুবিধে। তাই অভিমন্যু হাসে। বলে :

'আহা, সে তো গত কথা। এই তিন বছরে হাওয়া আর এগোচ্ছেনা ? নিথর হয়ে থেমে আছে ?'

'হ্যাঁ, এগোচ্ছে।'···রাগে হাঁপাতে থাকেন পূর্ণিমা দেবী···'ভদ্দর লোকের ঘরের বৌ থিয়েটার করতে যাচ্ছে! ওসব কথা পাগলা গারদের পাগলাকে বোঝাগে যা অভি, আমায় বোঝাতে আসিস্‌নে।'

'থিয়েটার নয় মা!'

'আচ্ছা আচ্ছা, নাহয় তোদের সিনেমা। তফাৎটা কি ? যার নাম ভাজাচাল তার নাম মুড়ি! আমি বলছি ওসব হবে না। তোদের কোনো কথায় থাকতে যাইনা ব'লে সাপের পাঁচ পা দেখিছিস্, কেমন ?'

'সাপের পাঁচ পা ? কই—মনে পড়ছে না তো!'

'চুপ কর্! চুপ কর্! একেবারে অসভ্য হয়ে গেছিস্। কিন্তু আমি বলছি, ওসব চলবেনা।'

মঞ্জরীর এই দুরন্ত সখটিকে সে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু এইমাত্র হঠাৎ আবিষ্কার করলো, স্ত্রীর সেই সখকে মনে মনে মোটেই সমর্থন করছেনা সে। অথচ তাকে বাধা দেবার শক্তিও বোধহয় অভিমন্যুর নেই।

কিন্তু কেন নেই?

বাধা দিতে গেলে মান থাকবেনা ভেবে? না বাধা দিতে যাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার ব'লে?

তা হয়তো শেষেরটাই।

আধুনিক-সমাজ স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টাকে নীচতা ব'লে, সেকেলেপনা ব'লে, নিন্দনীয় ব'লে ঘোষণা করে।

তবু।

তবু একবার সে-চেষ্টা ক'রে দেখতে ইচ্ছে হলো অভিমন্যুর।

এর আগে হয়নি, এখন হলো। মায়ের এই নিতান্ত বিচলিত অবস্থা দেখে মনের কোথায় যেন একটা অপরাধবোধ উঁকি মারলো। সত্যি, মার ওপরই কি কোনো কর্তব্য নেই তার? দায়িত্ব নেই তাঁকে সন্তুষ্ট রাখবার?

তরতর করে নেমে এলো নীচে।

বিনা ভূমিকায় বললো, 'মঞ্জু, তোমার সখ আর মিটলোনা মনে হচ্ছে। মার দেখছি ভীষণ আপত্তি, বড্ডো বেশী রাগারাগি করছেন।'

মঞ্জরী সকাল থেকে সাংসারিক নানা খুঁটিনাটি কাজ সেরে, সেই মাত্র স্নান করতে যাবার আয়োজন করছিলো। বেণী খুলে চুলগুলোকে ছড়িয়েছে, তখনো

জট-ছাড়ানো বাকি, আরশির সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় চিরুনি বুলোনোর অবসরে নতুন ক'রে নিজেকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো।

শুধু দেখছিলো বললে হয়তো সবটা বলা হবেনা, দেখছিলো আর মুহুর্মুহুঃ মুগ্ধ হচ্ছিলো। আরশিটাকে রূপালি পর্দা কল্পনা ক'রে দর্শকের দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা ক'রে বিভোর হচ্ছিলো।

তা সত্যি। 'সিনেমাস্টার' হবার মতো চেহারাখানি বটে!

রংটা অবিশ্যি খুব ফর্সা নয়, কিন্তু ময়লা রং 'স্টার' হবার পথ আট্‌কায় না। মুখ চোখ যে নিখুঁৎ! তাছাড়া চুল!

কী চুল তার!

এই ঢেউ-খেলানো চুলের গোছা এলিয়ে দাঁড়ালে—

কে জানে কিভাবে সাজতে হবে তাকে। সামান্যই ভূমিকা তার—গ্রাম্যবধূ নায়িকার একটি আধুনিকা বান্ধবী। মাত্র তিনটি দৃশ্যে তাকে দরকার। তবু কী রোমাঞ্চ!

ছেলেবেলা থেকে এই এক অদ্ভুত সখ মঞ্জরীর।

অন্ততঃ একবারের জন্যে দূর থেকে, দর্শকের আসনে ব'সে নিজেকে দেখবে। দেখবে কেমন দেখায় তাকে ঘুরলে-ফিরলে, কথা বললে। সেই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কী ভঙ্গি ফোটে চোখের তারায় আর ঠোঁটের ইসারায়। সে ভঙ্গি দেখে লোকে কী বলে।

ছাত্রী-জীবনে স্কুলে কলেজে অভিনয় করেছে ঢের, কিন্তু তাতে আমোদ আছে, রোমাঞ্চ নেই। সে অভিনয় নিজের চোখে দেখে যাচাই করা যায়না।

কিন্তু স্কুলে কলেজে উৎসব-অনুষ্ঠানে অভিনয় করা, এক, আর পর্দায় নামা এক। গৃহস্থঘরের মেয়ে, রক্ষণশীল গৃহস্থঘরের বৌ, বিয়ের আগে একটু পূর্ব্ব-রাগের সুযোগই নাহয় জুটেছিলো, তাই ব'লে এ [illegible]

মেটবার সুযোগ জুটবে এমন আশা করা যায়না।

তবু জুটেছে সুযোগ।

ভাগ্যের দাক্ষিণ্য।

মঞ্জরীর বড়ো জামাইবাবু বিজয়ভূষণ মল্লিক পয়সাওলা লোক, হঠাৎ তাঁর খেয়াল চেপেছে—সঞ্চিত সেই পয়সাকে সহস্রগুণ ফাঁপিয়ে তোলবার। অতএব আর কি!

সিনেমার প্রযোজক।

প্রযোজক যদি বায়না ধরে ছোট্ট একটি 'রোলে' নতুন একটি মুখকে নিতে হবে, পরিচালক পারে সে বায়না উপেক্ষা করতে? আর ছোট্ট শ্যালিকাটি যদি জামাইবাবুর কাছে নিতান্ত না-ছোড়, এমন একটি বায়না ধরে যা পূরণ করা তাঁর হাতের মধ্যে, তাহ'লে—জামাইবাবুরই কি সাধ্য আছে তাতে 'না' করবার?'

অবিশ্যি তিনি এই সর্তে রাজী হয়েছেন যে, মঞ্জরীর শ্বশুরবাড়ীর এবং শ্বশুরপুত্রের খোসমেজাজ অনুমতি থাকলে তবে।

মঞ্জরী বলেছে সে ভার তার।

মঞ্জরীর দিদি সুনীতি বলেছিলো, 'কক্‌খনো ওদের মত হবেনা, দেখিস্।'

বিজয়ভূষণ বলেছিলেন, 'আহা, ও কি আর তোমাদের মতো? 'লভ্' ক'রে বিয়ে করেছে, ওদের কথাই আলাদা। মত পাবে সে সাহস আছে।'

অনেক বড়ো ভগ্নীপতি, মঞ্জরীকে হামা দিতে দেখেছেন, দিদির ছেলেমেয়েরাই খেলার সাথী ছিলো মঞ্জরীর, কাজেই শ্যালিকাকে ভদ্রলোক 'তুই-তোকারি' ক'রে থাকেন।

জনম্ জনমকে সাথী

মঞ্জরীরও তাই যথেচ্ছ আবদার।

বিজয়বাবু বলেছেন তিনি আজ সন্ধ্যায় আসবেন

জট-ছাড়ানো একবার স্টুডিওতে নিয়ে যেতে, সেখানে অভিনেতা বৃন্দ নেত্রীদের সকলের সামনে নির্ব্বাচিত বইটি পড়া হবে। হেসে বলেছেন, 'তাছাড়া—ভায়রা-ভায়ার সই নিয়ে যাবো। ও যে শেষ-কালে বলবে "বুড়ো আমার বৌকে ফুস্‌লে বার ক'রে নিয়ে গেছে," তার মধ্যে আমি নেই বাবা! অভিমন্যু খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে সই ক'রে দেবে—এ ব্যাপার আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি, তবেই আমি তোকে গাড়ীতে তুলবো।'

মঞ্জরী অভিমন্যুকে ব'লে রেখেছে এ-কথা।

অভিমন্যু অবশ্য বলেছিলো, তুমি সাবালিকা।

তবু মঞ্জরী নিশ্চয় জানে, জামাইবাবুর এই ঠাট্টার ছলে বলা কথার কিছু অর্থ আছে। তাই মুচকে হেসে বলেছিলো, 'মেয়েরা আবার সাবালিকা হয় নাকি? তারা তো চিরবালিকা।'

এসব গত রাত্রের কথা!

সকালে তো মঞ্জরী আছে নিজের মনে, অভিমন্যু আছে নিজের মনে। চা খাবার সময় ছাড়া দেখাই হয়নি ছ'জনে। শুধু মঞ্জরী মনে রেখেছে—সন্ধ্যাবেলা জামাইবাবু আসার কথাটা আর-একবার মনে করিয়ে দিতে হবে অভিমন্যুকে।

মন ভাসছিলো প্রজাপতির পাখায় ভর ক'রে।

তেমনি হাল্‌কা, তেমনি থরো থরো কম্পনে।

এমনি সময়ে অভিমন্যুর এই প্রতিবাদের হাতুড়ীর ঘা!

অভিমন্যু যদি বলতো 'আমার কেমন ভালো লাগছেনা,' মঞ্জরী গলে দ্রব হয়ে সেই ভালো না-লাগাকে ভালো লাগিয়ে ছাড়তো। কিন্তু এ যে অসহ্য!

এতোদূর এগিয়ে, এতো আশায় মুখ দেখে, সহসা এহেন বিরক্তি-কর কথায় আপাদমস্তক জ্বলে গেলো মঞ্জরীর

চিরুনিটা চুলে আট্‌কে ভুরু কুঁচকে বললে, 'তোমার মা বুঝি এই প্রথম শুনলেন ?'

অভিমন্যুর কাছে এ ভ্রূকুঞ্চন অপ্রত্যাশিত নয়। তৈরী হয়েই এসেছে সে। মৃদু হেসে বললে, 'তা অবশ্য নয়। তবে প্রথমটায় বোধহয় বিশ্বাস করেননি।'

'কেন ? এমনই একটা অবিশ্বাস্য কথা ?'

'তা অবশ্যই।'

'ও। তাহ'লে সেটা কথার সূচনাতেই ব'লে দাওনি কেন

'তখন ভাবিনি, মা এতো বেশী 'আপসেট্' হয়ে যাবেন।'

'ভাবোনি কেন ? ভাবা উচিত ছিলো। নিজের মাকে চেনোনা এমন নয়।'

অভিমন্যুর মুখটা ঈষৎ আরক্ত দেখায়, তবু সহজকণ্ঠে বলে, 'নিজেকেই চিনিনা, তা—মাতা ভগ্নী জায়া।'

'বুঝিছি। নিজেরই এখন ইয়ে হচ্ছে, তাই সেই অনিচ্ছেকে মার আপত্তির ছদ্মবেশ পরিয়ে—'

সহসা হেসে ওঠে অভিমন্যু।

রীতিমত শব্দ ক'রে হেসে ওঠে।

'হঠাৎ এতো বড়ো বড়ো কথা ব'লে ফেলছো কেন ? স্টুডিওর বাবার নামেই স্টেজের হাওয়া গায়ে লাগলো না কি ? মা সেকেলে মানুষ, বাড়ীর বৌ মেয়ে থিয়েটার সিনেমা দেখতে যাচ্ছে শুনলেই অপ্রসন্ন হয়ে ব'সে থাকেন, সেটা করতে যাচ্ছে শুনলে রাগ করবেন এটা কি খুব অস্বাভাবিক ?'

জনম্ জনমকে সাথী
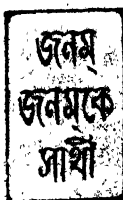
'আচ্ছা স্বীকার করছি খুব স্বাভাবিক তিনি। সর্ব্বদাই স্বাভাবিক কাজ করছেন। কিন্তু কি আর করা যাবে?'

অপমানে আহত অভিমন্যু তবুও শেষ চেষ্টা দেখে।

আহত হয়েছে এভাব দেখায়না, অবহেলাভরে বলে, 'করবার সবই আছে হাতে। বিজয়বাবু এলে ব'লে দেওয়া যাবে, মার ভীষণ আপত্তি।'

আর একবার দ্বিতীয় রিপুর বিদ্যুৎ প্রবাহ।

শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

অভিমন্যু যদি মুস্কিলে পড়ার ভঙ্গিতে ওর কাছে পরামর্শ চাইতো, 'বলো দিকি বিজয়বাবুকে কি বলা যায়?' তাহ'লে হয়তো এমন দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে উঠতোনা। কিন্তু ওর এই অবহেলার ভঙ্গি অসহ্য!

মঞ্জরী যেন মানুষ নয়, তার 'কথা দেওয়ার' কোনো মর্য্যাদা নেই যেন!

আবাল্যের সাধ চুলোয় যাক্। মান-মর্য্যাদার প্রশ্নই প্রধান।

তাই এবার আরশির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিরুনিটা বাগিয়ে ধ'রে মঞ্জরী স্থিরস্বরে বলে, 'না, তা হয়না। আমি কথা দিয়েছি।'

'কি আশ্চর্য্য! এর আবার কথা দেওয়া-দিইর কি হলো?'

'হয়েছে।'

'হলেও অবস্থাটা তিনি বুঝবেন। বাঙালীর ঘরের ছেলে তো, আমিই নাহয় ব'লে দেবো।'

'না।'

এই একাক্ষরী সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদের পর আর কথা চলেনা, অন্ততঃ অভিমন্যুর মতো অভিমানী স্বামীর পক্ষে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সেও তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে চলে যায় স্নানের উদ্দেশ্যে। একটু আগে ভাবছিলো আজ আর কলেজে যাবেনা, প্রস্তুত হয়ে বেরোবার গা আসছিলোনা। ঝট্ ক'রে মত বদলালো।

নিটোল সুন্দর স্বচ্ছ কাচের বাসনখানা ভিতরে ভিতরে একটু চিড় খেলো।

বিজয়বাবু দরাজ-গলায় বললেন, 'কই, যে শালা অনুমতিপত্র সই করবে সে কই?'

'আঃ! আপনি আর জ্বালাবেননা। আমি যেন নাবালিকা!'

সুনীতি এসেছে সঙ্গে।

সে বললো, 'নাহয়, মস্ত সাবালিকা তুই। কিন্তু গেলো কোথায় সে? আমরা আসবো জানেনা?'

'জানবেনা কেন! বেছে বেছে ঠিক আজকেই ওর কলেজ-লাইব্রেরীর মীটিং!'

'বলি, তার আপত্তি-টাপত্তি নেই তো?'

'থাকলেই-বা শুনছে কে?'

সুনীতির মনে সায় নেই। সে নিজের বরকে বকতে বকতে এসেছে, বোনের বরকে নিন্দাবাদ করেছে। এতো ফ্যাসান ভালো নয়, এই হচ্ছে তার মত। আশা করছিলো, শেষ পর্য্যন্ত হয়তো এসে শুনবে অভিমন্যু নিষেধ করেছে। কিন্তু সে আশা ভঙ্গ হলো। কে জানে এ-সখের ফল কি হবে। শেষ পরিণাম কোথায় গিয়ে পৌছোবে। আত্মীয়-স্বজন হয়তো নিন্দায় শতমুখ হবে। আর এইসবের জন্যে দায়ী করবে তারই স্বামীকে। এ কী ঝঞ্ঝাট সেধে ডেকে আনা।

জনম্ জনমকে সাথী

অভিমন্যুটাও কি তেমনি ?

এ-যুগের ব্যাপারই এই।

আধুনিক হবার নেশায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ব'সে আছে সবাই।

সুনীতিদের ছেলেবেলায়—কী কড়াকড়িই ছিলো! অথচ কি এমন যুগ-যুগান্তরের কথা সেটা। বেচারা সুনীতি, লেখাপড়া করবার কতো ইচ্ছে ছিলো তার! কিন্তু ক্লাশ নাইনে উঠেই স্কুল ছাড়তে হলো তাকে, বড়ে হয়ে যাবার অপরাধে। ছাড়াবার সময় অবশ্য একবার প্রস্তাব উঠেছিলো, বাড়ীতে একজন 'বুড়োসুড়ো' মাষ্টার রাখবার, কিন্তু সংসারের আর পাঁচটা সাধুপ্রস্তাবের মতোই সে প্রস্তাবও তলিয়ে গিয়েছিলো বিস্মৃতির অতল তলে।

তারপর বছর-দুই কোথা দিয়ে যে কাটলো! মায়ের শরীর খারাপের ধাক্কায় যাবতীয় সংসারের কাজ পড়লো ঘাড়ে। অতঃপর জন্মালো মঞ্জরী। কিশোরী সুনীতিকে নিতে হলো মায়ের 'আঁতুড় তোলার' দায়িত্ব। তখন তো আর এমন হাসপাতালে যাওয়ার রেওয়াজ ছিলোনা ? রক্ষণশীল ঘরের বধূ কন্যারা ভাবতেই পারতোনা সে-কথা।

মঞ্জরী হামা দিতে শিখতে না-শিখতেই বিয়ে হয়ে গেলো সুনীতির। মনে আছে, শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় কেঁদে ভাসিয়েছিলো বেচারা বোনটিকে কোলে ক'রে। সত্যি বলতে কি, দিদি জামাইবাবুর আদরের প্রশ্রয়েই আরো মঞ্জরী এতো দুঃসাহসিক।

জনম্
জনমকে
সাথী

সুনীতিই বাপ মাকে ব'লে-ক'য়ে ওকে কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলো। বলেছিলো, 'আমাদের তো হলোনা, তবু ওর হোক্।' হ্যা, অনেক ছাড়পত্র আছে মঞ্জরীর দিদির কাছে।

কিন্তু তাই ব'লে এতোটা। বোনের সিনেমায় নামার বদখেয়ালটা বরদাস্ত হচ্ছেনা সুনীতির, আর শেষ পর্য্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ছে অভিমন্যুর উপর।

মঞ্জরী সাজসজ্জা সুরু ক'রে দেয়, সুনীতি এদিক-ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলে, 'তোর শাশুড়ী-বডিকে দেখলামনা তো? কোথায়?'

মঞ্জরী গম্ভীরভাবে বলে, 'আমার ওপর চটেমটে মেয়ের বাড়ী চ'লে গেছেন।'

'সর্ব্বনাশ করেছে! যা ভেবিছি তাই! ভাবছিলাম, বুড়ি থাকতে এসব চালাচ্ছে কি ক'রে? এখন উপায়?'

মঞ্জরী গলার হারটা বদ্‌লে আর-একটা পরতে পরতে বলে, 'বুড়োবুড়িরা তো চিরকালই থাকবে বড়দি! তারা গত হ'লে পরবর্ত্তীকাল আবার বুড়ো হবে। তাহ'লে সমাজে নতুন কিছুই চলবেনা?'

'তোদের সঙ্গে তর্কে পারি এতো বিদ্যে আমার নেই।'

বিজয়বাবু বলেন, 'এই ত্থাখো! মেয়েটা যাচ্ছে একটা শুভকাজে, আর তুমি প্যান্‌প্যান্ করতে লেগে গেলে? কি একেবারে পাপকাজ করছে যেন! দোষটা কি?'

'না দোষ নয়, খুব গুণ।'

ব'লে বেজার মুখে ব'সে থাকে সুনীতি।

বিজয়ভূষণের সঙ্গে তর্কে জিতবে সে সামর্থ্যও [illegible]র নেই। তর্কই চলেনা তাঁর সঙ্গে। জীবনভোর [illegible]ষ্টা ক'রে এলো সুনীতি, স্বামীকে আর কোনোদিন [illegible]রিয়স্' ক'রে তুলতে পারলোনা। জগতের অন্ধকার
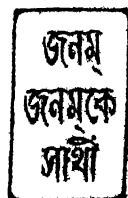
দিকটা তিনি যেন দেখতেই পাননা। জোর ক'রে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে হেসে ওড়ান।

অভিমন্যু যদি স্ফূর্তিবাজ তো, তিনি ভোলানাথ।

কিন্তু স্ফূর্তিবাজ অভিমন্যুর ভিতর থেকে দেখা দিয়েছে আজ এক কঠিন মূর্তি, তাই না মঞ্জরীর এতো রাগ অভিমান। এই তো আজন্ম দেখে আসছে, দিদি কতো যা-খুশি করে, কই, জামাইবাবু তো কখনো কঠিন হন্‌না!

সেবারে দু'বছরের কচি ছেলেটাকে ফেলে রেখে সুনীতি যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে কেদারবদরী চলে গেলো, ঘরে-পরে কেউ আর নিন্দে করতে বাকি রাখেনি। বিজয়ভূষণের কিন্তু অতাত শরীর!

মঞ্জরীই যখন দিদির অন্যায় নিয়ে জামাইবাবুকে বলতে গিয়েছিলো, বিজয়ভূষণ সহাস্যে বলেছিলেন, 'যেতে দে ভাই যেতে দে! তোর দিদির স্বর্গের সিঁড়ি গাঁথা হ'লে আমারও কিছু আশা রইলো। আঁচলের ডগায় বেঁধে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে না নিয়ে যাবে কি? 'টোয়েন্টি-ফোর-আওয়ার্সের সার্ভেন্ট' একটা না থাকলে স্বর্গসুখের খানিকটা সুখ কমে যাবে যে!'

'থামুন আপনি।' বকে উঠছিলো মঞ্জরী, 'আর এই খোকাটার অবস্থা? ঝি-চাকরের কাছে আবার অতোটুকু ছেলে ফেলে রেখে যায় লোকে? দুর্দ্দশার একশেষ হচ্ছেনা?'

জনম্ জনমকে সাথী

'আহা-হা, আমার ওপর অতোটা অবিচার করিস ভাই!' বলেছিলেন বিজয়ভূষণ, 'আমি বাপ হয়ে দুর্দ্দশার একশেষ করছি, এটা কি মুখের ওপর ব. ভালো। বলবি নাহয় আড়ালে বলবি।'

'আড়ালে বলতে আমার দায় পড়েছে। যা বলবো সামনে।'

'তা বটে। তোরা যে আবার আধুনিকা। কিছু রেখে-ঢেকে মিষ্টি ক'রে বলা তোদের আইনে নেই। যাক্, একটা ভালো হলো, এই দু'মাসে শিশুপালন-পদ্ধতিটা শিখে নেবো।'

এই হচ্ছেন বিজয়ভূষণ।

একেই বলে স্বামীর মতো স্বামী! তা নইলে স্ত্রী যতোক্ষণ স্বামীর এবং তার গোষ্ঠিবর্গের মতানুবর্ত্তিনী হয়ে চলতে পারলো ততোক্ষণই ভালোবাসার জোয়ার বইতে লাগলো, অন্যথায় মুহূর্ত্তে ভাঁটা—একে কি আর প্রেম বলে?…

উপরোক্ত কথাগুলি ভাবতে ভাবতে জোরে জোরে মুখে স্নো ঘষতে থাকে মঞ্জরী।

অতঃপর মঞ্জরী সাজসজ্জা সেরে চাকরটাকে যথাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিয়ে দিদি জামাইবাবুর আগে আগে গট্‌গট্‌ ক'রে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে।

প্রযোজক নতুন, কিন্তু পরিচালকটি অভিজ্ঞ।

বই প'ড়ে তিনি অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশদ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তাদের ভূমিকা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু মঞ্জরী যেন বারে-বারেই মনের খেই হারিয়ে ফেলছিলো। যেসব অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবির পর্দ্দায় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, অভিভূত হয়েছে, তাঁদেরই কয়েকজনকে নিতান্ত কাছে থেকে দেখতে দেখতে উৎসাহ যেন স্তিমিত হয়ে পড়ছে।

জনম্ জনমকে সাথী

এই তো মনীশ চৌধুরী কিছুদিন আগে কি একটা ছবিতে এক ভাবেভোলা আত্মহারা গায়কের পার্ট ক'রে কী নামই-না করেছিলো। তিন-তিনবার

সে ছবিটা দেখেছে মঞ্জরী, শুধু মনীশ চৌধুরীর জন্যেই। দেখেছে আর মনে হয়েছে, এ যেন সাধারণ জগতের জীব নয়, কোনো ভাবলোকের। সেই মনীশ চৌধুরী হরদম ব'সে ব'সে সিগারেট খাচ্ছে, তার ফাঁকে ফাঁকে ডিবে খুলে পান খাচ্ছে আর মুঠো মুঠো জর্দ্দা খাচ্ছে!

ছিঃ!

আর এই কাকলী দেবীই বা কি!

চোখে একরাশ কাজল, গালে বড়ো বড়ো ব্রণ, বিশ্রী রংচঙে শাড়ী ব্লাউজ পরা, দেখলে বিশ্বাস করা যায় ও সাজবে একটি পতিগতপ্রাণা বিলাসলাস্যবর্জ্জিতা সরলা গ্রাম্যবধূ?

আশ্চর্য্য!

সর্ব্বত্রই কি একেবারে কাছাকাছি এলেই মোহভঙ্গ হয়ে যায়? কি ঘরে, কি বাইরে।

'কই, কি হচ্ছে? আপনি মন দিয়ে শুনছেন কই?'

ধুরন্ধর পরিচালক তীক্ষ্ণ কটাক্ষে প্রযোজকের শ্যালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কোমল অভিযোগ করেন।

'এখানটা আপনারই ভালো ক'রে শোনা দরকার। মনে রাখুন, বইয়ের হিরোইন শিউলী আপনার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর অল্পবয়সে পল্লীগ্রামে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বেশী লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। শ্বশুরবাড়ীতে লক্ষ্মী বৌ, রান্না করে, কুটনো কোটে, বাটনা বাটে, পুকুরঘাট থেকে জল আনে, সকলের সেবা যত্ন করে। আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ আপনি—মানে আর কি, কলেজের মেয়ে 'শিখার' ভূমিকায় আপনি—কি খেয়ালে গিয়ে

জনম্ জনমকে সাথী

হাজির হলেন শিউলীদের গ্রামে।…গিয়ে দেখলেন
এসেছে ঘড়ায় ক'রে জল নিতে।…দেখে আপনার
বাল্যসখীর উদ্দেশে স্ত্রীপুরুষের সাম্য ও নারীর স্বাধী
খানিকটা ঝাঁঝালো বক্তৃতা, এবং তার উত্তরে হিরোইনে
উক্তিতে ব্যঙ্গহাস্যে সবেগে প্রস্থান। বিশেষ কিছু খাটুনি নেই
আপনার, শুধু—'

মঞ্জরী ক্ষীণস্বরে বলে, 'শুধু ওই একটা দৃশ্যেই ?'

'না, না, আরো দু'বার দেখানো হবে আপনাকে, হিরোইনের
বক্তব্য শোনানোর প্রয়োজনে। মানে আর কি—মূল বইতে এই
শিখা' চরিত্রটা ছিলোনা, হিরোইনের চরিত্র ফোটানোর জন্যেই—'

সুনীতি অবশ্য স্টুডিওতে আসেনি, পথেই তাকে বাড়ীতে নামিয়ে
রেখে আসা হয়েছিলো। ফেরার সময় একা বিজয়বাবুর সঙ্গে।

বিজয়বাবু সোৎসাহে বলেন, 'যা দেখলাম, কিছুই নয়! ও
ই দিব্যি উৎরে যাবি। কি বলিস্ ?'

মঞ্জরী ফিকে হাসি হেসে বলে, 'কি জানি !'

'কিছুই নয়' বলেই তো তার উৎসাহ ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে।
া যে 'কিছু একটা' দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলো, চেয়ে এসেছে
বরাবর। ছোট্ট একটি ভূমিকাতেও সে রাখতে পারতো তার প্রতিভার
স্বাক্ষর। কিন্তু এমনি তার ভাগ্যদেবতার পরিহাস যে, এমন ভূমিকা
কে দেওয়া হলো যেটা গ্রন্থকারের সৃষ্ট চরিত্রই

বইয়ের কাহিনীতে সে ফালতু, শুধু নায়িকার
কে ফোটাতে তার প্রয়োজন। উজ্জ্বল ছবির
ন মসীলিপ্ত পৃষ্ঠপট।

জনম্
জনমকে
সাথী

সে ছবিটা পটের মূল্য বোঝবার ক্ষমতা জন্মায়নি মঞ্জরীর, তাই চিরদিনের আর ধি মেটবার স্থযোগ পেয়েও খুঁতখুঁতে মন নিয়ে ব'সে থাকে।

নানা কথা কইতে কইতে বিজয়ভূষণ একসময় বলেন, 'ব্যাপার কি বল্ তো? মনে আর তেমন ফূর্ত্তি দেখছিনা কেন? দেখে-শুনে ঘাবড়ে গেলি নাকি? তাহ'লে বাপু এখনো বল্!'

মঞ্জরী চাঙ্গা হয়ে বসে।

এক ফুৎকারে নিজের মনোবৈকল্য এবং বিজয়ভূষণের সন্দেহ নস্যাৎ ক'রে দিয়ে ঠোঁট উল্টে বলে, 'হ্যাঁ, ঘাবড়ে না আরো কিছু। ভারী তো!'

'তাইতো ভাবছি। ও যা পার্ট, ও তো তোদের কাছে অভিনয়ই নয়। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ওই শিখা না কি! ওর মতো তাল ঠুকেই তো আছিস্ তোরা।'

মঞ্জরী হেসে ফেলে বলে, 'তাই বৈ কি! কতো ভেবে চলতে হয় তা জানেন? এখন এই ভাবনা হচ্ছে—শাশুড়ীঠাকুরাণী তো রেগে লাল হয়ে ব'সে আছেন, এখন—'

বলা বাহুল্য এ-কথাটা এইমাত্রই মনে উদয় হয়েছে মঞ্জরীর। তবে ভাবনারূপে নয়, কথা বলবার উপায় হিসেবে।

বিজয়ভূষণ এ মনস্তত্ত্বের ধার ধারেন না, চলন্ত গাড়ীর মধ্যে অট্টহাস্য ক'রে উঠে বলেন, 'এখন কি ক'রে তাঁকে 'কালো' ক'রে তুলতে সক্ষম হবে, তাই ভাবছো তাহ'লে?'

গাড়ী এসে দরজায় থামে।

নীচের তলার ভাড়াটেদের ছেলেটা বসে সিঁড়ির কাছে, চাকরটা ছিলো তার পাশে। দিন হ'লে কিছু প্রশ্ন অন্ততঃ করতো। আজ

বাক্যব্যয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে তর্‌তর্‌ ক'রে উপরে উঠে গেলো মঞ্জরী।

উঠে গিয়ে দেখলো যথারীতি টেবলের উপর খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে, যথারীতি খাটের কাছে টুল টেনে তার উপর টেবলল্যাম্পটা বসিয়ে একখানা বই হাতে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে আছে অভিমন্যু।

বিরক্ত মনের অবস্থায় হঠাৎ কেন কে জানে ঐ দৃশ্যটা ভারী ভালো লাগলো মঞ্জরীর। তবে নাকি মান খোয়ানোর প্রশ্ন! তাই অভিমন্যুর সঙ্গে কথা না কয়ে শুধু গম্ভীরভাবে বিছানার একধারে গিয়ে বসলো।

বইয়ের নীচে থেকে একবার কটাক্ষপাত করলো অভিমন্যু।

মঞ্জরী বললো, 'মা ফেরেন্‌নি?'

'ফিরেছেন।'

যাক্‌ বাবা! তাহ'লে অন্ততঃ মঞ্জরীর অপরাধের গুরুত্বটা কিছু হ্রাস হয়েছে।

ঈষৎ নড়েচড়ে ব'সে মঞ্জরী সন্ধির সুরে বলে, 'তুমি গিয়ে নিয়ে এলে বুঝি?'

'না তো কি নিজে এসেছেন ব'লে আশা করো?'

আশা?

সহসা অভিমানে চোখের কোণে জলের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মঞ্জরীর ভাগে একটা নিতান্ত অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকা পড়ায় যে অভিমানের মেঘ সঞ্চিত হয়ে উঠছিলো জামাইবাবুর উপর, সেই মেঘটাই ঝরে পড়তে চায় অসতর্কতার অবকাশে।

'আমার আবার আশা! কারো কাছেই কিছু

আশা করবার নেই আমার। চিরদিনের একটা সাধ ছিলো—'

বইটা মুড়ে পাশে রেখে দেয় অভিমন্যু।

হাতটা বাড়িয়ে অভিমানিনীকে কাছে টেনে নেয়।

দেখে আপাততঃ মনে হয় মসৃন সুন্দর কাঁচের বাসনখানার গায়ের সেই কালো দাগটা, একটা দাগই শুধু। চিড় খাওয়া নয়।

আর সকালে দু'জনকে দেখে মনে হয় নতুন ক'রে বুঝি প্রেমের জোয়ার এসেছে দু'জনের প্রাণে।

পূর্ণিমা দেবী বিরক্ত চিত্তে ভাবেন, ছেলেটা কি অপদার্থ! দু'দিন একটু শক্ত হয়ে থাক্? তা নয়, গলে যাচ্ছেন একেবারে। ছিঃ!

গতকাল অভিমন্যু দিদির বাড়ী গিয়ে কুপিত জননীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। বৌয়ের হয়ে অবশ্য কিছু কল্পনাপ্রসূত ভাষণ দিতে হয়েছে তাকে।...

মঞ্জরী নাকি শুধু ঠাট্টা ক'রে সিনেমা করার কথা জামাইবাবুর কাছে বলেছিলো, তিনি ভোলানাথ মানুষ, ঠাট্টাকে সত্যি ভেবে সব ঠিকঠাক ক'রে ব'সে আছেন। মঞ্জরী যদি এখন 'না' করে, সে ভদ্রলোকের আর 'মুখ' থাকবে না। কাজে-কাজেই বাধ্য হয়ে মঞ্জরীকে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভোলানাথ বিজয়ভূষণ ঠাট্টাকে সত্যি ভাবলেও ভাবতে পারতেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ণিমাদেবী মিথ্যাকে সত্যি ব'লে ভুল করেননা। তবু ভুলের ভান করেন। সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস পাননা। এ তবু ভালো। এই ছদ্মবেশী মিথ্যার অবতারণাটুকু কারেও

ছেলে তাঁর কিছু মর্য্যাদা রেখেছে। অতএব নিম্‌রাজি ভাব রেখে ফিরে যাওয়া চলে।

কিন্তু এটুকু তো তিনি আশা করতে পারেন যে, দু'চারটে দিন অন্ততঃ ছেলে তার বৌকে কিছুটা অবহেলা করবে। রাগ-রাগ বিরক্ত-বিরক্ত ভাব দেখাবে। তা নয়—যেন কাল ফুলশয্যা হয়েছে, দু'জনে এমনি ভাবে ডগমগ। ছিঃ! একশোবার ছিঃ!

বই প'ড়ে ভূমিকা বুঝিয়ে দেবার পর প্রায় মাসখানেক কেটে যায়, ও পক্ষে আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মঞ্জরীর নিজের থেকে খোঁজ নিতে লজ্জা করে।

অভিমন্যু বলে, 'তোমার জামাইবাবুর আর কোটিপতি হওয়া হলোনা মঞ্জু, কোম্পানী বোধহয় অঙ্কুরেই নির্ব্বাণ লাভ করলো।'

মঞ্জরী ঠোঁট উল্টে বলে, 'মরুক্‌গে!'

'আহা, তোমার চিরদিনের সাধটা—'

'কী পার্টই দিচ্ছিলো, মরি মরি! না হ'লেই ভালো!'

স্ফূর্ত্তিবাজ অভিমন্যুর কঠিন মূর্ত্তিটা আর উঁকি মারেনা। সে তার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যে উত্তর দেয়, 'তা সত্যি। নায়িকাই যদি না হতে পেলে, জাত খুইয়ে লাভ কি?'

এদিকে পূর্ণিমাও ক্রমশঃ 'ছোটবৌমা' ব'লে ডেকে কথা কইছেন।

সহসা এই স্থির গঙ্গায় আবার ঢেউ উঠলো।

অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু অবাঞ্ছিত যে।

তাই আবার অভিমন্যুর জ্যোৎস্নাভরা মুখাকাশে নামলো মেঘ, পূর্ণিমার মুখে অমাবস্যা।

জনম্ জনমকে সাথী

কি একটা ছুটির দিন, বিজয়ভূষণ একেবারে গাড়ী নিয়ে হাজির।
'একঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নে, বইয়ের মহরৎ হচ্ছে।'

'মহরৎ ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! শুভদিন দেখে একদিন—মানে, যে যতোই সাহেব হোক, পাঁজীপুঁথি দেখে একদিন শুভক্ষণে শুভলগ্নে না কি করতে হয় এসব। মানে, করে সবাই। তোকে আগে খবর দিতে বলেছিলো, আমারই বিস্মৃতি। যাক্‌গে, দেরী আছে এখনো। তুই তৈরি হয়ে নে, আমি বসছি।'

অভিমন্যু নীরব।

পড়া খবরের কাগজখানা থেকে চোখ আর ফেরাতে পাচ্ছেনা।

মঞ্জরী বিমূঢ়ভাবে একপলক স্বামীর ভাবশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে, 'একঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নেবো? সে কি আর সম্ভব হবে?'

বিজয়ভূষণের এসব 'ভাব' এবং ভাবশূন্যতার প্রতি দৃষ্টিমাত্র নেই, তিনি সরব প্রতিবাদ ক'রে ওঠেন, 'একঘণ্টার মধ্যে তৈরি হওয়া যাবেনা? ক'খানা শাড়ী পরবি? হুঁঃ! বললে তো তোমাদের আবার গোঁসা হয়। সাধে কি আর 'মানুষ' কথাটার আগে একটা 'মেয়ে' শব্দ জুড়েছে? নে বাবা, সওয়াঘণ্টা সময়ই নে। আমারই যখন দোষ, থাকছি ব'সে। ততোক্ষণ একটা তাকিয়া দে, তোফা খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। তার আগে এক গ্লাশ জল। ..এই যে অভিমন্যু লাহিড়ী, আপনার কার্ড নিন। উঠে প'ড়ে বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলুন।'

জনম্ জনমকে সাথী

'আমি? আমি কোথায় যাবো?'

গম্ভীর হাস্যে প্রশ্ন করে অভিমন্যু।

'কোথায় আর! সাজঘরে। ছায়াচিত্রের আঁতুড়-

ঘরেও বলতে পারো।'

'পাগল হয়েছেন।'

'পাগল তো আমরা হয়েই আছি রে দাদা! এঁদের হাতে যখন পড়েছি।'

'আমার যাবার দরকার নেই। আপনারাই যান।'

বিজয়ভূষণ সহাস্যে বলেন, 'কেন, গেলে বুঝি অধ্যাপক মশাইয়ের সম্ভ্রমের হানি হবে? এতো তো আধুনিক, এ বিষয়ে এখনো পিউরিটান্ আছো তো? কাল বদলেছে ভায়া, কাল বদলেছে। যেকালে থিয়েটারের রাস্তা কোন্‌মুখে শুধোলে, সভ্য ভদ্দরলোকেরা উত্তুর দিতো, 'জানি কিন্তু বলবোনা' সেকাল আর নেই। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই হচ্ছেন সিনেমা থিয়েটারের কর্ণধার। তাছাড়া গিন্নীকেই যখন পর্দ্দা আলো করতে ছেড়ে দিচ্ছো, তখন আর অতো শুচিবাই করলে চলবে কেন?'

অভিমন্যু অবশ্য এমন নির্ব্বোধ নয় যে ধরা পড়বে। অতএব সেও হাস্যবদনে বলে, 'কাজ আছে বড়দা, না হ'লে যেতাম।'

'কাজ! হুঁঃ! তুমি আবার এতো কাজের লোক কবে হ'লে হে? আসল কথা বুঝেছি, চক্ষুলজ্জা হচ্ছে। আচ্ছা থাক্। এ লজ্জা ভাঙবে। ...ছোটশ্যালী, একটা বালিশ দাও?'

সংবাদটা ঘোষিত হতে দেরী হয়না।

নতুন কোম্পানীর প্রথম বইয়ের মহরতের সংবাদ এবং সেখানে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ভদ্রজনের ও শিল্পীবৃন্দের গ্রুপ্‌ফটো সাড়ম্বরে ছাপা হয়েছে কাগজে কাগজে। কারণ, অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজন যেমন-

তেমন হোক, কয়েকটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছিলো, এবং তাঁদের প্রতি ব্যবহার করা হয়েছিলো ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য "অতিথি নারায়ণ" নীতির অনুসরণে। শেষ-বেশ ভক্তি-অর্ঘ্যের নমুনা স্বরূপ প্রত্যেকের গাড়ীতে তুলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এক-একটি হৃষ্টপুষ্ট সন্দেশের বাক্স।

বিজয়ভূষণ নিজে ব্যবসাবুদ্ধিহীন হলেও তাঁর যে হিতৈষী বন্ধুটি তাঁকে এক টাকাকে একশো টাকা ক'রে তোলবার ফিকির শেখাতে নামিয়েছেন, তিনি রীতিমত ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন। প্রতিপক্ষকে প্রথম থেকেই হাতে রাখবার কৌশল প্রয়োগ করেছেন তিনি।

অতএব গ্রুপফটোর প্রত্যেকের তলায় তলায় নাম পরিচয় ছাপা হয়, আর তরুণমহলে কাকলীদেবীর পার্শ্ববর্ত্তিনী নবাগতা মঞ্জরীদেবীর মুখের কাট্ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়ে যায়।

এসব ব্যাপারে নামটা যে বদলালে ভালো হতো সে কথা এখন মনে পড়ে, কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ কি? ইতিমধ্যে তো আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সকলের গোচরীভূত হয়ে গেছে নাম।

এ সংবাদ ঘোষিত হবার পর আত্মীয়সমাজে মঞ্জরীর ভয়াবহ ভবিষ্যতের কল্পনা, আর সেই নিয়ে আলোচনা ছাড়া কয়েকদিন আর কোনো কাজ থাকেনা।

অভিমন্যুর বন্ধুরা ভাবতে থাকে অভিমন্যুর ভবিষ্যৎ।

তারা বাড়ী ব'য়ে এসে ব'লে যায়, 'নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে ভাই? এখন ফ্যাসানের খাতিরে ক'রে বসলে বটে, পরে পস্তাতে হবে।'

অভিমন্যু প্রতিবাদ করেনা, শুধু হাসে।

বন্ধুরা রেগে বলে, 'এখন্ হাসছো? আচ্ছা দেখবো এরপর। পরে কাঁদতে হবে, বুঝলে?'

জনম্ জনমকে সাথী

অভিমন্যু মুচ্‌কি হেসে ঠাণ্ডাগলায় বলে, 'তখন তোমরা হেসো।' এমন ভাবে বলে যেন সে হাসিটা অভিমন্যুর কাছে পরম উপভোগ্য হবে।

বন্ধু সগর্জ্জে প্রশ্ন করে, 'সখটা কার?'

'আমারই।'

'চমৎকার।'

অভিনন্যুর দিদিরা দু'জন থাকেন কলকাতায়, দু'জন বিদেশে। যাঁরা বিদেশে থাকেন, তাঁরা আগেই অপর ভগ্নীদের পত্রে কানাঘুসো কিছু শুনেছিলেন, এখন সংবাদপত্র পাঠমাত্র সবেগে পত্রাঘাত করলেন। সেসব পত্রের প্রকাশভঙ্গী আলাদা হলেও মর্ম্মকথা একই।

দু'জনে ইনিয়ে-বিনিয়ে এই কথাই বুঝিয়েছেন—অভিমন্যু একেবারে পাগল, ক্ষ্যাপা, উন্মাদ, পণ্ডিতমূর্খ, অপরিণামদর্শী ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে দিদিরা কলকাতায় থাকেন, তাঁরা নিজেরাই এলেন সবেগে।

বড়দি রক্তমূর্ত্তি হয়ে বললেন, 'তুই ভেবিছিস্ কি? আমরা কি মরে গেছি?'

অভিমন্যুর অটল হাসি মুখ।

'সর্ব্বনাশ! খামোকা এমন অলক্ষণে কথা ভাবতে যাবো কেন?'

'থাম্ থাম্! চুপ কর্! সব রকমে বংশের মুখ ডোবালি?'

বলাবাহুল্য এটা অভিমন্যুর প্রেম পরিণয়ের প্রতিও বক্রোক্তি।
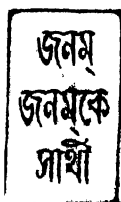
অভিমন্যু বললো, 'তোমরা ছ'জনে মিলে সেই ডুবন্ত মুখকে টেনে তুলতে পারবেনা ?'

'কাকে আর কি বলবো। তোর মতো বদ্ধ বেহায়াকে কিছু বলতে আসাই ঝকমারি। কিন্তু আমরা যে শ্বশুরবাড়ীতে মুখ দেখাতে পারছিনা। ছোটছাওর যখন কাগজখানা হাতে ক'রে বাড়ী মাথায় করতে করতে খবর দিলো—বৌদি, কাগজে তোমার ছোট ভাজের ছবি বেরিয়েছে। এই ছাখো—নবাগতা মঞ্জরীদেবী। তখন যেন মাথাটা কাটা গেলো। ছি ছি।

অভিমন্যু সহাস্যেই বলে, 'বৌ যখন বিয়ের পর এম্-এ পড়তে চেয়েছিলো, তখনো তো তোমাদের লজ্জায় মাথাকাটা গিয়েছিলো বড়দি।'

'তাই বুঝি এই অপরূপ গৌরবের কাজটার বেলায় আর কারুর পরামর্শটুকুও নেওয়ার দরকার বোধ করোনি ?'

'ঠিক বুঝেছো।'

ছোড়দি প্রথমে সরাসর গেলেন ভাইবৌয়েরই কাছে।

বললেন, 'এসব চলবেনা। আমার বাপের বংশের সুনাম কলঙ্কিত করবার তোমার অধিকার নেই।'

মঞ্জরী এঁদের কাছে বরাবরই নতমুখ নম্রবাক।

বিয়ের সময় অনেক বাঁকা কথা আর ব্যঙ্গকটাক্ষ সহ্য করতে হয়েছিলো তাকে, কেবলমাত্র অভিমন্যু তাকে ভালোবেসে বিয়ে

জনম জনমকে

করেছে এই অপরাধে। সেসব নীরবেই সহ্য করেছে মঞ্জরী। কারণ অভিমন্যু তাকে আগে থেকেই এসব বিষয়ে প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলো।

এখনও চোপা করলোনা।

শুধু শান্তভাবে বললো, 'একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে এতো বড়ো ক'রে দেখছেন কেন ছোড়দি?'

'তুচ্ছ? তা তোমার কাছে তুচ্ছ বৈ কি। আমার বাবার বংশমর্য্যাদার মর্ম্ম তুমি কি বুঝবে? স্টেজে নেচে গেয়ে দেহসৌষ্ঠব দেখিয়ে, বাহবা কুড়নো যায় ছোটবৌ, সম্ভ্রম পাওয়া যায়না।'

ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো মঞ্জরীর, কি বলতে গিয়ে থেমে গেলো। মুখটা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ কালচে।

অভিমন্যু ওপাশে ইজিচেয়ারটায় শুয়ে পড়েছিল।

ওর ওই মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভারী মমতা লাগলো তার। চুপ ক'রে থাকতে পারলোনা। বললো, 'এটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছেনা ছোড়দি?'

'বাড়াবাড়ি?'

ছোড়দি নাক কুঁচ্‌কে বললেন, 'তা বটে। বাড়াবাড়িটা আমাদেরই। কিন্তু বলছি, তোর রোজগারে বুঝি আর সংসার চলছেনা? উনি বলছিলেন, অভিমন্যুকে বোলো সে যদি চাকরি করতে চায় তো আমার অফিসে চাকরি ক'রে দিতে পারি। মোটা মাইনের কাজ।'

অভিমন্যু মুচ্‌কে হেসে বলে, 'ওঃ, তাই বলো! তোমার উনি! তা—'উনি' যখন বলেছেন, তখন একবার বিবেচনা করা দরকার।'

ছোড়দিকে 'উনি' নিয়ে ক্ষ্যাপানো অভিমন্যুর চিরদিনের অভ্যাস।

রাগ ক'রে চলে গেলেন ছোড়দি মাতৃ-দরবারে।

সেখানে অনেক কথা, অনেক আক্ষেপ। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেলো, মা বিনা বাক্যব্যয়ে ছোট মেয়ের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন।

অভিমন্যু গিয়ে মার চাদরের খুঁট্‌ ধরলো।

'মা, কি পাগলামী হচ্ছে?'
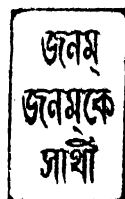
মা বললেন, 'পাগল বলেই তো তোমাদের মতো বুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকা সম্ভব হচ্ছেনা বাবা ! ছাড়ো।'

অভিমন্যু দৃঢ়স্বরে বললে, 'বেশ, আমাকে ত্যাগ করো তো তোমার অন্য ছেলেদের কাছে যাও। জামাইবাড়ী গিয়ে থাকা চলবেনা।'

ছোড়দি ফুঁসে উঠে বললেন, 'ওঃ, তার বেলায় বাবুর লজ্জা চেগে উঠলো কেমন ?'

'তা উঠলো।'

'কেন, আমরা মার সন্তান নই ?'

পূর্ণিমা বাধা দিয়ে বললেন, 'তর্ক থাক্ ইন্দু, কারুর বাড়ীতেই আর থাকতে রুচি নেই আমার, তুই বাড়ী যা। আমি খড়দায় গিয়ে থাকবো।'

খড়দায় পূর্ণিমার গুরুবাড়ী।

খড়দায় অবশ্য গেলেননা পূর্ণিমা, কিন্তু এমন ভাবে থাকতে লাগলেন বাড়ীতে, যেন এদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তাঁর।

ওদিকে স্যুটিং সুরু হয়ে গেছে।

অভিমন্যুর এক অদ্ভুত অবস্থা।

আমার স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী, তার উপর আমার কন্ট্রোল নেই, একথা স্বীকার করা চলেনা। কাজেই সকলের সমস্ত গালমন্দ হজম ক'রে নীলকণ্ঠ হতে হয় তাকে। লোকের কাছে দেখাতে হয় তার নিজের সখেই এই অঘটন।

জনম্ জনমকে সাথী

আর সেই হাসি-ঠাট্টার পরই মঞ্জরীর উপর স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করতে লজ্জা হয়! বরং মাঝে মাঝে মুখ ফস্কে ব'লে ফেলতে হয়, 'বাবা,

কি যে করছে সব! একেই বলে তিলকে তাল!'

মঞ্জরী চুপ ক'রে থাকে।

কারণ তার নিজের মা দাদাই বাড়ী বয়ে এসে যথেচ্ছ কটুকাটব্য ক'রে গেলেন।

তবু ছবি উঠছে।

লোকলজ্জা শুধু একদিকেই থাকেনা।

এতদূর এগিয়ে, পিছিয়ে পড়াও যে মৃত্যুতুল্য।

'স্ত্রী আমার অবাধ্য' একথা স্বীকার করা পুরুষের পক্ষে অপমানজনক, মেয়েদের পক্ষেও তেমনি অপমানকর—যদি স্বীকার করতে হয় স্বামী আমার গতিবিধির বিধানকর্ত্তা।

অতএব দাম্পত্যজীবনে আসুক মনোমালিন্যের মালিন্য, সংসারে নামুক অশান্তির বিষাক্ত বাতাস, বাইরের জগতে সুখ থাক্!

বাইরের লোক জানুক আমি উদার।

বাইরের লোকে জানুক আমি স্বাধীন।

মঞ্জরীর বাপেরবাড়ীর অপরাপর লোকদের এ ব্যাপারে বংশমর্য্যাদা হানির প্রশ্ন নেই, কাজেই, তাঁরা সকৌতূহল প্রশ্নে স্টুডিও আর স্যুটিং সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করছেন, এবং সহাস্যে বলছেন, 'ধন্যি মেয়ে! খুব যাহোক কীর্ত্তি রাখলে বাবা!'

অবশ্য এ পক্ষেও এমন দু'চারজন আছেন।

যথা—অভিমন্যুর দুই বৌদি।

জনম্ জনমকে সাথী

তাঁরা একজন থাকেন থিয়েটার রোডে, অপরা সেণ্ট্রাল এভিন্যুতে, কিন্তু 'একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে।' হঠাৎ একদিন একজনের গাড়ী চড়ে

দু'জনে বেড়াতে এলেন পুরনো বাড়ীতে।

বিজয়া দশমীর পরে সময় সুবিধা মতো একদিন শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে যাওয়া ছাড়া এ-বাড়ীতে পদার্পণ তাঁরা দৈবাৎ করেন। তবে এলে অবশ্য সপ্রতিভ ভাবের ঘাটতি দেখা যায়না।

এসেই তাঁরা অভিমন্যুর ঘরে জাঁকিয়ে বসলেন।

বললেন, 'তুমিই যাহোক একটা কিছু করলে ছোট ঠাকুরপো! চেপোঁচজনের কাছে বলতে-কইতে মুখোজ্জ্বল। আর কি অদ্ভুতদের হাতে আমরা পড়েছি! একালের হালচাল কিছু শিখলোনা গো! 'কেবল খালি পয়সা, আর জানে খালি ব্যবসা! ছিঃ!'

অভিমন্যু মৃদুহাস্যে বলে, 'সেটা আপনাদের কপাল দোষ নয়, ক্যাপাসিটির দোষ। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করবার ক্যাপাসিটি থাকলে আর আক্ষেপ করতে হতোনা।'

'তা সত্যি! সে হাতযশ ছোটবৌয়ের আছে। ...তা ছোটবৌ, সিনেমার পাশ-টাস দিবি তো ভাই? জীবনভোর খালি রাশরাশ পয়সা খরচা করেই দেখে এলাম, এবার বিনিপয়সায় দেখা যাবে, কি বলো মেজবৌ?'

মেজবৌ হেসে গড়িয়ে পড়েন।

অভিমন্যুর মুখটা আর কিছুতেই স্বাভাবিক থাকতে চায়না।

মঞ্জরী অতিথি বড়োজায়েদের 'সেবা'র জন্য ইলেকট্রিক হীটারটাকে জ্বালতে বসে।

ওঁরা আর একপালা হেসে মন্তব্য করেন, 'একেই বলে লক্ষ্মীবৌ। দরকার হ'লে সিনেমা থিয়েটারও করতে পারে, দরকার পড়লে গেরস্থালী কাজও করতে পারে। আর আমরা? হি হি হি। পারি খালি খেতে, ঘুমোতে, আর দিনদিন মোটা হতে। ...ছোটবৌ

আমাদের দলে আসেনি। দিব্যি তালপাতার সেপাইটি আছে। না থাকলেই-বা চলবে কেন? হ্যাঁ রে ছোটবৌ, নাচতে-টাচতে হবে তো?'

এমনি করেই মঞ্জরীর জীবনের একান্ত সাধ পূর্ণ হয়।

মনে মনে শতবার নিজের কান মলে মঞ্জরী, আর ভাবে, যা হয়েছে হয়েছে বাবা, এই শেষ। কে জানতো এতোটুকু একটা জিনিস নিয়ে এতো তোলপাড় হবে!

ছবি রিলিজের দিন বিজয়ভূষণ আবার এলেন।

আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই, যেতেই হবে অভিমন্যুকে।

না যাওয়াটা অশোভন।

তাছাড়া—আজ না গেলে ধরা পড়ে যাবে অভিমন্যুর বিরুদ্ধ মনোভাব।

কৌতূহলও আছে। আর—আর?

হ্যাঁ, মমতাও আছে বৈকি!

সত্যই কি আর পাষাণ হয়ে গেছে অভিমন্যু? ও কি আর মঞ্জরীর জল ছলোছলো চোখ, অভিমানে কাঁপা কাঁপা ঠোঁট, আর বিষাদ বিষাদ মুখ দেখতে পাচ্ছেনা? না, দেখে মন কেমন করছেনা? কিন্তু কি করবে? ঘরে পরে সকলে ব্যাপারটাকে এতো বেশী ফেনাচ্ছে, আর এতো ধিক্কার দিচ্ছে অভিমন্যুকে, যার জন্যে কিছুতেই সহজ হতে পারছেনা সে।

বাইরে যতো হাস্যবদনে লোকের কথা ওড়াচ্ছে, ভেতরে ততো গুম্ হয়ে যাচ্ছে।

আজ তাই ফর্সা পাঞ্জাবীর ওপর দামী একখানা শাল চাপিয়ে, ছবি দেখতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মঞ্জরীর কাছাকাছি এসে, নিজস্ব ভঙ্গিমায় হাসি হাসি সুরে বললো, 'কি রকম দেখাচ্ছে? স্টারের বর ব'লে মনে হচ্ছে?'

অনেকদিন এমন ভালো সুরে কথা বলেনি অভিমন্যু।

কিসে যে কি হয়! জল ছলোছলো চোখ আর শুধু ছলোছলো থাকেনা, উছলে ওঠে।

'এই ত্যাখো! এ কী হচ্ছে? আরে?'

মঞ্জরী ফর্সা পাঞ্জাবী আর দামী শালকে কেয়ার করেনা। চোখের জলে ভিজে ওঠে সেগুলো।

অভিমন্যু ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলোয়।

নিজের উপর নিজের ভারী একটা ধিক্কার আসে, আসে অনুশোচনা। বেচারা মঞ্জু, না বুঝে একটা ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছে সত্যি, কিন্তু তার জন্যে কম লাঞ্ছনা তো পাচ্ছেনা! আর অভিমন্যুও কি না নিতান্ত নির্মায়িক ভাবে বাইরের লোকের মতোই ব্যবহার করেছে। করেছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর বিরূপতা।

নাঃ! ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।

•

কি একটা বলতে গেলো, বলা হলোনা।

বিজয়ভূষণ হাঁক পাড়লেন, 'প্রাইজ-ট্রাইজগুলো পরে এসে দিলে হতোনা? ওদিকে যে সময় চলে গেলো।'

সময় চলে গেলো।

তাই বটে।

সময় ছুটেছে। তাই মানুষও ছুটছে ঊর্দ্ধশ্বাসে।

দু'দণ্ড বসার অবসর নেই, অবসর নেই শান্ত হয়ে

জনম্ জনমকে সাথী

ব'সে একবার আপনার হৃদয়খানিকে মেলে ধরবার। অবকাশ নেই আপনাকে নিয়ে চিন্তার ঘাটে ঘাটে ফিরে একবার যাচাই ক'রে নেবার। শুধু ছুটে চলো। সময়ের পিছু পিছু!

অশান্ত উদ্বেগ!

দুঃসহ প্রতীক্ষা!

ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা, ছায়াছবির কাহিনী ছায়ার মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে, চৈতন্যের জগৎ পর্য্যন্ত পৌঁছচ্ছেনা। কখন আসবে সেই মহামুহূর্ত্ত! যখন পর্দ্দার গায়ে ঝল্‌সে উঠবে অশরীরী একখানি শরীর! দেহ নয়, দেহাতীত।

জ্ঞানাবধি বহু রূপে, বহু সাজে আরশির মাঝখানে যাকে দেখেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে, ভালোবেসেছে, আশ মেটেনি, তাকে নতুন রূপে নতুন সজ্জায় অভিনব এই পর্দ্দার আয়নায় একবার দেখবার জন্যে কতো না সংগ্রাম!

আজ সেই সাধনার সিদ্ধি, সেই স্বপ্নের সাফল্য!

মন্ত্রাবিষ্টের মতো নিথর হয়ে ব'সে আছে মঞ্জরী।

বিশ্বাস হচ্ছেনা সত্যিই ওকে দেখা যাবে।

বুঝতে পাচ্ছেনা, দেখে ওকে বোঝা যাবে কিনা।

অবশেষে এলো সেই ক্ষণ!

জনম্ জনমকে সাথী

মঞ্জরী এসে দাঁড়িয়েছে পর্দ্দার গায়ে! ঘুরলো ফিরলো, কথা বললো, চলে গেলো! আবার এলো আবার কথা বললো।

কিন্তু কি কথা বললো? কি স্বর? কার স্বর?
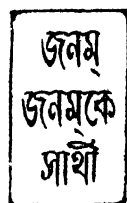
শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি কি হারিয়ে ফেলেছে মঞ্জরী? নইলে কোনো কথা শুনতে পাচ্ছেনা কেন? ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোই কি শুধু চোখের তারায় এসে হাজির হয়েছে?

'কি রে, উঠবি না কি? বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছিস্ যে একেবারে!'

সুনীতির ঠেলায় চম্‌কে উঠে, উঠে দাঁড়ালো মঞ্জরী।

'চল্ চল্, ওরা নেমে গেলো!'

ব'লে সুনীতি চলে এগিয়ে। দেখা গেলো, সুনীতির মেয়েরা হাসতে হাসতে ঠেলাঠেলি ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

গাড়ীতে উঠতে ছাড়াছাড়ি।

বিজয়বাবু এখন যাচ্ছেননা, এখানে আরো বন্ধুবান্ধব রয়েছে। সুনীতি মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে চলে গেলো বাড়ীর গাড়ীতে, এরা ফিরে এলো ট্যাক্সিতে।

দু'জনের কেউ কথা বলছেনা।

ট্যাক্সির মধ্যে অখণ্ড নীরবতা।

শুধু থেকে থেকে এক-একটা হালকা নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। কে জানে সে নিঃশ্বাস উঠছে কার বুক থেকে।

জনম্ জনম্‌কে সাথী

প্রথম কথা কইলো অবশ্য অভিমন্যুই।

গায়ের জামাটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে রাখলো আর সেই অবকাশে পিছন ফিরেই বললো, 'বেছে বেছে ভূমিকাটি দিয়েছে ভালো!'

মঞ্জরী আজ প্রতিজ্ঞা করেছিলো কিছুতেই রাগবেনা। লছে। মানেই তো হার মানা!

কিন্তু অভিমন্যুর এই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গমিশ্রিত ছোট্ট মন্তব্যটুকু সে প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে দিলোনা।

সেও ব্যঙ্গের সুরে ব'লে উঠলো, 'তা সত্যি বটে! নায়িকার ভূমিকাটা পাওয়া উচিত ছিলো আমারই।'

'নায়িকা না হোক্, অন্য কিছু হতে পারতে! পর্দ্দার গায়ে রূপই যদি ফোটাতে হয় তো এমন কদর্য্য রূপ কেন?'

'কদর্য্য!'

'তাছাড়া? যেমনি চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি, তেমনি কুৎসিত মুখ-ভঙ্গি! করেছিলে কি ক'রে তাই ভাবছি।' ব'লে নাক কুঁচকে বিছানায় এসে বসে অভিমন্যু।

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মঞ্জরীরও মনে হলো—সত্যিই তো, কি ক'রে করেছিলো সে!

বিজয়ভূষণ বলেছিলেন, 'তোর কাছে তো সে পার্ট পার্টই নয়, ন্যাচারাল্! দিব্যি একখানি আপ্‌টুডেট মেয়ে।'

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

চরিত্রটা একটি অতি আধুনিক মেয়ের ব্যঙ্গচিত্র।

স্তব্ধ অরণ্যে উঠলো আলোড়ন!

অনেকদিনের সঞ্চিত অশ্রু, অনেকক্ষণের ভারাক্রান্ত হৃদয়ভার, অনেক অপমানের জ্বালা আর অভিমানের বেদনা, সহসা উথলে উঠলো দুরন্ত বাষ্পোচ্ছ্বাসে। আর সেই নিতান্ত পরাজয়ের স্বাক্ষর অভিমন্যুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মঞ্জরী অভিমন্যুর দিকে না তাকিয়ে।

সারারাত এলোনা এ-ঘরে।

অভিমন্যুও ডাকলোনা মান খাটো ক'রে। ভাবলো, 'উঃ, এতো রাগ

অভিমানের বেদনাকে রাগ ভেবে ভুল করেই তো সংসারে যতো অনর্থপাত।

সমস্ত রাত ঘুমিয়ে উঠে শূন্য শয্যার দিকে তাকিয়ে অভিমন্যু প্রতিজ্ঞা করলো, বেশ, ওর কোনো কথায় আর থাকবোনা। ওকে দেখিয়ে দেবো ওর কোনো ব্যাপারেই কিছু যায়-আসেনা আমার।

আর সমস্ত রাত জেগে আর ভেবে মঞ্জরী সংকল্প করলো, বেশ, আরও একবার নেবো চান্স্। সইবো আত্মীয় বন্ধুর গঞ্জনা, কুড়োবো নিন্দে, তবু দেখিয়ে দেবো ওকে, সুন্দর রূপ ফোটাবার ক্ষমতাও মঞ্জরীর আছে। মহিমাময় সুন্দররূপ!

প্রেমে উজ্জ্বল, গৌরবে সমুজ্জ্বল!

কিন্তু কোথায় সে চরিত্র?

বিজয়ভূষণের সখ বোধকরি একবারেই মিটবে, মঞ্জরী কাকে ধরবে তবে?

লুকিয়ে গিয়ে পরিচালক কানাই গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করবে? আবদার করবে তাঁর পরবর্তী ছবির নায়িকার ভূমিকার জন্যে?

সে কি সম্ভব?

জনম্ জনমকে সাথী

ছোটজা ও দ্যাওরকে নেমন্তন্ন করার সখ অভিমন্যুর বৌদিদের কদাচ দেখা যায়।

সেই কদাচটি দেখা গেলো ক'দিন পরে—মেজবৌদি রঞ্জিতার কাছ থেকে। টেলিফোনে নেমন্তন্ন নয়, মেজদা প্রবীর স্বয়ং অফিস ফেরত গাড়ী ঘুরিয়ে এসে ব'লে

গেলেন, 'ওরে মনু, তোর বৌদি কাল তোদের যেতে বলেছে। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি। ছোটবৌমাকে নিয়ে যাস্ অবিশ্যি ক'রে।'

'হঠাৎ নেমন্তন্ন?'

'নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন কিছু নয়, অনেকদিন তো একসঙ্গে খাওয়া-টাওয়া হয়নি, তাই তোর বৌদি বললে—ব'লে এসো ওদের। ছুটি রয়েছে কাল। নতুন কি এক পোলাও রান্না শিখেছেন—'

'আমার ওপর দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালানো হবে বুঝি?'

হেসে উঠলো অভিমন্যু।

হেসে উঠলেন মেজদাও। হাসির আওয়াজ মেলাবার আগেই স্টার্ট দিলেন গাড়ীতে। জানা আছে মা এখানে নেই, নিশ্চিন্ত। থাকলে সৌজন্যবোধের দায়ে একবার অন্ততঃ নামতে হতো দেখা করতে।

যেতেই হবে।

বড়ো ভাই ছোট ভাইকে আদর ক'রে অনুরোধ ক'রে গেছে 'অনেকদিন একত্রে খাওয়া হয়নি' ব'লে, এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায়না। কিন্তু মঞ্জরী বেঁকে বসলো।

বললো, 'তুমি যাও, আমি যাবোনা।'

'না যাবার কারণটা কি দর্শাবো?'

'বোলো, শরীর খারাপ।'

'কেউ বিশ্বাস করবেনা।'

'তা বটে!' মঞ্জরী তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছে আমার তো ওই প্রাপ্য। যাক্, আজ বিশ্বাস না করুন, ভবিষ্যতে করতেও পারেন।'

অভিমন্যু থমকে বললো, 'মানে?'

'মানে নেই।'

'মানে নেই?'

'না।'

অভিমন্যু একবার ওর মুখের দিকে তাকালো। ...সত্যিই তো অস্বাভাবিক ক্লান্ত আর করুণ দেখাচ্ছে মঞ্জরীকে। মুখটা শুক্‌নো, রংটা ফ্যাকাসে, চোখদুটো ছল্‌ছলে। চোখের নীচে কালি। ভারী মায়া লাগলো।

কতোদিন মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেনি অভিমন্যু?

সন্দিগ্ধভাবে বললো, 'ঠিকই তো। তোমাকে তো খুব খারাপই দেখাচ্ছে। কি হয়েছে বলো তো?'

অভিমানিনীর বড়ো ভয়, পাছে প্রিয় স্নেহস্পর্শের বাতাসে ঝ'রে পড়ে পাতার আগায় আগায় সঞ্চিত শিশিরকণা। সে বড়ো লজ্জার।

তার চাইতে হেসে ওঠা ভালো।

হোক্ সে হাসি অস্বাভাবিক।

'হবে আবার কি?'

'এতো ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?'

'ইচ্ছে ক'রে শরীর খারাপ দেখাচ্ছি, অভিনেত্রী কিনা!'

অভিমন্যু নিষ্পলক দৃষ্টিতে একবার ওর এই অসঙ্গত হাসি-মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে বললো, 'কি জানি। তবে না গেলে কিন্তু মেজদা মেজবৌদি খুব দুঃখিত হবেন।'

জনম্ জনমকে সাথী

'তুমি তো যাচ্ছো।'

'আমি তো আধখানা।'

মিষ্টি একটু হাসলো অভিমন্যু।

'তুমি একাই একশো।'

মঞ্জরীও হাসলো একটু, আরো মিষ্টি ক'রে।

'সত্যিই যাবেনা ?'

'না গো। ভালো লাগছেনা।'

'আমার মন কেমন করবে।'

'আহা!'

'আহা মানে? মেজবৌদিরর হাতের নতুন পোলাও খাবো আর চোখ দিয়ে জল ঝরবে!'

নিজস্বভাবে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো মঞ্জরী, অনেকদিন আগের মতো। হেসে হেসে বললো, 'তা ঝরতে পারে। সব-মশলার সেরা মশলা যে লঙ্কা, মেজদি এ থিয়োরীতে বিশ্বাসী।'

'বাড়ীতে তাহ'লে আজ তোমার জন্যে ভালো ভালো রাঁধতে দাও?'

'কি যে বলো!'

'কেন, অন্যায় কি বলেছি? নিজেদের বিষয়ে উদাসীন ভাব, ওটা পৌরাণিক হয়ে গেছে।'

'উদাসিনী আবার কি? রোজ কতো যেন খাচ্ছি!'

'খাচ্ছোনা?'

অভিমন্যু আর একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে বলে, 'আমার ওপর রাগ ক'রে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছো?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি! বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে চান করতে যাও দিকি! দেরী হ'লে মেজবৌদির কাছে বকুনি খাবে।'

'ওই জিনিসটাই তো খেয়ে মানুষ আমি।'
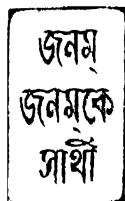
অস্তিত্ব দিতে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢোকে অভিমন্যু।

তার উদ্দাম স্নানের কলকল্লোল ধ্বনি শোনা যায় বাইরে থেকে।

চিরদিনের নির্ম্মল নীল আকাশ কখনো ঢাকা প'ড়ে যায় ভুল বোঝার কুয়াশায়, আবার ঝল্‌সে ওঠে সহজকথা আর সহজহাসির সূর্য্যোদয়ে।

ওখানে গিয়ে অভিমন্যু দেখলো চাঁদের হাটবাজার। দুই দিদি এসেছেন, এসেছেন মা। বড়বৌদিও এসেছেন বড়দাকে বাড়ীতে রেখে। মোটকথা বেশ মোটা খরচা ক'রে বসেছেন মেজগিন্নী।

উপলক্ষ ?

উপলক্ষ কিছু নয়, এমনি।

তবে নাকি অভিমন্যু চিরকেলে দুষ্টু, তাই আবিষ্কার ক'রে বসলো অন্তর্নিহিত উপলক্ষ্য—অভিমন্যুর বিচার। কিন্তু বড়ো ব্যথা পেয়েছেন এঁরা, তার অপরাধের দলিলটি সঙ্গে না দেখে। তাহ'লে সত্যিকার জমতো!

'ছোট বৌ এলো না?'

'ওমা, সেকি?'

'কেন?'

'শরীর খারাপ?'

'কই, কাল কিছু শুনলামনা তো?'

'হঠাৎ এমন কি হলো যে একবারটির জন্যে আসতেই পারলোনা?'

এক ডজন প্রশ্নকর্ত্রী, উত্তরদাতা একা অভিমন্যু।

প্রত্যেকের প্রশ্নেই অবিশ্বাসের সুর। প্রত্যেকের মুখেই আশা-ভঙ্গের ম্লানিমা।

আশাভঙ্গের আক্ষেপ শেষ হ'লে সুরু হলো আসল কাজ।

'অভিমন্যু কি ভেবেছে ?'

'একবারেই শিক্ষা হয়েছে, না জের চলতে থাকবে ?'

'ও বড়ো ভয়ানক নেশা।'

'বাঘিনীর কাছে রক্তের আস্বাদ! এইবেলা অঙ্কুরে বিনষ্ট না করলে অভিমন্যুর আর রক্ষে নেই।'

'স্ত্রী যদি প্রফেশন্যাল অভিনেত্রী হয়ে দাঁড়ায়, অভিমন্যুকে আর প্রফেসরি ক'রে খেতে হবে ?'

নানা ছন্দে, ভাষার নানা কসরতে এই একই প্রশ্ন।

আশ্চর্য্য! অভিমন্যু আগাগোড়াই অবিচল। স্ত্রীর কাজটাকে আদৌ নিন্দনীয় ব'লে স্বীকার করলোনা সে, উল্টে সমর্থন করলো। বললো, 'কার ভেতরে কি প্রতিভা লুকোনো থাকে, কে বলতে পারে ? হয়তো—কালে মঞ্জরীদেবীই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ তারকা হয়ে উঠবেন।'

'প্রতিভা! প্রতিভার গলায় দড়ি! তুই তখনো বেশ বড়োমুখ ক'রে বেড়াতে পারবি তো ?'

'অবশ্যই! কেন নয় ? তখন বড়ো গাড়ী চ'ড়ে বেড়াবো নিশ্চয় ? বড়ো গাড়ী চড়লে মুখ আর বুক আপনিই বড়ো হয়ে ওঠে।'

'ছাত্রীরা গায়ে ধুলো দেবে।'

'ছাত্রী ? দিন পেলে আর ছাত্রী ঠেঙাতে যাচ্ছে কে ? পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাবো। এবং ভবিষ্যতে একদিন ডিরেক্টর হয়ে জাঁকিয়ে বসবো।'

জনম্
জনমকে
সাথী

কথায় কথা বাড়লো, তর্কে তর্ক।

কিন্তু কিছুতেই পেড়ে ফেলা গেলোনা অভিমন্যুকে।

মঞ্জরীকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো অভিমন্যু, না-আসার জন্যে! তারিফ করলো তার বুদ্ধির। সঙ্গে এলে সামনে থাকলে কি হতো বলা যায়না। থাকলে হয়তো এতো ফ্রী হতে পারতোনা অভিমন্যু।

অবশেষে এঁরা হাল ছাড়লেন।

বুঝলেন একেবারে স্ত্রৈণ হয়ে গেছে ছেলেটা।

এরপর সমস্যা পূর্ণিমাদেবীকে নিয়ে। রাগ ক'রে চলে গিয়েছিলেন মেয়ের বাড়ী, সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। অথচ জেদ রয়েছে প্রবল।

অতিষ্ঠ অবশ্য উভয়পক্ষেই।

ছোটমেয়ে এসে অভিমন্যুকে বললো, 'তোর উচিত মাকে সাধ্যসাধনা ক'রে নিয়ে যাওয়া।'

অভিমন্যু ভুরু কোঁচকালো, 'সাধ্যসাধনা মানে? কেন?'

'মা কিরকম অভিমান ক'রে এসেছেন জানিস্‌না সে কথা?'

'এমনও তো হতে পারে, আমিও তাতে ভীষণ অভিমানাহত হয়ে ব'সে আছি।'

'বকিস্‌নে। তোর রাগের মুখ আছে? ভেবেছিলাম ছোটবৌকে নিয়ে তুই আসবি আমার বাড়ী।'

জনম্
জনমকে
সাথী
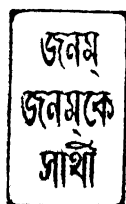
'অদ্ভুত। দেখছি—মা মেয়ের বাড়ী তোফা আরামে রয়েছেন।'

ভাবনা ধ'রে গেলো ছোড়দির।

মতলব কি এদের ?

বুড়ো মাকে তার ঘাড়ে চাপাতে চায় নাকি ? হতে পারে। বৌ যদি হাওয়ায় ওড়েন, মাকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট তো। না বাবা, এই বেলাই প্রতিকারের দরকার।

অন্যপন্থা ধরলো।

'আরামে থাকলে কি হবে, এদিকে অন্তরে অন্তরে কোলের ছেলের জন্যে হেদিয়ে পড়েছেন।'

'তাই নাকি ? তোমার তো খুব অন্তর্দৃষ্টি।'

আর কোনো কথা হলোনা। অভিমন্যু মার ধারেকাছেও ঘেঁষলোনা, অথচ সবাইকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে অভিমন্যু অবলীলাক্রমে বললো, 'মা, এসো।'

যেন ওর সঙ্গেই এসেছিলেন পূর্ণিমা।

বলা বাহুল্য, দ্বিরুক্তিমাত্র না ক'রে পূর্ণিমা গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

আর বাড়ী এসে ?

বাড়ী এসে দু'দিন পরেই আবিষ্কার করলেন পূর্ণিমা, শরীর খারাপ হবার সঙ্গত কারণ আছে মঞ্জরীর।

পুলকে উল্লসিত হলেন পূর্ণিমা।

ভাবী পৌত্রের মুখ সন্দর্শনের আশায় যতোটা না হোক্, মঞ্জরীর ডানা ভাঙলো ভেবে।...নাও, এইবার করো যা খুশি ? আর চলবেনা। জব্দ, একেবারে জব্দ।

সৃষ্টির আগে মানুষের সৃষ্টিকর্তা মেয়েমানুষকে জব্দ ক'রে রাখবার যে অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, মনুষ্যসমাজ তার সুযোগ নিয়ে আসছে পুরোপুরি।

মেয়েমানুষ মেয়েমানুষকে ছেড়ে কথা কয়না।

বিজয়ভূষণ আরাম কেদারায় লম্বা হয়ে পা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'সুনীতি, তোমরাই তোমাদের চিনেছো।'

সুনীতি বালিশে ওয়াড় পরাচ্ছিলো, হাতের কাজ স্থগিত রেখে ভুরু কুঁচকে বললো, 'মানে ?'

'মানে, যা বলেছিলে তাই। তোমার ভগিনী বলছে, আবার ছবিতে নাববে।'

'বলেছে এই কথা ? কাকে বলেছে ?'

'কাকে আবার ? আমাকে।'

'তোমাকে !' সুনীতি সন্দিগ্ধভাবে বলে, 'তোমাকে ও পেলো কখন ?'

'আছে রহস্য ! পাবার চেষ্টা করলে নিভৃতের অভাব আছে ?'

'রঙ্গ রাখো। গিয়েছিলে বুঝি ?'

'হুঁ ! তা নয় ! এতো সাহস আছে যে, তোমার অজানিতে শ্যালীসঙ্গসুখ আস্বাদন করতে যাবো ? চিঠি লিখেছে হে গিন্নি, চিঠি লিখেছে।'

জনম্ জনমকে সাথী

'চিঠি ? ওমা! চিঠি আবার কখন এলো ? আমি দেখলাম না!'

'অফিসের ঠিকানায় লিখেছে। ভেবেছিলো বোধহয় তুমি টের পাবেনা।'

'ঢং। কই দেখি চিঠি।'

বিজয়ভূষণ বুকপকেটে একটা হাত দিয়ে করুণস্বরে বলেন, 'দিয়ে দেবো? জীবনের প্রথম পরস্ত্রীপত্র নিজের স্ত্রীর হাতে তুলে দেবো?'

'তাহ'লে রাখো, বক্ষপঞ্জরের কৌটোয় তুলে রাখো।'

ব'লে সুনীতি রাগ রাগ ভাবে একটা ছোট ওয়াড় একটা বড়ো বালিশে টানাটানি ক'রে পরাতে চেষ্টা করে, আর ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠেন বিজয়ভূষণ।

'করছো কি? এভাবে ধরা পড়ছো? ওদিকে বালিশ বেচারার বক্ষপঞ্জর যে চূর্ণ হয়ে গেলো। এই নাও। এরপর আটকে রাখা হৃদয়হীনতা।'

বলা বাহুল্য ততোক্ষণে চিঠিটা কেড়েই নিয়েছে সুনীতি।

চোখটা বার-দুই বুলিয়ে নিয়ে চিঠিখানা মুঠোয় চেপে সুনীতি অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে বলে, 'দেখলে? বলিনি আমি? বলিনি একবার বাঁধ ভেঙে দিলে আর রক্ষে নেই! নাও, এখন শালীর হিরোইন হবার সাধ কি ক'রে মেটাবে মেটাও। তুমি! তুমিই যতো নষ্টের মূল। তুমিই ওর মাথা খেলে।'

বিজয়ভূষণ সহাস্যে বলেন, 'তাহ'লে ছাখো, এই বৃদ্ধবয়সে সে ক্যাপাসিটি রাখি।'

'আচ্ছা যাচ্ছি আমি, সেই রাক্ষুসীকে দেখে নিচ্ছি।' সুনীতি বিষদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু যাবে কোথায়? বিজয়ভূষণও সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিয়েছেন।

খপ্ ক'রে আঁচলটা ধ'রে ফেলে বলেন, 'ওর
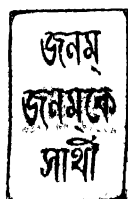
আর্গুমেণ্টটা কিন্তু খুব অসঙ্গত নয়। নেমেইছে যখন, তখন একবার একটা পার্টের মতো পার্টে নেমে, লোককে তাক্ লাগিয়ে দেবার ইচ্ছেটা স্বাভাবিক।'

'হুঁ, নেমেছে যখন, তখন পাতালপর্য্যন্ত নামুক।'

বিজয়ভূষণ তবু সীরিয়স্ হবেননা। তিনি সুনীতির রাগ দেখে হা হা ক'রে হাসবেন।

ছোট্ট একটি ব্যাপার।

তাই নিয়ে কতো আলোড়ন!

ছোট্ট একটি ঢিল যেমন আলোড়ন তোলে নিস্তরঙ্গ নদীর জলে।

এদিকে কিন্তু আপাততঃ নির্ম্মল নীল জল।

মায়ের ঘর থেকে এসেই অভিমন্যু হাসি-উপ্‌ছোনো মুখে গাম্ভীর্য্যের প্রলেপ লাগিয়ে বলে, 'নাও এখন ডাক্তার বাড়ী চলো!'

'ডাক্তার বাড়ী?' মঞ্জরী চম্‌কে মুখ তুলে তাকায়—'কেন?'

'কেন তা তুমিই জানো, আর জানেন তোমার শাশুড়ীঠাকুরাণী।'

মঞ্জরীর পাণ্ডুর মুখে ঈষৎ রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দেয়, তবু কণ্ঠে স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে বলে, 'ডাক্তার বাড়ী যাবার কোনো দরকার নেই।'

'তুমি 'নেই' বললে আর শুনছে কে? পূর্ণিমাদেবীর হুকুম। একালে না কি ডাক্তার দেখানোই ফ্যাসান হয়েছে, অতএব—উঃ, এতো খুশী লাগছে! ইচ্ছে হচ্ছে ভীষণভাবে শিস্ দিই।'

জনম্ জনমকে সাথী

'বটে! আমাকে ডাক্তার বাড়ী যেতে হবে শুনে, খুশীতে তোমার শিস্ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'ইচ্ছে তো দেখছি।'

'থামো! ভীষণ খারাপ লাগছে আমার।'

'খারাপ লাগছে ?'

'লাগছেই তো! যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ লাগছে।

সহসা গম্ভীর হয়ে যায় অভিমন্যু। সত্যিকার গম্ভীর। গম্ভীর সুরেই বলে, 'এ মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়।'

'তা কি করা যাবে! মনোবৃত্তি যদি সবসময় প্রশংসার পথ ধ'রে চলতো, তাহ'লে তো পৃথিবী স্বর্গরাজ্য হতো! বিশ্রী লাগছে আমার—খুব বিশ্রী!'

অভিমন্যু আর একটা কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, ঘরের দরজায় আবির্ভাব ঘটলো ভৃত্য শ্রীপদর। ছিম্‌ছাম্ ফিট্‌ফাট্ সভ্য চাকর। পূর্ণিমার ডানহাত।

'ছোটবৌদি, আপনাকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন।'

'আমাকে ?'

মঞ্জরী সবিস্ময়ে বলে, 'আমাকে আবার কে ডাকবে রে ? যারা ডাকে সবাইতো তোর চেনা।'

'আজ্ঞে এ ভদ্রলোক চেনা নয়। প্রকাণ্ড একটা গাড়ী চড়ে এসেছে। আপনার নাম ক'রে খোঁজ করছে।'

মঞ্জরী অভিমন্যুর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বলে, প্রকাণ্ড গাড়ী চড়ে এসে আমাকে ডাকবে, এমন কে আছে বুঝতে পারছিনা তো! যাওনা, দেখে এসোগেনা ?'

অভিমন্যুর মুখটা কেমন ছায়াচ্ছন্ন দেখায়। ও উদাসীন ভাবে বলে, 'ডাকছে তোমাকে, আমি গিয়ে কি করবো ?'

'আহা একবার দেখেই এসোনা! দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে ভদ্রলোক!'

অভিমন্যু মুচকে হেসে বলে, 'প্রকাণ্ড গাড়ী চড়ে এসেছে বলেই বুঝি এতো ভাবনা ? ...এই শ্রীপদ,

...জ্ঞেস ক'রে আয় কি দরকার ?'

শ্রীপদ নিষ্ক্রান্ত।

বলা বাহুল্য, খানিক পরেই চলে আসে সে, এবং ব্যস্তভাবে বলে, 'বৌদি, বলছে ও হচ্ছে ডিরেক্টার গগন ঘোষ, আপনার সঙ্গে একটা দরকারি কথা বলবে।'

সহসা কি এক দুর্ব্বোধ্য ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে এলো মঞ্জরীর। বোকার মতো বললো, 'দরকারটা কি তাই বল্ ?'

'শুধিয়েছিলাম। বললো, আপনাকেই চাই।'

মঞ্জরীর মুখ শুকিয়ে যায়।

কাতরভাবে অভিমন্যুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওগো, দেখোগেনা কে এসেছে! কি বলতে চায়!'

অভিমন্যু কিন্তু এ কাতরতায় বিচলিত হয়না। দিব্যি ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দেয়, 'কে এসেছে, সে তো শুনতেই পেলে, কি বলতে চায় তাও আশাকরি অনুমান করছো ? আর ডাকছে তোমাকে, আমি গিয়ে কি করবো ?'

আহত দুই চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে মঞ্জরী গম্ভীর ভাবে শ্রীপদকে বলে, 'আচ্ছা তুই বস্গে যা, আমি যাচ্ছি।'

অভিমন্যুর দিকে আর দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে এলো চুলটা হাতে জড়িয়ে, আলনা থেকে একটা ছোট স্কার্ফ টেনে নিয়ে গায়ে জড়াতে জড়াতে নীচে নেমে যায় মঞ্জরী।

জনম্ জনমকে সাথী

এসেছেন দু'জন ভদ্রলোক।

জোরালো ভদ্র। বিনয়ে বিগলিত, জোড়হাতের জোড় খোলেনা প্রায়। যাই হোক, ভদ্রতা বিনিময়ের

'ড়ে 'ভেবে দেখবো' চার

পালা ঢুকলে আসল কথা পাড়েন তাঁক, সেটা অন্ততঃ আড়াল চাই।

বঝতো।

মঞ্জরী আরক্তমুখে জানায় এ অনুরোধ রাখা নয়, মাপ করতে হবে।

কিন্তু মাপ করার জন্যে তো আর আমাপা খানিকটা সার ঢেউ, নিয়ে আসেননি তাঁরা। কোন্ কথার উত্তরে কি যুক্তি দে কিন্তু হবে, সে তাঁরা মেপেজুপেই এসেছেন। অতএব মঞ্জরীকে বুঝিয়ে ছাড়েন ভদ্রলোকযুগল—ছোট্ট একটি 'রোলে' যে টাচ্ দিয়েছে মঞ্জরী, তাতেই তাঁদের অভিজ্ঞ চক্ষু টের পেয়েছে মঞ্জরীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! 'স্টার' হবার প্রতিভা নিয়েই সে জন্মেছে। কথার বৃষ্টি। কথার ফুলঝুরি। কথার ঢেউ। কোন্‌টা থেকে আত্মরক্ষা করবে মঞ্জরী?

যতোই সে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে থাকে, তাঁরা ততোই কোন্‌ঠাসা ক'রে ফেলেন তাকে মোক্ষম মোক্ষম যুক্তিবাণে। শেষ-পর্যন্ত 'ভেবে দেখি' ব'লে তাদের আপাততঃ বিদায় করে মঞ্জরী। তবে যাবার বেলায় জানিয়ে যান তাঁরা—'ভেবে দেখা-টেখা' চলবেনা, আসতেই হবে মঞ্জরীকে দর্শকের দাবি মেটাতে। এবং এ আশ্বাসও দিয়ে যান, কাল-পরশুই আসছেন তাঁরা চুক্তিপত্রের খসড়া নিয়ে।

নীচেরতলায় ছোট্ট এই একটা ঘর নিজেদের প্রয়োজনে রেখেছে অভিমন্যু, যেটা দিনে 'বৈঠকখানা', রাতে শ্রীপদর শয়নমন্দির।

বলা বাহুল্য, শ্রী সজ্জার বালাই বিশেষ নেই, অভিমন্যুর বাবার আমলের খানকতক রংচটা চেয়ার আর একটা বনাত-মারা সেকেলে টেবিল বক্ষে ধারণ ক'রেই বৈঠকখানা নামের গৌরব বহন করছে এই

আর্গুমেন্ট
।জজ্ঞেস ক'রে আয় কি দ'াদর চৌকি আর রাজশয্যা মঞ্জরী
একটা
শ্রীপদ নিষ্ক্রান্ত। .য় মাথা ঘামায়নি, কারণ ওর বন্ধুবান্ধবী আত্মীয়
ই
বলা বাহুল্য, াসুক, সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে যায়।
বলে, 'বৌদি, ওরা এলেই এ-ঘরে এসে বসে।

সঙ্গে একটু চারদিকে একবার তাকিয়ে মঞ্জরীর মনে হলো ঘরটা কি
স। উঠে এসে শ্রীপদকে বললো, 'ঘরটা এতো বিচ্ছিরী ক'রে
রেখেছিস্ কেন?'

শ্রীপদ মাথা চুলকে বললো, 'আজ্ঞে?'

'তোর ওই তেলচিটে বিছানাটা ঢাকা দিস্‌নি কেন?'

কথাটা নতুন। তাই শ্রীপদ আর-একবার মাথা চুলকে নিলো।

অভিমন্যু খবরের কাগজের আড়াল থেকে বললো, 'এযাবৎ এতোবড়ো গণ্যমান্য অতিথির পায়ের ধূলো তো পড়েনি, তাই খেয়াল করেনি বেচারা।'

স্তব্ধ হয়ে গেলো মঞ্জরী।

স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকলো পাশের ঘরে গিয়ে।

অনেকক্ষণ কিছুই ভাবেনি।

ভাবতে পারেইনি।

হঠাৎ একটা বড়ো আঘাত খেলে যেমন আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাটা খানিকক্ষণের মতো অসাড় হয়ে যায়, তেমনি অসাড় হয়ে থাকে মনটা।

নীচে থেকে উঠে আসবার সময় ভাবছিলো—মঞ্জরীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকার জন্যে অভিমন্যুর উপর তীব্র অভিমান

দেখাবে, যা সাংঘাতিক অবস্থায় প'ড়ে 'ভেবে দেখবো' চার আঙ্গুলে রেহাই পেতে হয়েছে তাকে, সেটা অন্ততঃ আড়াল থেকেও দেখলে পারতো অভিমন্যু। দেখলে বুঝতো।

সে সব কিছুই হলোনা।

স্তব্ধ হয়ে থাকতে থাকতে কোথা থেকে আসে চিন্তার ঢেউ, সে ঢেউ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় মঞ্জরীকে! বিপদ? কিন্তু এই বিপদই কি মনে মনে প্রার্থনা করছিলো না মঞ্জরী? এইতো ক'দিন আগে জামাইবাবুকে নিজে হাতে ক'রে চিঠি দিয়েছে সে অভিমন্যুর অজানিতে। দ্বিতীয়বার পর্দ্দায় নামবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেইতো সে চিঠি।

তবে?

জামাইবাবুর প্রেরিত লোকও তো হতে পারে এরা!

না কি ঈশ্বর প্রেরিত?

মঞ্জরীর গোপন প্রাণের কামনা শুনেছেন তিনি, পাঠিয়েছেন অভীষ্ট পূরণের সুযোগ। এ সুযোগকে দুর্য্যোগ ব'লে সরিয়ে দেবে মঞ্জরী?

টুক্‌রো টুক্‌রো ভাঙাচোরা লাইন। ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে মনের মধ্যে। ভাঙতে থাকে মঞ্জরীর দ্বিধা।...

'নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনার এখনো কোনো ধারণা নেই মঞ্জরীদেবী...'

'কি আশ্চর্য্য! এতে নিন্দে হবার দিন এ-যুগে আছে নাকি?...'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। সম্ভ্রান্তঘরের মেয়েরাই তো আজ-এ-লাইনে বেশী আসছেন...'

আর্গুমেন্ট। বিশ্বাস না হয়, অনুগ্রহ ক'রে একদিন আসুন আমার বাড়ী।'

'কে বলেছে এ-কথা আপনাকে? ...বাড়ী থেকে পালানো মেয়ে?... হা হা হা, কী যে বলেন? বাপ মেয়েকে নিয়ে, স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে এসে সাধ্যসাধনা করছে—'

'তাদের?'

'সকলের মধ্যেই কি প্রতিভার অঙ্কুর থাকে মঞ্জরীদেবী?'

না, সকলের মধ্যেই কিছু আর সঞ্চিত থাকেনা প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ, সকলকেই কিছু আর চান্স দিয়ে দিয়ে দেখা যায়না।

তাই যারা সাধ্যসাধনা ক'রে মরে, তাদের 'বেরিয়ে যাবার' দরজা দেখিয়ে দিয়ে জহুরী পরিচালক গগন ঘোষ 'জহর'এর দরজায় এসে সাধ্যসাধনা করছেন!

মঞ্জরী নিজে জানেনা।

জানেনা কোথায় লুকোনো আছে তার প্রতিভার সেই অগ্নি-ভাণ্ডার! যার থেকে উৎসারিত একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে ওরা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে মঞ্জরীকে!

কিন্তু মঞ্জরী এখন কি করবে?

হায়! অভিমন্যু যদি তার এই দুঃসাধ্য চিন্তার ভাগীদার হতো!

কিন্তু কেন?

কেন অভিমন্যুর এই অসহযোগিতা?

জনম্
জনমকে
সাথী

বিজয়বাবু সোল্লাসে বললেন, 'এই ছাখো! মনে মনে যা চাইছিলি, হাতে হাতে তাই পেয়ে কাঁদুয়া

...কিয়ে ছুটে এসেছিস্ মানে? বরং চাইছিলি চার ...লি ষোলো আনা। এ আর নিজের দিক থেকে নয়, আবেদন-নিবেদন ওপক্ষে। এ যে আশার ...

...র আপত্তি তোলে—'মেয়েটাকে কি উচ্ছন্নে পাঠাতে ...ছ, নিমিত্তের ভাগী তুমিই হ'লে।'

...নকে তো হতেই হবে। আমার কিন্তু বেজায় ...াগছে। গগন ঘোষ বাড়ী বয়ে এসে খোসামোদ ক'রে যায়! ...া খালী। তবে আর 'সৌখিন অভিনয়' নয়। মোটা টাকার ...নিয়ে ...স থাক্ গ্যাঁট হয়ে, দেখিস্ ঠিক দেবে। ওদের যখন ...সব পড়ে, তার জন্যে—'

...মো তুমি।'

...ঠে সুনীতি 'ককৃখনো নয়! পয়সা নিয়ে করা মানেই ...শাদার হয়ে যাওয়া—'

জয়বাবু হতাশার ভানে বলেন, 'কি মুস্কিল! এ-জগতে ...দার নয় কে? প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু পেশা আছে কি?'

...াক্। তাই ব'লে ভদ্রলোকের মেয়ে রূপগুণ বেচে পয়সা—'

...ধীরে সুনীতি, ধীরে। রূপের কথা উঠছে কেন? রূপ তো ...র ...টবোনের চাইতে তোমার এখনো অনেক বেশী, তোমাকে ...কেউ 'অফার' করবে? কেউ না। তবে হ্যাঁ, গুণের কথাটা ...আছে। কিন্তু গুণ বেচে পয়সা নিচ্ছেনা কে? ...কারা নিচ্ছেননা? বাদিকারা? লেখিকারা? ...কা? শিক্ষিকা? সীবনিকা? বুননিকা? কে

জনমে জনমে সাথী

সুনীতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে উত্তর খোঁজে, তার আগেই প্রিয়বাবু আবার বলেন, 'আরে শোনো। আসলে মঞ্জুর মতো আম[illegible] হয়েছে, ছুঁড়ি একটা পুরো ভালো পার্টে নেমে ওর ক্যাপাসিটি দেখিয়ে দিক সবাইকে। এই শেষবার।'

মঞ্জরীও মনে মনে সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে চুক্তিপত্রে [illegible] করলো। এই শেষবার!

আছে অভিলাষ পূরণের উন্মাদনা, আছে অনু[illegible] হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার স্বস্তি, আছে ভয়, [illegible] আছে অসহায়তা।

তরুণ একখানি বুক, কি ক'রে বইবে এতোগুলে[illegible] ভার?

আর—দেহের সঙ্গোপনে তিল তিল ক'রে বর্দ্ধি[illegible] অজানিত অনুভূতির ভার? তার জন্যেও যে ক[illegible] কতো যন্ত্রণার আনন্দ। যেন কী এক নিরলম্ব অনি[illegible] পথ হারাতে বসেছে মঞ্জরী, কেউ আশ্বাসের [illegible] দেবার নেই।

মাঝে মাঝে দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কী এক অ[illegible] মোচড় দেয়, থরথর ক'রে ওঠে বুক, অকারণে চোখের [illegible] জল ওঠে উপ্‌চে।

অথচ বলতে পারেনা কারো কাছে।

কাকে বলবে?

যাকে সব বলতে পারতো, আবেশে আর [illegible] লজ্জায় আর গৌরবে, সে যেন কাচের দেওয়া[illegible]

গগন ঘোষের দরকার ছবির। মনস্তত্ত্বের তত্ত্বকেণা নিয়ে তিনি করবেনটা কি? তার চেয়ে বাবা দরকার মতো গল্প তৈরি ক'রে নিলাম, চুকে গেলো ল্যাঠা। বাহুল্য অংশের বালাই থাকেনা তাতে। কিছুই না, প্রথমে গোটাকতক 'সিচ্যুয়েশান' গ'ড়ে ফেলে মনশ্চক্ষে দেখে নেওয়া—কোন্ কোন্ অভিনেতা অভিনেত্রীকে কোন্ ভূমিকায় ঠিক খাপ্ খাবে। ব্যস। তারপর খানিকটা কৌশল ক'রে 'সিচ্যুয়েশান'গুলো গেঁথে ফেলা একটা গল্পের চেন্ গ'ড়ে নিয়ে।

ব্যস। আর কি চাই?

ছবি তৈরি করতে আসল যেটা চাই, সে হচ্ছে প্রযোজক। শাঁসালো একটি প্রযোজক জোগাড় ক'রে ফেলতে পারলেই ছবি হয়। নইলে গল্প? ওটা গৌণ।

ছুটো দিন বসেই তো এই 'কমলিকা' গল্পটা তৈরি ক'রে ফেলেছেন গগন ঘোষ। এতে নেই কি? যেমন গান আছে, নাচ আছে, রঙ্গতামাসা আছে, তেমনি আছে ছুঃখের সাঁতার-পাথার, শোকের অগ্নিদহন। কুঞ্জবনও আছে, শ্মশানও রইলো। একটা আদালতের দৃশ্য নইলে ছবি জমেনা, ওটা আছে, একটা রোগশয্যা আর ডাক্তার চাই, ওটাও আছে। একটা কাণা খোঁড়া কুঠে আতুর অথবা বোবা কালা কি বিকলাঙ্গ নাহ'লে আবার আজকাল নাকি বায়োস্কোপ থিয়েটার জমেনা, কাজেই ওটাও রাখতে হয়েছে।

তবে?

এতো সব দরকার-মাফিক জিনিস, কোনো নামকরা লেখকের লেখা বইতে মিলবে? মিলবেনা। কাজেই সে বই নিলে, ভাঙতে-চুরতে জোড়াতালি দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কি দরকার অতো ঝামেলায়?

গগন ঘোষ পাকা লোক, তিনি জানেন লোকে কি চায়। মানে, তাঁর দেশের লোক। জানেন—তারা, যে ইমারত ধ্বসে পড়ছে, তার ভাঙা ইঁটপাটকেলগুলো আঁক্‌ড়ে প'ড়ে থাকতে চায়। তাই তাদের জন্যে চাই একান্নবর্ত্তীপরিবারের মহৎ উদারতা আর অপূর্ব্ব একাত্মতার ছবি, চাই হিন্দুনারীর অদ্ভুত পাতিব্রত্যের রোমাঞ্চকর ছবি।

'কমলিকা' সেই ছবি দেখাবে।

অবশ্য মৃতস্বামীকে যমরাজের কাছ থেকে কেড়ে আনানোটা নেহাত দেখানো চলেনা, তাই মৃতস্বামীর প্রতিকৃতির সামনে বৈধব্যের পবিত্র মূর্ত্তি দিয়ে ছবি শেষ।

কাহিনী শুনে মনটা প্রথম একটু খুঁৎখুঁৎ করেছিলো মঞ্জরীর। ওই বিধবার দৃশ্যটা যদি না থাকতো। কিন্তু এ খুঁৎখুঁতুনি প্রকাশ করা চলেনা। সেটা হবে লোকহাসানো। মনকে চোখ রাঙিয়ে এ দ্বিধাকে তাড়ালো। তাড়িয়ে ফেললো আধুনিক মনকে দিয়ে পিতামহীর সংস্কারকে।

মেক্‌আপের সময় যখন রূপসজ্জাকার ফণীদাস আধখাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই, তখুনি সেই হাত দিয়ে তুলে ধরে মঞ্জরীর ছোট্ট একটি টোলখাওয়া নিটোল চিবুকটি, আর তেমনি তুলে ধ'রে রেখেই অপরহাতে রঙিন তুলি বুলিয়ে বুলিয়ে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের উপর আনে কৃত্রিমতা, বিধাতার উপর চালায় মানুষের কারসাজি, তখন রূঢ় পরুষ পুরুষস্পর্শে, আর উগ্রকটু কড়া সিগারেটের গন্ধে ঘৃণায় সর্ব্বশরীর শিরশিরিয়ে দিব্যি অম্লানমুখে ব'সে থাকতে শিখলো মঞ্জরী।

জনম্ জনমকে সাথী

শিখলো বারো-ভূতের সঙ্গে ব'সে সস্তা পেয়ালায় চা খেতে, শিখলো আরো অনেক কিছু আধুনিকতা।

না শিখলে এরা যদি সেকেলে ব'লে হাসে!

স্মার্টনেসে কাকলীদেবীদের ওপর টেক্কা দিতে না পারলে কৃতিত্বটা কি?

'আপনি এই প্রথম নামছেন তো?'

প্রশ্ন করলো সহ-অভিনেতা নিশীথ রায়।

নায়ক সাজবে নিশীথ।

আর সে রূপগুণ ওর আছেও। বরং মঞ্জরীর মতো এমন নাম-খ্যাতি-বিহীনা নায়িকাকে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়াটাই আশ্চর্য্য। সেও হয়তো মঞ্জরী সম্পর্কে অবজ্ঞার ভাবই মনে পোষণ করতো, যদি না মঞ্জরী এমন একখানি নিখুঁৎ সুন্দর মুখের অধিকারিণী হতো। তাছাড়া শুনেছে শিক্ষিতা মহিলা। অতএব সম্ভ্রম ভাব নিয়েই আলাপ করতে আসে।

'প্রথম? না তো!' উত্তর দেয় মঞ্জরী 'এর আগে 'মাটির মেয়ে'তে ছোট্ট একটা রোলে নেমেছিলাম।'

'ও!' 'মাটির মেয়ে'র নামও শোনেনি নিশীথ রায়। নিজের বই ছাড়া অন্য বই দেখবার ফুরসতই জোটে না। তাই 'ও' ব'লে অন্য কথা পাড়ে, 'আপনাকে অনেক দূর থেকে আসতে হয়?'

'তা হয়।'

নিশীথ আশা করেছিলো এই প্রসঙ্গে হয়তো মঞ্জরী

নিজের বাড়ীর ঠিকানার সন্ধান দিয়ে ফেলবে, কিন্তু মঞ্জরী ছোট্ট ওই উত্তরটুকুতেই কাজ সারলো।

অতএব আবার প্রশ্ন।

'খুব অসুবিধে হয় নিশ্চয়ই ?'

'অসুবিধে আর কি! বেশ মজাই তো লাগে।'

নিশীথ রায় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মৃদুহেসে বলে, 'এখন—প্রথম প্রথম মজা লাগবে, এরপর—যখন নাইতে খেতে অবকাশ পাবেননা, তখন মনে হবে সাজা।'

মঞ্জরী একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ ক'রে বলে, 'সে স্টেজ আসবার সম্ভাবনা নেই। এই 'বিজয়িনী'ই আমার শেষ অভিনয়।'

নিশীথ রায় বিস্মিত দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত ক'রে বলে, 'তার মানে ?'

'মানে অতি সোজা। নিছক সখের খাতিরে দু'বার নামলাম।'

নিশীথ রায়ের মুখে আসছিলো "বিনা পারিশ্রমিকে ?" কিন্তু সামলে নিলো। বললো, 'আপনি ছাড়তে চাইলেই কি আর 'কম্‌লী ছাড়বে' ? বাড়ী থেকে কেড়ে আনবে। বিশেষ ক'রে আপনার মতো—ইয়ে শিক্ষিতা মহিলাকে।'

এবারেও সামলে নিয়েছে জিভকে। বলতে যাচ্ছিলো, 'আপনার মতো সুন্দরী মেয়েকে।'

একবারের জন্যে বুকটা কেঁপে উঠলো মঞ্জরীর।

বাড়ী থেকে কেড়ে আনবে ?

কেড়েই তো এনেছে। সে ইতিহাস এই নিশীথ রায় জানে নাকি ?

এই নিয়ম নয় তো এখানকার ? তোমার ইচ্ছে না থাকলেও এদের প্রয়োজনের দুর্ব্বার আকর্ষণে আসতেই হবে আপন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ? মনের মধ্যে কেমন একটা অসহায় শূন্যতা বোধ করে মঞ্জরী। কে

তাকে এদের এই তীব্র আকর্ষণ থেকে রক্ষা করবে? অভিমন্যু যে তাকে ঝড়ের মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখতে চাইছে।

আশ্চর্য্য! অভিমন্যু কি ক'রে এমন বদলে গেলো? বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত এদের বাড়ীর সনাতনী আক্রমণ থেকে কি ভাবে মঞ্জরীকে আগ্‌লে এসেছে অভিমন্যু সে কথা তো ভুলে যায়নি মঞ্জরী।

ভিতরে একটা অসহায় শূন্যতা বোধ করলেও বাইরে সহজে দমেনা মঞ্জরী, গম্ভীরমুখে বলে, 'কেড়ে আনতে চাইলেই আনা যায়?'

নিশীথ রায় দৃঢ়স্বরে বলে, 'যায়! শুধু এ-লাইনেই নয়, সারা জগতের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখুন, এই কেড়ে আনার খেলাই চলছে। প্রয়োজন! প্রয়োজনই হচ্ছে শেষ কথা! কার প্রয়োজনে কোথায় কি ঘটছে চট ক'রে বোঝা শক্ত, তবু এটা ঠিক, সবাই আমরা অপরের প্রয়োজনের দাস। এই প্রয়োজনের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাতে হাজারে হাজারে নিরীহ ছাত্র রাজনীতির হাঁড়িকাঠে মাথা দেয়, লাখে লাখে অবোধ চাষী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ খোয়ায়, কোটি কোটি সতীমেয়ে সম্ভ্রম আর পবিত্রতা হারায়।'

চম্‌কে ওঠে মঞ্জরী, শিউরে কাঁটা দিয়ে ওঠে দেহের প্রতিটি রোমকূপ, প্রতিটি রক্তকোষে রক্তকণার অগ্নিবিস্ফোরণ!

এ কী কথা?

এ কোন্ ভাষা?' কোন্ ভয়ঙ্করের ইঙ্গিত এ? নিশীথ রায় কি তাকে ভয় দেখাতে চায়? অম্লানমুখে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে একী নিষ্ঠুর ভয় দেখানো! মঞ্জরীকে ভয় দেখিয়ে ওর লাভ কি? তবে কি এ সাবধানবাণী? হিতাহিত জ্ঞানহীন মঞ্জরীকে সাবধান ক'রে দিতে চায় নিশীথ রায় অভিজ্ঞ বন্ধুর মতো?

মনের মধ্যে প্রশ্নের তাণ্ডব নর্ত্তন, দেহের মধ্যে রক্তের।

তবু কণ্ঠে আত্মসংবরণ ক'রে বলে মঞ্জরী, 'নিজের খুঁটিতে নিজে ঠিক থাকলে কিছুই হয়না।' বলে বটে, তবে কণ্ঠস্বরটা ভারি ক্ষীণ শোনায়।

'নিজের খুঁটি?'

হেসে ওঠে নিশীথ রায়। হেসে আর-একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'মহাভারতের গল্প জানেন? ভীমের মুঠোর টানে শিকড়সুদ্ধ তালগাছ উঠে আসার গল্প? পড়েননি? শোনেননি?'

মঞ্জরী কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে পড়ে।

হঠাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে চিড়িক্ মেরে উঠেছে একটা ক্রূর যন্ত্রণা! অপ্রত্যাশিত অজানা যন্ত্রণা!

নিশীথ রায় বিস্মিতভাবে বলে, 'কি হলো? শরীর খারাপ বোধ করছেন?'

চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলিয়ে চোখ দুটো একবার বুজে অসহ্য অবস্থাটা একটু সাম্‌লে নিয়ে মঞ্জরী মাথার ইসারায় সম্মতি জানিয়ে বলে, 'হুঁ। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো।'

মাথার কথাই বলা ভালো, যেটা সচরাচর, যেটা স্বাভাবিক।

নিশীথ রায় চিন্তার ভান দেখিয়ে বলে, 'তাইতো! মুস্কিল হলো তো! আবার এখুনি গিয়ে লাগতে হবে। বেশী অসুবিধে বোধ করছেন নাকি?'

'নাঃ। ঠিক আছে।' ব'লে উঠে দাঁড়ায় মঞ্জরী। সহ-পরিচালক

নলিন মিত্তির অদূরে দাঁড়িয়ে হাতের ইসারায় ডাক দিচ্ছেন।

কি বিশ্রী এদের এই ভঙ্গিগুলো!

একজন বাইরের ব্যক্তি কোনো ভদ্রমহিলাকে

হাতের ইসারায় ডাকতে পারে এ-কথা আগে কখনো ভাবতে পারতো মঞ্জরী ? আর সে ভদ্রমহিলা আর কেউ নয়, মঞ্জরী নিজেই। এবং আরো অদ্ভুত কথা, বিনা প্রতিবাদে সে ডাকের নির্দ্দেশে গুটিগুটি এগিয়েও যাচ্ছে মঞ্জরী !

নাঃ ! এসব জায়গায় প্রেষ্টিজ থাকেনা। মোটে না। খুব শিক্ষা হচ্ছে।

এই শেষ ! এই শেষ !

নিশীথ রায়ও উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলে, 'নাঃ ! আর একপেয়ালা চা না খেলে চলছেনা। কই—আমাদের বিষ্টুচরণ গেলেন কোথায় ? মঞ্জরীদেবী, আপনার চলবে না কি ?'

'না !'

'খেলে পারতেন। শরীরটা ঠিক হয়ে যেতো।'

'ঠিকই আছে।'

ব'লে এগিয়ে যায় মঞ্জরী। কিন্তু সত্যিই কি ঠিক আছে ? সেই অদ্ভুত অজানা ক্রুর যন্ত্রণাটা বারেবারেই যে ছোবল্ হান্‌ছে মেরুদণ্ডে, মেরুদণ্ড বেয়ে বেয়ে কটিতে পাঁজরে।

তবু মুখের হাসি বজায় রেখে কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতেই হবে। বিশেষ ক'রে ভূমিকার এই অংশটুকু। প্রেমগর্ব্বিতা তরুণীবধূ পতির প্রবাসযাত্রা বন্ধ করতে চায় হাসি কথা সোহাগের ব্রহ্মাস্ত্রে। স্বামী অর্থাৎ নিশীথ রায়ের হাত ধ'রে মধুর হাসি আর বিলোল কটাক্ষ-পাতের সঙ্গে বলতে হবে মঞ্জরীকে, 'যাওতো দেখি এ বাঁধন ছাড়িয়ে ? দেখি কতো জোর ?'

জনম্ জনমকে সাথী

অনেকবার শোনা পার্ট, তবু অনেকবার 'সট' নিতে

হয়। কিছুতেই প্রকাশভঙ্গি স্বাভাবিক হচ্ছেনা মঞ্জরীর। বিরক্তি-তিক্তকণ্ঠে গগন ঘোষ বলেন, 'আগের' সট্‌টা তো বেশ ওতরালো, হঠাৎ কি হলো আপনার? মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন বিছে কামড়াচ্ছে। নতুনদের নিয়ে এইতো হয় মুস্কিল! এই দিব্যি হলো, এই মার্ডার কেস্।...ওহে দীপক, কি মনে হচ্ছে? আরও একটা 'সট' নিতে হবে নাকি?'

দীপক নির্লিপ্তভাবে বলে, 'হয়ে যাক্!'

অতএব আবার উৎফুল্লমুখে ছুটে এগিয়ে আসা, আবার নিশীথ রায়ের হাত ধ'রে মধুরহাসি আর বিলোল কটাক্ষপাতের সঙ্গে উচ্চারণ-করা—'যাওতো দেখি এ বাঁধন ছাড়িয়ে? দেখি কতো জোর?'

আজকের মতো এইটুকু হলেই শেষ, অথচ শেষ আর হতে চাইছেনা। মঞ্জরীর নিজের দোষেই যে হতে চাইছেনা সে-কথা খেয়াল করেনা মঞ্জরী, ক্রমশঃই ক্লিষ্ট আর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

যাক্, বাঁধন কাটাকাটির পর্ব্ব শেষ হয় আজকের মতো। নিশীথ রায়ের অন্যত্র সুটিং আছে, সে খালি হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই তোড়জোড় গুটিয়ে নেওয়া হলো। পরিচালক গগন ঘোষ বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে ফের বলেন, 'আপনার হঠাৎ কি হলো?'

শ্রান্তসুরে মঞ্জরী উত্তর দেয়, 'অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'তাই নাকি? আহা-হা ইস্! ওরে কে আছিস্, একটা ট্যাক্সি—'

জনম্
জনমকে
সাথী

নিশীথ রায় আর-একবার হাতের ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে নির্লিপ্ত সুরে বলে, 'আমিও নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি, অবশ্য মঞ্জরীদেবীর যদি আপত্তি না থাকে।'

ট্যাক্সির জন্য অনেক অপেক্ষা করতে হবে, মঞ্জরী আর ব'সে থাকতে পারছেনা যেন। আপত্তি? আপত্তি আর কিসের? তাছাড়া সেটা যে বড্ড সেকেলেপনা। কাজেই মৃদুহাসির সঙ্গে বলতে হয়, 'আপত্তি? বরং বেঁচে যাই। ভীষণ ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে।'

গাড়ীতে উঠে নিজেকে একটা কোণের দিকে প্রায় ফেলে দিয়ে ব'সে থাকে মঞ্জরী, আর নিশীথ রায়ের হাতের গাড়ী যেন চলন্ত জলস্রোতের মতো তরতর ক'রে এগিয়ে যায়। কেউ কোনো কথা বলেনা। কিছুক্ষণ পরে নিশীথ রায়ই নীরবতা ভঙ্গ করে, 'পথ চিনিয়ে দেবার ভার কিন্তু আপনার, আমি আপনার বাড়ী চিনিনা।'

মঞ্জরী ঘাড় তুলে উঠে ব'সে বলে, 'চেনেননা? ওমা! এতোক্ষণ তাহ'লে ঠিক পথে এগোচ্ছেন কি ক'রে?'

নিশীথ রায় ঘাড়টা এদিকে ফিরিয়ে সহাস্যে বলে, 'কতকটা আন্দাজে! ভাবছিলাম, চালিয়ে তো যাই, ভুল হ'লে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ উঠবে।'

মঞ্জরী একসেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ আগ্রহের সঙ্গে বলে, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় জগতের সমস্ত প্রতিবাদই শুধু ভুলের বিরুদ্ধে?'

'এককথায় এর উত্তর দেওয়া শক্ত। আসলে বোধকরি, নিশ্চিন্ত ব্যবস্থার শৃঙ্খলে বাঁধা মানুষের দলের ওপর কোনো নাড়া পড়লেই প্রতিবাদ ওঠে। যুগযুগান্তের কুসংস্কার মনের উপর কেটে ব'সে থাকে গায়ের উপর চামড়ার মতো, সে সংস্কারকে উৎপাটিত করতে চাইলে আর্ত্তনাদ ওঠাই স্বাভাবিক।'

'তাহ'লে সে প্রতিবাদে, সে আর্ত্তনাদে, কান না দেওয়াই উচিত?'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিশীথ রায় মৃদুহেসে বলে, 'আপনি যে কেন এ-প্রসঙ্গ তুলেছেন বুঝেছি। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, কয়েকজনের স্বার্থত্যাগ, কয়েকজনের বিদ্রোহ, কয়েকজনের দুঃসাহসই বাকি চলার পথ সুগম ক'রে দেয়।'

'কিন্তু উচিত-অনুচিতের প্রশ্নও তো আছে?'

'অবশ্যই। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর অপরের কাছে নেই। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে 'উচিতবোধ' নামক জিনিসটা আছেই।'

'তাহ'লে তো জগতে কোনো অন্যায় ব্যাপারই ঘটতো না।'

'এ তর্কের শেষ নেই।'

'আচ্ছা, আপনি বোধহয় খুব পড়াশোনা করেন?'

'পড়াশোনা? হায় হায়! বাসনা তো খুবই, সময় কোথা?'

'জানেন—আগে আপনাদের সম্বন্ধে কী সাংঘাতিক কৌতূহলই না ছিলো? এখন নিজেই এসে গেলাম আপনাদের দলে।'

'এখন বোধকরি কৌতূহল ভঙ্গ হয়েছে?'

'কি জানি! ···দাঁড়ান, থামুন, আর সোজা এগোবেন না, ডানদিকে বাঁকতে হবে।·· উঃ!'

'কি হলো?'

'কিছু না। মাথার যন্ত্রণাটা—'

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিমন্যু দেখতে পায় ভালো একখানা গাড়ী দাঁড়ালো বাড়ীর সামনে, নামলেন ভালো সুট-পরা এক ভালো চেহারার ভদ্রলোক, নামলো মঞ্জরী। বিনীত নমস্কারের ভঙ্গিতে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানালে ভদ্রলোককে, ঢুকে এলো বাড়ীর মধ্যে। ভদ্রলোকটি নিতান্ত তরুণ বয়স্কের মতো লাফিয়ে ফের গাড়ীতে উঠে চালিয়ে দিলে।

জনম্
জনমকে
সাথী

খানিকটা শব্দ, খানিকক্ষণ শূন্যতা।

অভিমন্যু কি তাড়াতাড়ি মঞ্জরীকে সম্ভাষণ করতে যাবে? না কি যেচে প'ড়ে জিগ্যেস করতে যাবে, নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো যিনি তোমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তিনি কে?

কে যাচ্ছে সম্ভাষণে? মনের মধ্যে তো শুধু বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা!

না, অভিমন্যু গেলোনা, অভিমন্যু তেমনি স্থাণুর মতোই দাঁড়িয়ে থাকলো বারান্দার রেলিঙের সামনে। পিছন থেকে মঞ্জরীই ডাক দিলো। ক্ষীণ করুণ কণ্ঠ—'শুনছো! একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে পারো?'

চম্‌কে মুখ ফিরিয়ে তাকালো অভিমন্যু।

'ডাক্তারবাবুকে? কেন? কি হলো?'

'শরীরটা ভয়ানক খারাপ লাগছে। বোধহয়—বোধহয়—তুমি যাও, এক্‌খুনি যাও। দেরী করলে মুস্কিল হবে—'

অভিমন্যু উদ্বিগ্ন অথচ রুক্ষভাবে ব'লে ওঠে, 'হলো কি হঠাৎ? পড়ে-টড়ে গেছো না কি? তাই বুঝি গাড়ী ক'রে—'

'আঃ! প্রশ্ন পরে কোরো, দোহাই তোমার। তাড়াতাড়ি যাওগে।'

দরজার পর্দ্দাটা ঠেলে ঘরে ঢুকেই মাটিতে শুয়ে পড়ে মঞ্জরী, আর বোধকরি সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞান হারায়।

জনম্ জনমকে সাথী

নিঃশব্দ চলা···নিঃশব্দ বলা···আলোয় নেই প্রখরতা। মৃদু নীল আলোটা জ্বলছে ঘরে, পাখার ব্লেড্ ক'খানা ঘুরে চলেছে আস্তে আস্তে।

ডাক্তার এইমাত্র বিদায় নিয়ে গেছেন, বিদায়

নিয়ে গেছেন মেজদা আর মেজবৌদি। শুধু দুই দিদির মধ্যে একজন রোগিণীর মাথার শিয়রে ব'সে আছেন। অপরজনা মায়ের কাছে ব'সে হা-হুতাশ করছেন। পূর্ণিমাদেবী প্রায় ভেঙে পড়েছেন। বিধাতা যদি তাঁকে এমনভাবে আশাবৃক্ষের মগডালে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেন, মানুষকে তিনি কি দোষ দেবেন?

এই তিন-চার মাস ধ'রে মনে মনে নিজের জীবনের যে নূতন প্রতিষ্ঠামন্দির রচনা করছিলেন পূর্ণিমা, তার ভিত্তিপ্রস্তরখানা স্থাপিত হবার আগেই গেলো গুঁড়িয়ে, মঞ্জরীর উড়ন্ত ডানাকে কেটে তাকে মাটিতে নামাবার আশা শূন্যে মিলোলো, অপরিণত অঙ্কুরটি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

অচৈতন্য মঞ্জরী জানতেও পারলোনা কতোটা ক্ষতি হয়ে গেলো তার, কিন্তু পূর্ণিমা তো মনে-প্রাণে অনুভব করছেন কী পরিমাণ ক্ষতি তাঁর হলো!

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বিদায় নিয়েছেন, পারিবারিক চিকিৎসক নীলাম্বর ঘোষকে ডাকা হয়েছে কেবলমাত্র আশ্বাসের আশায়। শুধু তাই নয়, অপরপক্ষে আবার তাঁর সম্মান রক্ষার প্রশ্নও আছে। অভিমন্যুর বাবার আমলের ডাক্তার নীলাম্বর, প্রায় আত্মীয় অভিভাবকের সামিল।

খাটের বাজু ধ'রে অভিমন্যু দাঁড়িয়ে, রাগিণী নিমীলিত নেত্রে শয্যালগ্না।

রক্তচাপ নির্ণয়ের যন্ত্রটা গুছিয়ে খাপে ভরতে ভরতে নীলাম্বর ডাক্তার বলেন, 'না, এদিকে অন্য কোনো গোলমাল নেই, গোটাকয়েক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিলেই

ঠিক হয়ে যাবে আশা করা যায়।'

অভিমন্যু একবার নিথর নিদ্রিতার দিকে দৃষ্টির পলক ফেলে মৃদুস্বরে বলে, 'কিন্তু হঠাৎ এরকম হওয়ার কারণটা কি মনে হয় আপনার ?'

'কারণ বলা শক্ত। মাত্র একটাই তো কারণ হতে পারেনা, কোনো অসুখেরই তা হয়না। সাধারণতঃ অনেক রকম ছোটখাটো কারণ জমতে জমতে দেহযন্ত্রের মধ্যে হঠাৎ বড়ো একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়, অথবা যন্ত্রগুলো হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে।'

'তবু এরকম ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা কারণ থাকেও তো ?'

নীলাম্বর মৃদু গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'তা থাকে বটে। ধরো যেমন প'ড়ে গিয়ে আঘাত লাগা, আকস্মিক কোনো শোকে মনে শক্ লাগা, রাগ দুঃখ ভয়, শারীরিক দুর্ব্বলতা অনেকগুলো কারণই ধরা হয়। সে-সব যখন নয়, তখন মনে হচ্ছে জেনারেল হেল্‌থটাই হয়তো ঠিক ছিলোনা। বাইরে থেকে এসেই এরকম হলো বলছিলেনা ? কোথায় গিয়েছিলে ? নেমন্তন্ন ?'

বলার জন্যেই বলা।

প্রবীণ লোক, ধ'রে নিয়েছেন 'বাইরে যাওয়ার' ব্যাপারে অভিমন্যু অবশ্যই সঙ্গী ছিলো। কাজেই তার রিপোর্ট প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট। ইতিপূর্ব্বে 'কারণ' সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে 'কারণ' তিনিও পাননি। সব কথাতেই 'না' ব'লে গেছে অভিমন্যু।

ডাক্তারের প্রশ্নে আর একবার সচকিত হয়ে অভিমন্যু বলে, 'না। এম্‌নি একটু বেড়াতে—ইয়ে কতোদিন রেষ্ট্ নেওয়া দরকার মনে করেন ডাক্তার কাকা ?'

জনম্
জনমকে
সাথী

'কতো আর ?' প্রস্থানের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে নীলাম্বর ডাক্তার বলেন, 'দিন দশেক একেবারে শুয়ে থাকুন, তারপর হপ্তাতিনেক বাড়ীতেই ঘোরাফেরা এই আর কি। ভাবনার কিছু নেই, ভাবনার কিছু নেই!'

চলে যান ডাক্তার, পিছু পিছু অভিমন্যু।

হাতে হাতে টাকা দেওয়া চলেনা, আত্মীয়ের মতো ডাক্তার। গাড়ীতে ওঠার পর নিঃশব্দে টাকাটা পকেটে গুঁজে দিয়ে আর-একবার ম্লানভাবে বলে, 'তাহ'লে আপনি বলছেন ভয়ের কিছু নেই ?'

'না হে বাপু না! বলছিই তো ঘাবড়াবার কিছু নেই, এসব তো হামেসাই হচ্ছে। তবে—কিছুদিন দৌড়ঝাঁপটা একটু বন্ধ রাখতে হবে এই আর কি। ছোটবৌমা তো আবার একটু চঞ্চল আছেন। তোমাদের কাকীমা বলছিলো, 'সিনেমা' না কি করছেন! ব্যাপারটা সত্যি নাকি ?'

অবাক হবোনা ভেবেও অবাক হলো অভিমন্যু।

আশ্চর্য্য! কোথাকার খবর কোথায় না যায়!

কুণ্ঠিত হাসি হেসে অভিমন্যু বলে, 'আর বলেন কেন, যতো-সব পাগলামী খেয়াল। যাক্ এইবারে শিক্ষা হলো! ইয়ে—ইন্‌জেকশন যা দেওয়া হচ্ছে, কালকেও হবে ?'

'ওবেলার অবস্থা দেখে! ইয়ে—তোমার মিত্তিরসাহেব কি বলছেন ?'

'উনি তো ব'লে গেলেন চালিয়ে যেতে আরো দু'তিন দিন।'

জনম্ জনমকে সাক্ষী

'আমার তো মনে হচ্ছেনা দরকার হবে। তবে ওঁরা হলেনগে স্পেশালিষ্ট, ওনাদের কথাই শিরোধার্য্য।'

হেসে ওঠেন নীলাম্বর, ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দেয়।

মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অভিমন্যু উপরে উঠে এলো। দেখলো নার্স টা রোগিণীর মুখের কাছে ঝুকে কি যেন বলছে। ঈষৎ আগ্রহভরে অভিমন্যু চাপা-গলায় প্রশ্ন করে, 'উনি কি কথা বলছেন মিসেস দাস?'

'হ্যাঁ, জল চাইলেন একটু আগে, আর আপনি কোথায় তাই জানতে চাইছিলেন।'

পূরো তিনটে দিন কথা বলেনি মঞ্জরী, জ্ঞান ফিরলেও অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রিতার মতোই প'ড়ে আছে।

অভিমন্যু এগিয়ে খাটের কাছে যেতেই নার্স মিসেস দাস মুরুব্বিয়ানা চালে বলে, 'কথা বলাবার চেষ্টা করবেননা, তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। শুধু চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে দিন।'

'কথা বলাচ্ছিনা' ব'লে অভিমন্যু কাছে গিয়ে নীরবে মঞ্জরীর একখানা হাতের উপর হাত রাখে—রোদের আওতায় ঝলসানো রজনীগন্ধার ডাঁটির মতো শিথিল কোমল যে হাতখানি এলিয়ে পড়েছিলো বিছানার পাশে।

চোখ মেলে তাকালো মঞ্জরী, তাকিয়ে থাকলো একটুক্ষণ বোবাদৃষ্টি মেলে, তারপর সেই বোবাচোখে এলো ভাষার ভার। অনেকদিনের অনেক অকথিত বক্তব্যের ভার, পুঞ্জীভূত অভিমানের সঞ্চিত ভার, না-জানা না-বোঝা এক অশরীরী ভয়ের প্রশ্নভার।

তারপর চোখটা আবার বুজলো, আস্তে আস্তে সময় নিয়ে। আর বোজার পর দীর্ঘ পল্লবের প্রান্ত বেয়ে বড়ো বড়ো দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

'মিষ্টার লাহিড়ী, আপনি অনুগ্রহ ক'রে পাশের ঘরে যান। দেখছেন না, পেসেণ্ট আপসেট্ হচ্ছেন।'

নার্স মিসেস দাসের বিনীত কাতর অনুরোধ বাক্য।

গ্রামের মেয়ে, অভাবে প'ড়ে সহরে এসে কোনোরকমে এই বিদ্যাটি অর্জ্জন ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করছে, তাই অধীত বিদ্যার প্রতি তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা। সে জানে রোগীকে ডিস্টার্ব করতে নেই, আর এও জানে, সবথেকে ডিস্টার্ব রোগীর নিকট-আত্মীয়-স্বজনরাই করে, এতএব ঘর থেকে তাদের যথাসম্ভব বিতাড়িত করাই কর্ত্তব্য। তাছাড়া—ছোট হয়ে বড়োর উপর, শ্রমিক হয়ে মনিবের উপর, অভিজ্ঞ হয়ে অজ্ঞের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে পেলে সে সুযোগ কে ছাড়ে ?

অভিমন্যু লজ্জিত হয়ে সরে এসে বলে, 'আচ্ছা পাশের ঘরেই রইলাম আমি, প্রয়োজন বোধ করেন তো ডাকবেন। কিন্তু কেন উনি আমার খোঁজ করছিলেন সেটা তো—'

'সেটা কিছুই নয় মিষ্টার লাহিড়ী, সেন্স্ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খোঁজাই তো স্বাভাবিক।'

'তাহ'লে আমার তো এ-ঘরেই থাকা উচিত ছিলো মিসেস দাস, ইয়ে যদি আবার খোঁজ করেন—'

'না না মাপ করবেন। দরকার বোধ করলে আমি নিজেই ডাকবো! দেখলেন তো আপনাকে দেখে কিরকম ইয়ে হয়ে পড়লেন ?'

জনম্ জনমকে সাথী

নির্ভুল কর্ত্তব্য পালনের গৌরবে গৌরবান্বিতা মিসেস দাস রোগিণীর মাথার কাছে গুছিয়ে বসেন।

অভিমন্যু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পাশের ঘরে গিয়ে একটা আরামচেয়ারের উপর শুয়ে পড়ে অভিমন্যু, আর সহসা তার শরীরের মধ্যে যেন একটা তপ্ত বাষ্পোচ্ছ্বাসের আলোড়ন জাগে।

কি নিষ্ঠুরতা করেছে সে!

কি হৃদয়হীনতা!

মঞ্জু! মঞ্জু! তার আদরিণী মঞ্জরী, অভিমানিনী মঞ্জরী, কী কষ্টই তাকে দিয়েছে এতোদিন ধ'রে! অভিমানে অভিমানেই ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে মঞ্জরী! হ্যাঁ, তাই। ডাক্তার ঘোষ বলেছেন, 'দুর্ব্বলতাও একটা কারণ'। ইদানীং কী দুর্ব্বলই না হয়ে গিয়েছিলো বেচারী, অথচ সেদিকে তাকিয়ে দেখেনি অভিমন্যু। মনে মনে খালি অপরাধের বিচার করেছে।

যদি মঞ্জরী মারা যায়!

যে-কথা মুখে উচ্চারণ করতে শিউরে ওঠে মানুষ, সে-কথা মনের মধ্যে নিঃশব্দে উচ্চারিত হতে থাকে, তার উপর হাত নেই কারো। তাই গলাটেপা প্রাণীর দম আট্‌কানো বুকের মতো পাথর চাপানো বুকের মধ্যে অবিরত ধ্বনিত হতে থাকে—মঞ্জরী যদি মারা যায়, মঞ্জরী যদি না বাঁচে! নিজেকে তাহ'লে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে অভিমন্যু?

লজ্জা রাখবার ঠাঁই কোথা?

পুরুষ অভিমন্যু, শক্ত অভিমন্যু, নিজের সমস্ত মানমর্য্যাদ বিস্মরণ হয়ে যায়, তারও নিমীলিত দুটি চোখের প্রান্ত বেয়ে বড়োবড়ো দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে, যেমন ক'রে ফোঁটার পর ফোঁটা ঝরে যাচ্ছে পাশের ঘরে আর দুটি বোজা-চোখের কোণ থেকে।

দু'জনের বেদনা বিভিন্ন।
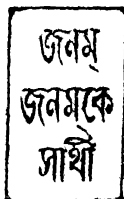
একজনের মনে অভিমান আর আশাভঙ্গের বেদনা, অপরজনের আক্ষেপ আর অপরাধবোধের। কিন্তু অশ্রুজলের রূপ এক।

প্রেম কি মরে?

না শুধু অভিমান আর ভুলবোঝার কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে মাঝে মাঝে মৃতের মতো মলিন দেখায়?

ছেলের ভাবে-ভঙ্গিতে ক্রমশঃই হতাশ হয়ে পড়েন পূর্ণিমা! এ কী ছেলে তৈরি করেছেন তিনি! পুরুষমানুষ, না একটা মাটির ঢেলা? দুর্দ্দান্ত বৌ, বেপরোয়া বৌ, কোনো বিধি-বিধান না মেনে, যথেচ্ছাচার ক'রে এই অঘটনটা ঘটালো, আর তাঁর ছেলে কিনা সেই বৌয়ের জন্যে উদভ্রান্ত উন্মাদ হয়ে বেড়াচ্ছে! নাওয়ার ঠিক নেই, খাওয়ার ঠিক নেই, কলেজের মুখো হচ্ছেনা, শুধু বৌয়ের ঘরের ধারে-কাছে ঘুরঘুরুনি! সেকাল হ'লে, আর তেমন শক্ত পুরুষ হ'লে ও বৌকে আর ঘরে নিতো কিনা সন্দেহ।...

পূর্ণিমার এই ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন দেয় তাঁর আদরের বড়োমেয়ে। পূর্ণিমা যেটা শুধু মনে ভাবছিলেন, সে সেটা সরবে ঘোষণা করে:

'সহজ বৌ, সুস্থ বৌ, সেজেগুজে বাড়ী থেকে বেরোলো, আর ক'ঘণ্টা পরেই বেড়িয়ে ফিরে আসতে না আসতেই এই ব্যাপার? মানেটা কি? তোমরা যদি চোখ থাকতে অন্ধ সেজে ব'সে থাকো, লোকে তো আর অন্ধ হয়ে ব'সে থাকবেনা মা?'

পূর্ণিমা বোধকরি ঠিক এ ধরনের সুরটা পছন্দ করেননা, অথচ বড়োমেয়ের কথার প্রতিবাদ করতেও সাহসে কুলোয়না, তাই তাড়াতাড়ি বলেন, 'কি জানি মা, কি করছিলেন সেখানে! হয়তো নাচতে-টাচতে বলেছিলো।'

'হুঁ, নাচ নয়, নেত্য! কতো রকমের নেত্যই আছে মা, হিসের রাখো তার? তবে মোট কথা তোমার সোহাগের ছোটবৌমাটির জন্যেই বাপের বাড়ী আসা ঘুচলো আমাদের। অন্ততঃ আমার। এরপরে আর আসতে চাইবো কোন্ মুখে? ছোটবৌয়ের এ ব্যাপারে কে না সন্দেহ করবে?'

স্পষ্ট পরিষ্কার নির্ভুল রায়।

এর উপর আর প্রতিবাদ চলেনা।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে সকলেই ওই একই ইসারা দেয়। একটা জীব যে পৃথিবীর আলো না দেখতেই অন্ধকারের রাজ্যে ডুবে গেলো তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মঞ্জরী!

কে জানে এ দুর্ঘটনা স্বেচ্ছাকৃত কিনা!

'কতো কলকৌশলই তো বেরিয়েছে আজকাল। নিজের ওই সব নেত্য বন্ধ হয়ে যাবার ভয়েই হয়তো—'

অভিমন্যুর কান বাঁচিয়ে কোনো কথাই হয়না! বরং মনে হয় কানে ঢোকাবার জন্যেই চেষ্টা। নাঃ, কেউ আর সমীহ করছেনা অভিমন্যুকে।

মঞ্জরীই তার মর্য্যাদাহানি করেছে।

মেজবৌদি এসে ঘন্টা-দুই বসেন আর সমানে আক্ষেপ ক'রে চলেন—'আহা! কতো আশা ক'রে রূপোর ঝিনুক-বাটি গড়াতে দিয়েছিলাম ছোট ঠাকুরপোর ছেলের মুখ দেখবো ব'লে, ফুলকেটে কাঁথা সেলাই করছিলাম, সব গুড়েই বালি পড়লো গো!'

জনম্ জনমকে সাথী,

'শুধু শুধু' অম্‌নি হলেই হলো? আমি এই স্ট্যাম্প কাগজে সই ক'রে দিচ্ছি, এর মধ্যে রহস্য আছে।'

মায়ের ঘরে আসতে-যেতে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় অভিমন্যুকে।

কতো স্বচ্ছন্দে কী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করছে এরা?

তবে কি আর কিছু?

মেয়েরাই মেয়েদের সহজে চেনে!

রোদে-গলা মোম রোদ-পড়া সন্ধ্যায় শুকিয়ে শক্ত হয়ে ওঠে।

মমতায় গলা হৃদয় ক্রমশঃ শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে ওঠে সন্দেহের পঙ্ক স্পর্শে!

ওরা অভিজ্ঞ, ওরা পাকা, ওরা ঝুনো, ওরাই তো জগৎকে ঠিক বোঝে, ওদের কথা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি অভিমন্যুর?

ক'দিন আগে নার্সটাকে মনে হচ্ছিলো শত্রু।

ভেবেছিলো ওটা বিদেয় হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে যাবে মঞ্জরীর কাছে। নির্জ্জন সান্নিধ্যের সুযোগ মিললেই ক্ষমা প্রার্থনায় দীর্ণ-বিদীর্ণ ক'রে ফেলবে নিজেকে। বলবে, 'মঞ্জু, আমি পাগল, আমি পশু, আমি জঘন্য, তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

একা ঘরে বার বার উচ্চারণ করেছে, 'মঞ্জু তুমি বেঁচে ওঠো। ক্ষমা করো! ক্ষমা করো।'

কিন্তু নার্সটার যখন বিদায় নেবার সময় এলো, তখন সে ভাবোচ্ছ্বাস শুকিয়েছে। দাঁড়িপাল্লার অপর পক্ষের পাল্লায় অন্যায়, অপরাধ, অসঙ্গত দুঃসাহসের

বাটখারাগুলো চাপাতে চাপাতে নিজের দিকটা হাল্কা হয়ে উঠে পড়েছে।

ফুরিয়েছে **সশঙ্ক** রাত্রি জাগরণ, ঘুচেছে মৃত্যুভয়। এখন ক্ষমা প্রার্থনার চিন্তাটা হাস্যকর।

অজ্ঞান নয়, চৈতন্যের বিলুপ্তি নয়, শুধু অপরিসীম একটা ক্লান্তিভার। সে ভার চেপে ব'সে থাকতে চায় দুই চোখের উপর।

মুদিতনেত্রের নীচে আচ্ছন্ন অদ্ভুত একটা অনুভূতি!

ঘরে এতো লোক কারা?···

ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলছে, মৃদু চরণে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়··· কতোজনের পায়ের শব্দ, কতোজনের নিঃশ্বাসের ভার!

মঞ্জরী কোথায় আছে?

ঘরে, না বাইরে? গাড়ীতে? নিশীথ রায়ের গাড়ীতে? না কি 'স্টুডিও'য়? কি হয়েছে তার? অসুখ? কি অসুখ? কিছুক্ষণ আগেও কি অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হচ্ছিলো না? সে যন্ত্রণা সর্ব্বশরীরে মোচড় দিয়ে দিয়ে কি এক ভয়ের রাজ্যে পৌঁছে দিচ্ছিলো না মঞ্জরীকে?

সে যন্ত্রণাটা তো আর টের পাচ্ছেনা!

এখন শুধু ঘুম!

কোমল গভীর নিথর একটা ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যাওয়া!

এটা কি? রাত্রি?

হ্যাঁ, এই হাল্‌কা নীল আলোটা তো রাত্রেই জ্বলে।

কিন্তু এতো লোক কেন তবে?

মঞ্জরীর আশেপাশে শিয়রে, ঘরে দালানে দরজায়? ওরা কেন কথা বলছেনা? ওরা কেন বাতাসের ফিস্‌ফিসানিতে চুপিচুপি ইসারা করছে? চেঁচিয়ে কথা

বলুক না ওরা, যেমন ক'রে সহজ মানুষে কথা কয়। ওরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলুক না মঞ্জরীর কি হয়েছে।

দরজার কাছে কে দাঁড়িয়ে? অভিমন্যু না?

ওর মুখ অতো বিষণ্ণ কেন?

ক্লান্তির ভারে ভেঙেপড়া চোখের দৃষ্টি, তবু ধরতে পারছে মঞ্জরী অভিমন্যুর মুখে কি বিষণ্ণতা!

প্রাণের মধ্যে হাহাকার ক'রে উঠতে চায়, দু'হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকতে ইচ্ছে যায়, কিছুই হয়না! শুধু ঠোঁটটা একটু নড়ে ওঠে, শুধু চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁঠা জল গড়িয়ে পড়ে।

'তুমি কে?'

'আমি নার্স!'

'নার্স? নার্স কেন?'

'কেন? কেন আবার? জানেননা কি ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন?'

'ব্যাপার? কিসের ব্যাপার?'

'না না ইয়ে—আপনার অসুখ করেছে, তাই।'

'অসুখ!···কি অসুখ?'

'এমনি! অসুখ করেনা মানুষের?'

'ও!'

আবার ক্লান্তিতে বুজে আসে দু'চোখের পাতা। আবার স্পষ্ট অনুভূতির জগৎ থেকে হারিয়ে যাওয়া।

আবার সেই রুদ্ধশ্বাস কক্ষে···অকারণ পদশব্দ, অর্থহীন ফিস্‌ফিসানি!···

'ওষুধটা খেয়ে ফেলুন মিসেস লাহিড়ী।'

'ওষুধ? ওষুধ কেন?'

'কি মুস্কিল! আপনার যে অসুখ করেছে।'

'ও, হ্যাঁ! আচ্ছা দাও!'

'আর জল খাবেন?'

'না। তোমার নাম কি?'

'প্রিয়বালা। প্রিয়বালা দাস!'

'ও! ঘরে আর কে আছে?'

'এখন আর কেউ নেই, আমি আছি শুধু।'

'একটু আগে কি ডাক্তার এসেছিলো?'

'হ্যাঁ! এইমাত্র চলে গেলেন।'

'ডাক্তার কি বললো?'

'বললেন তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবেন।'

'আঃ! তা বলছিনা।'

'কি বলছেন তাহ'লে মিসেস লাহিড়ী, অ্যাঁ?'

'বলছি—বলছি—কি অসুখ?'

'কিছু না। এমনি দুর্ব্বলতা!'

'শুধু?'

সন্দেহের কাঁটা তীক্ষ্ণ মুখ দিয়ে বিঁধে চলেছে, তবু স্পষ্ট ক'রে জিগ্যেস করতে সাহস হয়না। জিগ্যেস করবার ভাষাই বা কি?

'প্রিয়বালা!'

'এই যে! কি বলছেন?'

'ইনি কোথায়?'

'কে? মিষ্টার লাহিড়ী? এই যে এইমাত্র নীচে নেমে গেলেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।'

'একবার ডেকে দিওতো।'

'এখন থাক্ মিসেস লাহিড়ী। এখন বেশী কথা বলতে চেষ্টা করবেননা। শুধু শান্ত হয়ে ঘুমোন।'

'ঘুম? আর কতো ঘুমোবো?'

'যতো পারেন। ঘুমই এখন আপনার একমাত্র ওষুধ!'

'আচ্ছা।'

'মিসেস দাস। উনি কি ঘুমোচ্ছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ!'

'কোনো উপসর্গ নেই তো?'

'আজ্ঞে না।'

'কথা-টথা কি একেবারেই বলছেননা?'

'সামান্য। কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আপনি আর কথা বলবেননা মিষ্টার লাহিড়ী—পেসেণ্টকে উত্তেজিত হতে না দেওয়াই আমাদের

'ধন্যবাদ!'

উচ্ছন্ন যাও তুমি। বোকা শয়তানী।

'নার্স'কে আজ ছেড়ে দিচ্ছি।'

অভিমন্যু এসে দাঁড়ালো।

বালিশে ঠেশ দিয়ে বসেছিলো মঞ্জরী, পায়ের উপর আলোয়ানঢাকা, হাতে হাল্কা একখানা সিনেমা-

পত্রিকা। বইটা মুড়ে রেখে চোখ তুলে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললো, 'হ্যাঁ, প্রিয়বালা বলেছে।'

'ছ্যাখো ভালো ক'রে ভেবে। ছেড়ে দিলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

আশ্চর্য্য সুন্দর ক'রে একটু হাসলো মঞ্জরী।

'না না মোটেই না। ভালো হয়ে গেছি তো। আর এরপর তো তুমিই আছো।'

এ হাসিতে প্রাণ দোলে, এ নির্ভরতায় মন গলে! বিছানার এক ধারে ব'সে প'ড়ে অভিমন্যু বলে, 'আমার আর কতোটুকু সাধ্য? সোজাসুজি জ্বর-টর হয়—খুব জোর মাথার আইসব্যাগ চাপাতে পারি।'

মঞ্জরী আবার হাসে—'সব সময় বুঝি শুধু সোজাসুজি ব্যাপারই ঘটবে?'

'ঘটেনা—বলেই তো মুস্কিল। উঃ, মাথাটি তো একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছিলে। না সত্যি, এমনি অসুখ-বিসুখ হ'লে অতো ভাবনা হয়না, এই সব তোমাদের মেয়েলি কাণ্ডে—'

'তা—একটি মেয়ে নিয়ে ঘর করবে, অথচ মেয়েলি কাণ্ড পোহাতে পারবে না এ তো হয় না।'

সহজ পরিহাসের কথা, মুচ্‌কি হাসির সঙ্গে উচ্চারিত। কিন্তু অপরপক্ষের কোমল দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভালোবাসার সম্পর্কে যখন ফাটল ধরে তখন বুঝি এইরকমই হয়। অর্থহীন তুচ্ছ কথার কদর্থ আবিষ্কার ক'রে অনর্থ ঘটে।

এলিয়ে বসার ভঙ্গিতে ঋজুতা এসে পড়ে বোধকরি অজ্ঞাতসারেই। ঋজু-কঠিন অভিমন্যু নীরস গলায় বলে, 'পারবো না' বললেই বা ছাড়ছে কে?

পারতেই হবে। তবে দৈব দুর্ঘটনাকে মেনে নেওয়া যতো সহজ, ডেকে আনা বিপদকে মেনে নেওয়া ততো সহজ নয়।'

অভিমন্যুও খুব বেশী গভীর অর্থবোধক কিছু বলবার কথা ভাবেনি, কিন্তু মঞ্জরীর কানে ওর মন্তব্যটা রূঢ়ভাবে বাজলো। সেও কঠিন সুরে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো, 'ডেকে আনা বিপদ' কথাটার মানে ?'

'মানেটা নিজের মধ্যেই খোঁজো।'

'নিজের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম হবে। আমি তোমার মনের ভাবটা তোমার মুখেই সোজাসুজি স্পষ্ট জানতে চাই।'

'স্পষ্ট কথা শোনার সাহস হবে ?' বাঁকা হাসি হাসলো স্যু।

'নিশ্চয় হবে। স্পষ্ট কথা শোনার সাহস তার থাকেনা যার নিজের মধ্যে গলদ আছে। আমার সাহস না হবার কোনো কারণ দেখিনা।'

'বটে না কি ?' ব্যঙ্গহাসির প্রলেপ মাখানো এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মধ্যে অবিশ্বাসের অপমান।

মঞ্জরী আরক্তমুখে ব'লে উঠলো, 'স্পষ্ট ক'রে বলো কী বলতে চাইছো তুমি ?'

অভিমন্যু ততোক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বুকের উপর আড় ক'রে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে নিষ্করুণভাবে বলে, 'আলাদা ক'রে আমি কিছুই বলতে চাইনা, প্রত্যেকে যা বলছে আমি শুধু সেইটাই মনে পড়িয়ে দিচ্ছি।'

জনম্ জনমকে সাথী

'অশেষ ধন্যবাদ।' মঞ্জরী ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়। তার ভাণ্ডারেও ব্যঙ্গহাসির অপ্রতুলতা নেই। ছুরির মতো হাসি হাসতে সেও জানে।

'অশেষ ধন্যবাদ!' কিন্তু দুঃখের বিষয়—তোমার প্রত্যেকে কি বলছেন আমার জানা নেই।'

'প্রত্যেকে যা ঠিক তাই বলছে! যথেচ্ছাচার ক'রে বেড়াবার ফলেই এই বিপদ। তবে তোমার কাছে অবশ্য বিপদ নয়, বিপদ মুক্তি!'

'বিপদ মুক্তি! আমার কাছে বিপদ মুক্তি?'

'তা কতকটা তাই বৈ কি! অনিচ্ছুক মনের উপর অবাঞ্ছিত একটা দায় চেপে বসেছিলো, সে দায়টা ঘুচলো। দেখা যাচ্ছে ভগবান সত্যিকার প্রার্থনা কান পেতে শোনেন।'

'কি বললে?' বাণ-খাওয়া পাখীর গলায় রুদ্ধ আর্ত্তনাদ ওঠে 'ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করেছিলাম আমি?'

রূঢ় কথার নেশা বড়ো সর্ব্বনেশে নেশা। এই বাণবিদ্ধ পাখীটার যন্ত্রণা দেখেও মমতা আসে না অভিমন্যুর, বরং একটা হিংস্র উল্লাস ফুটে ওঠে চোখে মুখে। শিকারীর নিষ্ঠুর উল্লাস!

'এ ছাড়া আর কি ভাবা যায়?' ঝক্‌ঝকে [illegible] চোখে সন্ধানী-দৃষ্টির আলো ফেলে শিকারী ব[illegible] বিদ্ধ। যে জঞ্জাল তোমার কাছে বির[illegible] হচ্ছে [illegible] যথেচ্ছ 'মুড়ি' স্বাধীনতা খর্ব্ব হচ্ছিলো, সে জঞ্জা[illegible] দূর [illegible]রবার জন্যে পিষ্ঠ, তুমি কাছে প্রার্থনা জানাবে এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? স্বেচ্ছাকৃত নয়, তারই বা নিশ্চয়তা কি!'

মঞ্জরীর

এ কী কদর্য্য কুৎসিত সন্দেহ!

তীব্র বিদ্যুতাহতের মতো সহসা একবার প্রচণ্ডবেগে চম্‌কে উঠেই মঞ্জরী পরক্ষণে স্থির হয়ে গেলো। ক্ষণপূর্ব্বে চোখের স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে বাষ্প জমে
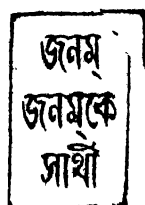
উঠেছিলো, এই তড়িৎ শক্তিতেই বোধকরি শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে উঠলো সে বাষ্প। খাটের বাজুটা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে বললো মঞ্জরী, 'হ্যাঁ ঠিক। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছো। কিন্তু এতো নীচ হয়ে গেছো তুমি, এতো নোংরা, এতো জঘন্য, তা জানতাম না।'

'তা বটে! বিশেষণগুলো আমার প্রতিই প্রযোজ্য বৈ কি! পাঁচঘণ্টা বাড়ীর বাইরে কাটিয়ে, একটা বদমাইসের গাড়ী চড়ে বাড়ী ফিরেই যদি—'

'যাও! যাও তুমি এ-ঘর থেকে। যাও যাও বলছি। নইলে আমিই যাচ্ছি—'

উত্তেজনায় শয্যাসীনা রোগিনী খাট থেকে নেমে দরজা পর্য্যন্ত গিয়েই সমস্ত মান-মর্য্যাদার প্রশ্ন ভুলে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

[illegible] [illegible]না নয়, হাসপাতালের খাট।

[illegible] [illegible] সেই স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ডাক্তারের মধ্যে [illegible] [illegible] ধরে আবার চলেছিলো বিপদের আশঙ্কার বাড়া-মঞ্জরী। চলেছিলো যমে-মানুষে টানাটানি, ক্রমশঃ আবার ভালো চাইছো তু[illegible]ছে। ডাক্তার অভিমত দিয়েছেন, ক্রাইসিস্ কেটেছে।

উপর 'আ[illegible]

[illegible] জনম্

রাস্তার ওপারে একটা নাম-না-জানা গাছ, সবুজ পাতার যৌবনে উল্লসিত। কেবিনের এই জানলাটা দিয়ে দেখা যায় গাছটাকে। সারাদিন রোদে আর বাতাসে ঝিলমিল করে তার সেই সোনালি সবুজ পাতাগুলো।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মঞ্জরী আর ভাবে।

কী ভাবে ?

কতো কী ভাবে। হাসপাতাসের খাটে শুয়ে শুয়ে মঞ্জরী যেন দার্শনিক হয়ে উঠেছে। ভালোবাসা। ভালোবাসা। এই ভালো-বাসা শব্দটাকে নিয়ে আদি অন্তকাল ধরে কতো কাণ্ড। কিন্তু কি তার মূল্য ? ও যেন শব্দের হাটের একটা সৌখিন পণ্য। ওকে নিয়ে যতো বিজ্ঞাপন ততো প্রচার। সবটাই আরোপিত। ···অশ্বত্থতলায় পাথরের নুড়ি। দৈবাৎ কবে কে ভুল ক'রে একটা ফুল ছুঁড়েছিলো তার গায়ে, পরবর্ত্তীকাল সেই ভুলের তল্পি বইছে। নুড়ির গায়ে জমাট হয়ে উঠেছে সিঁদুরের প্রলেপ, জমেছে ফুল বিল্বপত্রের পাহাড়। কেউ আর নুড়ি বলেনা, বলে, 'বাবাঠাকুর'।

বাবাঠাকুরের মাথার উপর সোনার ঝালর রূপোর ছাতা, বাবাঠাকুরকে ঘিরে মন্দির উঠেছে সাতচূড়োর। ঝড় লাগতে দেয়না কেউ বাবাঠাকুরের গায়ে, দেয়না বৃষ্টির জল লাগতে। ফুল পাতার পাহাড় নড়েনা, সিঁদুরলেপা গায়ের রং মোছেনা।

পাথরের এই নুড়িটাকে নিয়ে কতো গৌরব, কতো মহিমা। কতো স্তবগান রচিত হচ্ছে তার নামে, কতো বন্দনা, কতো প্রশস্তি। কতো আরতি আলিম্পন নৈবেদ্য। বাবাঠাকুর। বাবাঠাকুর। 'নুড়ি' বললে আর রক্ষা নেই তোমার। তাহলেই তুমি পাপিষ্ঠ, তুমি শয়তান, তোমার মতবাদ মানবতাবিরোধী !

রোগশয্যায় পড়ে থেকে থেকে দার্শনিক হয়ে যাওয়া মঞ্জরীর চোখে বুঝি ধরা পড়ে গেছে 'বাবাঠাকুর'এর স্বরূপ।

জনম্ জনমকে সাথী

ভালোবাসা। সাবানের ফানুসের মতো একটা অদ্ভুত ফাঁকা অপূর্ব্ব রংচঙে জিনিস। ওকে কাঁচের
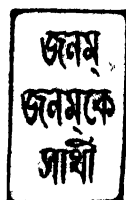
আলমারিতে সাজিয়ে রাখতে পারো, সুন্দর! চমৎকার! এতোটুকু টোকা লাগাও, ব্যস্ ফিনিস্!

তবে?

কাঁচের আলমারিতে সাজানো এই জিনিসটা থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি! এই শূন্যগর্ভ রঙিন খেলনাটাকে বজায় রাখতে যদি জীবনের আর সমস্ত সম্ভাবনাকে বিকিয়ে দিতে হয়, চলন্ত জীবনের মূল্যে কিনতে হয় অবরুদ্ধ কারাগার, কি প্রয়োজন তাতে?

যে আশ্রয়ে নিশ্চিন্ততা নেই, সে আশ্রয়ের মূল্য কোথায়?

এমনি অনেক কথাই ভাবে মঞ্জরী হাসপাতালের খাটে শুয়ে। কেবিনের জানলা দিয়ে দেখা যায় একটুক্রো আকাশ, দেখা যায় নাম-না-জানা এক নতুন-বসন্ত-লাগা গাছের সোনালি সবুজ পাতার ঝিলিমিলি।

বিকেলে সুনীতি এলো, এলেন বিজয়ভূষণ।

আজ অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে মঞ্জরীকে, অনেকটা স্বাস্থ্যরক্তিম। বাইরে থেকে অনেকখানি রক্ত শরীরে চালান করানোর জন্যে সে রক্তাভা একটু যা কাল্‌চে।

'বাবাঃ! তোর হাসি মুখ দেখে তবু বাঁচলাম। দু'বার ক'রে কী ভোগানই ভোগালি বেচারা অভিমন্যুকে।' সুনীতির কথার ধরন-ধারণই ওই। সব সময় সুনীতি পুরুষজাতির পক্ষ টেনে কথা বলবে।

জনম্ জনমকে সাথী

বিজয়ভূষণ ফুলফোর্সে পাখা খোলা থাকা সত্বেও হাতের রুমালটা নেড়ে বাতাস খাওয়ার ভঙ্গি করতে

করতে বলেন, 'তোমার মন্তব্যটি তো চমৎকার! আর ওর ভোগাটা বুঝি কিছুই নয়?'

'আহা, তাই কি আর বলছি? ও তো ভুগলোই, তার সঙ্গে সে বেচারাও তো কম ভুগলো না?'

'দেখছিস্ শালী, দেখছিস্?' বিজয়ভূষণ করুণ বচনে বলেন, 'সব সময় তোর দিদির পরপুরুষের প্রতি পক্ষপাত! আর এই যে একটা অভাগা আজ পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ওঁর জন্যে অহরহ ভুগে চলেছে, তার দুঃখের কথা একবার মনেও পড়েনা।'

'ঢং! ঢং আর গেলোনা কোনোদিন! ...মঞ্জু তুই কবে ছাড়া পাবি শুনেছিস্ কিছু?'

'ছাড়া?' মঞ্জরী একটু দুষ্টুমীর হাসি হেসে বলে, 'ছাড়া পেতে আর দিলে কই তোমরা? সকলে মিলে তো খাঁচার দরজা চেপে রেখে ছাড়া পাওয়াটা আট্‌কালে।'

'বটে রে পাজী মেয়ে! খুব কথা শিখেছিস্ যে! ঠাট্টা রাখ্, বাড়ী ফেরার দিন-টিন শুনিস্‌নি কিছু?'

'কই না! মঞ্জরী অদ্ভুত একটা উদাস হাসি হেসে বলে, 'শুনেই বা কি হবে! ভাবছি বাড়ীতে আর ফিরবো না।'

'দুর্গা দুর্গা! এ কী অলক্ষণে কথা রে!'

বিজয়ভূষণ গম্ভীরভাবে বলেন, 'হঠাৎ এতো বৈরাগ্যের উদয় কেন? সে শালা তো ইদিকে 'পরিবার পরিবার' ক'রে জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব পণ ক'রে ব'সে আছে দেখতে পাই। তবু মন পাচ্ছেনা বুঝি?'

'মন? ওটা কি আর একটা পাবার জিনিস জামাইবাবু?'

'সেই তর্কই তো আবহমানকাল ধরে চলে আসছে।'
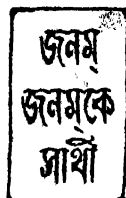
'কোনেদিনই মীমাংসা হবেনা। আচ্ছা বড়দি, একটা পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল কথার উত্তর দেবে? এখান থেকে ও-বাড়ীতে না গিয়ে আমি যদি তোমার বাড়ী গিয়ে থাকতে চাই, জায়গা দেবে?'

প্রস্তাব শুনে সুনীতি চম্‌কে ওঠে, বিজয়ভূষণও।

এ কোন্ ধরনের কথা?

চম্‌কানিটা সামলে নিয়ে সুনীতি সহজ হবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি বলে, 'শোনো কথা! আমি বলে সেইজন্যেই পাঁচবার তোর ছাড়া পাওয়ার দিন জানতে চাইছি। এখান থেকে ছুটি হলেই কিছুদিন তোকে নিয়ে গিয়ে আমার কাছে রাখবো ব'লে মরছি। মা থাকলে তো এ-সময় মার কাছেই—'

মঞ্জরী বাধা দিয়ে শান্তগলায় বলে, 'আমি তো কিছুদিনের জন্যে বলছিনা বড়দি, চিরদিনের জন্যে বলছি।'

বিজয়ভূষণ আরো গম্ভীরভাবে বলেন, 'অভিমানের নদী যেন সীমালঙ্ঘন ক'রে কূলপ্লাবিত ক'রে ফেলেছে মনে হচ্ছে দেবী মঞ্জরী!'

'অভিমান-টভিমান কিছু নয় জামাইবাবু, এটা আমার গভীর চিন্তার সিদ্ধান্ত।'

সুনীতি ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'তা সমস্ত দিন বাজে কথা চিন্তা করলেই তার ফল এই হয়। কি একখানা উপন্যাসে সেদিনকে ঠিক এমনি একটা কথা পড়ছিলাম। কিন্তু ঘর-গেরস্তর মেয়ে তো আর উপন্যাসের নায়িকা নয় মঞ্জু? সিনেমা সিনেমা করার পর থেকেই আমি তোর ভাবান্তর লক্ষ্য করছি। আমি তো ভেবে অবাক হয়ে যাই—অতো ভাব ছিলো অভিমন্যুর সঙ্গে—'

মঞ্জরী সহসা হেসে উঠে বলে, 'আমিও তো তাই

ভেবে-ভেবেই অবাক বনে যাচ্ছি বড়দি। অতো ভাব ছিলো—হঠাৎ তার এতো অভাব কি ক'রে হলো?'

'তোমারই বুদ্ধির দোষে। আর কি জন্যে?'

'তাই হবে। কি জানো বড়দি, আগে ধারণাটা একটু ভুল ছিলো। জানতাম, ব্যবসাবাণিজ্য বজায় রাখতেই বুদ্ধির দরকার, ভালোবাসা জিনিসটা একবার এসে গেলে জমা থেকেই যায়। ওকে বজায় রাখতে হলেও যে বুদ্ধির দরকার হয় ঠিক জানতাম না। যাক্‌গে, তোমার বাড়ীতে তাহ'লে জায়গা হবেনা? জানতাম অবিশ্যি হবেইনা। তবু ব'লে দেখলাম।'

সুনীতি ব্যাকুলভাবে বলে, 'চল্‌না বাপু! যতোদিন ইচ্ছে থাকবি। অভিমন্যু যতোদিন না তোর পায়ে ধরে মান ভাঙাবে—'

মঞ্জরী মৃদু হাসে, 'তুমি ঠিক তোমার মতোই রয়ে গেলে বড়দি! মান-অভিমানের কথাই নয় এটা। জীবনের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কথা। কিন্তু ও তুমি বুঝবেনা। তা তুমিই সত্যি সুখী।'

বিজয়ভূষণ বলেন, 'তাহ'লে শ্যালিকা-ঠাক্‌রুণের কি ধারণা কেবলমাত্র অবোধরাই সুখী?'

মঞ্জরী হেসে ফেলে বলে, 'সব ক্ষেত্রে নয়, ব্যতিক্রমও আছে। যেমন আপনি।'

'হুঁ।'

'আচ্ছা জামাইবাবু, একটা প্রশ্ন করবো খুব ভালো ক'রে ভেবে উত্তর দেবেন?'

'আজ্ঞে হোক্‌।'

'ধরুন বড়দি যদি খুব একটা অন্যায় কাজ করেন, খু—ব অন্যায়—মানে, ধরুন ভীষণ নিন্দনীয়, বড়দির প্রতি আপনার কী মনোভাব হবে?'
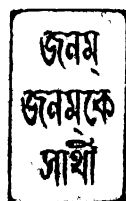
'হুঁ! কী মনোভাব হবে! রসগোল্লা খাওয়ার মতো অবশ্যই নয়। একটা লাঠালাঠি কাণ্ড ঘটে যাবে অবশ্যই!'

'লাঠালাঠি কাণ্ড করবার মতো হাল্‌কা দোষের কথা আমি বলছিনা জামাইবাবু—'

'বুঝেছি, সিনেমা করার মতো ভারীভুরি দোষের কথা বলছিস্! তাহ'লে—মানে, তোর বড়দি সিনেমায় নামলে—'

'আর জামাইবাবু, আপনাকে আর সিরিয়াস করা যাবেনা। মনে করুন দিদি কাউকে খুনই ক'রে বসলো—'

বেছে বেছে সবচেয়ে জোরালো কথাটাই বলে মঞ্জরী।

বিজয়ভূষণ সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠেন, 'তাহ'লে? তাহ'লে দেশে যতো উকিল ব্যারিষ্টার আছে লাগিয়ে দিয়ে ক'সে মামলা লড়বো, যাতে ফাঁসি রদ হয়।'

'নাঃ! আপনার কাছে উত্তর পাওয়ার আশা বৃথা। কিন্তু আপনি কি সত্যিই কোনোদিন ভেবে দেখেছেন জামাইবাবু, আপনাদের হু'জনের ভালোবাসা অক্ষয় অটুট কি না, ধাক্কা লাগলে ভেঙে পড়ে কি না।'

'তা যদি বলিস্ ভাই, কোনোদিনই ভেবে দেখিনি সত্যি। তোর বড়দির সঙ্গে যে আমার ভালোবাসার সম্বন্ধ এই কথাটাই কোনো-দিন স্মরণে আসেনি। যেমন কোনোদিন ভেবে দেখিনি আমার এই মাথাটা ঘাড়ের ওপর ঠিক ভাবে ফিট্ করা করা আছে কি না, হঠাৎ কোনো ধাক্কা লাগলে স্ক্রু খুলে প'ড়ে যাবে কি না।'

জনম্ জনমকে সাথী

সুনীতি এই সব রহস্যাবৃত কথা হু'চক্ষে দেখতে পারেনা, তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, 'বাজে কথা রেখে কাজের কথা কও তো। আমি বলি কি, অভিমন্যুকে বলি, মঞ্জুকে আমি এখন নিয়ে যাই, শরীরটা বেশ

সারুক, ওর যখন ইচ্ছে হবে যাবে। আর সত্যি, শরীর অশরীরে তো মেয়েরা মা বোনের কাছেই যায়। গোড়া থেকে আমি যদি নিয়ে যেতাম ছাই, তাহ'লে হয়তো এ কাণ্ড হতোই না।'

মঞ্জরী হতাশ দৃষ্টিতে তাকায়, আশ্চর্য্য! সকলেই এক কথা বলবে। তাহ'লে কি মঞ্জরীরই ভুল হচ্ছে কোথাও? কিন্তু শুধুই কি তাই? অভিমন্যুর সেই ভয়ঙ্কর কথাটা? সেই জঘন্য কুৎসিত সন্দেহ!

তবু সেই ঘরেই ফিরতে হবে মঞ্জরীকে!

এতো বড়ো পৃথিবীতে আর কোথাও ঠাঁই হবেনা তার।

বিমনা মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে সুনীতি ব'লে ওঠে, 'যাক্ যা হবার তা হয়েছে, দুঃখ করিস্‌নে। গাছের সব ফল কি আর টেঁকে? ভগবান আবার দেবেন। তবে এবার সাবধান হতে হবে। যথেষ্ট শিক্ষা তো হলো? নাকে কানে খত দে, আর ধিঙ্গিপনার দিকে নয়।'

মঞ্জরী গম্ভীরভাবে বলে, 'আর নয় বলা কি ক'রে সম্ভব? আমাকে তো একটু ভালো হলেই স্টুডিওয় যেতে হবে।'

'কি বললি? আবার তুই ওমুখো হবি?'

মঞ্জরী বালিশ থেকে মাথা তুলে প্রায় উঠে ব'সে উত্তেজিত ভাবে বলে, 'কেন বলো তো? তোমাদের সব ধারণাটা কি? ওরা কি আমায় বিষ খাইয়েছিলো?'

বিজয়ভূষণ আস্তে আস্তে ওর মাথায় মৃদু একটু হাতের চাপ দিয়ে ফের শুইয়ে দিয়ে বলেন, 'চটছিস্ কেন ভাই, ওখান থেকে এসেই ওরকম হওয়ায় সকলেরই একটা বিরক্তি হয়েছে, এই আর কি।'
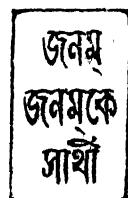
'কিন্তু আপনিই বলুন জামাইবাবু, আমি কন্ট্রাক্টে সই করেছি, আধখানা ছবি উঠে গেছে, এখন আমি বলবো 'আর আমার দ্বারা হবেনা'? মরে যেতাম সে আলাদা কথা, বেঁচে থেকে সুস্থ হয়ে কথার খেলাপ করবো? প্রথমবারের অসুখের সময় আমার নার্সটার মুখে শুনেছি, স্টুডিও থেকে না কি রোজ খোঁজ নিতে আসতো কেমন আছি, কবে যেতে পারবো।'

বিজয়ভূষণ সাপ-মরা এবং লাঠি না-ভাঙার সুরে বলেন, 'তা এতো ব্যস্ততাও আবার ভালো নয়। মানুষের অসুখ বুঝবেনা?'

সেবারে এক ছবি প্রযোজনা ক'রে অনেক টাকার ঘাড়ে জল পড়েছে বিজয়ভূষণের, কাজেই ও লাইনের প্রতি তাঁর আর তেমন সহানুভূতি নেই। বোধকরি সুনীতিরও এতো আক্রোশের কারণ তাই।

'বুঝবেনা কেন? বুঝছে তো। এতোদিন ধরে বুঝছে। কিন্তু এতো টাকা খরচের পর আমি যদি আপত্তি করি, তখন আর বুঝতে চাইবেনা নিশ্চয়। চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে মঞ্জরীদেবীর নামে আদালতে 'কেস' উঠলেই কি আপনাদের খুব মুখোজ্জ্বল হবে?'

'ওই তো হচ্ছে ঝঞ্ঝাটের কথা। এইজন্যেই—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুনীতি বলে, 'এইজন্যেই ঘর-গেরস্তর মেয়েদের বাইরে গিয়ে ঘট-ঘট করা দেখতে পারিনা। মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে চাস্ তো ঘরের মধ্যে থাক্ বাপু।'

'যেমন কচ্ছপ! কি বলো বড়দি? হাত পা মাথা বাঁচাতে খোলার মধ্যে ঢুকে ব'সে থাকার নীতি।'

মুচ্‌কে হাসে মঞ্জরী।

সুনীতি গম্ভীর ভাবে বলে, 'কি জানি বাবা, তোদের এখনকার মেয়েদের মতিবুদ্ধি বুঝিনা। বুকের পাটা

দেখে দেখে অবাক হয়ে যাই। আমার মেয়েগুলোও তো হয়ে উঠছেন এক-একটি অবতার। সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারলেই তবে টীট্ হয় ছুঁড়িরা। বিষ-দাঁত উঠতে পায়না। তা তো হবেনা, পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে আইবুড়ো থেকে—'

'মেয়ে হয়ে মেয়েদের প্রতি তোমার এমন পাশবিক হিংসে কেন বড়দি? মেয়ে জাতটা শুধু জব্দই হোক্ এ ইচ্ছে কেন?'

'ওলো, হিংসে নয় হিংসে নয়—মমতা। যতোই লেখাপড়া শিখিস্, ভালো ক'রে তলিয়ে বোঝবার বুদ্ধি তো এখনো হয়নি। মেয়েমানুষকে যে স্বয়ং বিধাতাপুরুষই জব্দ ক'রে রেখেছেন—'

'অতএব মানুষেও তার ওপর একহাত নিক্, কেমন?'

'না হ'লে যে পদে পদে জব্দ হবে।'

'হোক্। জব্দ হতে-হতেই একদিন তার দিন আসবে।'

'সে দিনটা কি তাই শুনি?' ঝেঁজে উঠে সুনীতি বলে, 'বিধাতাপুরুষ হার মেনে গিয়ে নতুন নিয়ম তৈরি ক'রে পুরুষদের দিয়ে ডিম পাড়াবে?'

'ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে সুনীতি'—বিজয়ভূষণ অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, 'তোমার এই বড়ো দোষ। কটু কথা যুক্তি নয়।'

'যুক্তি চুক্তি ও সবের কিছুর ধার ধারিনা আমি'—সতেজে বলে সুনীতি কিছুমাত্র না দমে, 'আমার যা খুসি বলবোই।'

সব কিছু বিস্মৃত হয়ে এইটাতেই হঠাৎ আশ্চর্য্য লাগে মঞ্জরীর। ওর মনে আসে, অভিমন্যু যদি অপর কারো সামনে এভাবে তিরস্কার করতো মঞ্জরীকে, নিশ্চয় অপমানে কালো হয়ে যেতো মঞ্জরী—স্তব্ধ হয়ে যেতো একেবারে।

বিজয়ভূষণ ঘরের আবহাওয়া বদলাতেই হয়তো ব'লে ওঠেন, 'সেদিন আগত ঐ তা তো দেখতেই

পাচ্ছি। কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপটা কি সেটা কি নির্দ্ধারিত হয়েছে দিদি? তোরা নিজেরাই কি পরিষ্কার ক'রে ঠিক করেছিস্?'

'করেছি বৈ কি জামাইবাবু। পুরুষজাতি যেদিন স্বীকার করবে পৃথিবীর লীলাক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের মতোই সমান প্রয়োজনীয়, আর যেদিন বুঝবে তাকে বাঁধতে যে জিনিসটা দরকার সেটা সমাজ শাসন আর বিধি-বিধানের যাঁতাকল নয়, অন্য একটা জিনিস, সেই হচ্ছে প্রকৃত দিনের রূপ।'

'এটা তোর অবিচার শালি! পুরুষজাত কি শুধুই শাসন করে? ভালোবাসতে জানেনা?'

'ভালোবাসতে? তা হয়তো পারে। কিন্তু আমি যা বলছি—সে জিনিসটা তো ভালোবাসা নয় জামাইবাবু!'

'ভালোবাসা নয়? তার ওপরেও আবার কি আছে রে?'

'তার ওপরেও কিছু আছে বৈকি জামাইবাবু! সেটা হচ্ছে—বিশ্বাস। মায়া মমতা স্নেহ, সে তো লোকে পোষা কুকুরটাকেও করে।'

পরাজয়! পরাজয়! বারেবারেই পরাজয় ঘটছে অভিমন্যুর। আত্মীয়পরিজনের কাছে, মঞ্জরীর কাছে, নিজের কাছে।

নিজের কাছে পরাজয় যে সবচেয়ে গ্লানিকর।

অথচ কিছুতেই নিজেকে শক্ত রাখা যায়না। মঞ্জরীর অচৈতন্য

জনম্ জনমকে সাথী

পাংশু মুখ দেখলেই বুকের মধ্যে অস্থির একটা যন্ত্রণা হতে থাকে, নিজেকে নিজে শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় জীবনে আর কখনো কঠিন কথা বলবোনা তাকে।

কিন্তু কি অদ্ভুত পরিস্থিতিই ঘটেছে।

চৈতন্য ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠেছে মঞ্জরী নিজেই। দু'জনের মাঝখানে কী বিরাট এক ব্যবধান। অপরাধিনীর চোখের দৃষ্টিতেই যেন বিচারকের ভ্রূকুটি।

ভ্রূকুটি সকলের দৃষ্টিতেই।

পূর্ণিমা ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, 'বেরুচ্ছিস্ ?'

'হুঁ।'

'কোথায় যাচ্ছিস্ ?'

'কোথায় আবার!' অসহিষ্ণু উত্তর।

এই এক অদ্ভুত প্রকৃতি অভিমন্যুর। যে সাপ তাকে অহরহ কুরে কুরে খাচ্ছে, সেটাকেই বুক দিয়ে ঢেকে অপরের চোখ থেকে আড়াল করতে চায়।

পূর্ণিমা এই অসহিষ্ণু স্বরে আহত হন। ক্রুদ্ধস্বরে ব'লে ওঠেন, 'তা জানি, হাসপাতাল ছাড়া যাবার আর জায়গা নেই তোর। কিন্তু এও বলি, তোর মতন নির্লজ্জ বেটাছেলে কি ভূভারতে আর আছে ? বৌয়ের পেছনে টাকা ঢালতে ঢালতে তো সর্ব্বস্বান্ত হলি, শরীর স্বাস্থ্যটাও কি নিঃশেষ করতে চাস্ ?'

'আমার শরীরে আবার কি হলো ?'

'কি হলো, জিজ্ঞেস করগে যা আরশিকে। পোড়াকাঠের মতন চেহারা হয়েছে—আর বলে কি না, শরীরে কি হলো! কেবিন ভাড়া দিয়ে রেখে দিয়েছিস্, দিনে রাতে দুটো নার্স পুষছিস্, ডাক্তারে ওষুধে ত্রুটি তো রাখিস্‌নি কোথাও, দু'বেলা নিজে হাজরে না দিলে হবেনা ?'

'যেতে বারণ করছো ?'

'বারণ!' পূর্ণিমা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, আমার

বারণ তুমি শুনবে যে। এখন বুঝছোনা, পরে বুঝবে মা কেন রাগ করে। এতো আস্কারা পেলে আর মেয়েমানুষ মাথায় উঠবেনা? চোদ্দবার ছুটে ছুটে গেলে ওর প্রাণে আর একতিল ভয় থাকবে?'

অভিমন্যু মুখ টিপে হেসে বলে, 'আচ্ছা মা, তুমি তো নিজেই বলো—বাবা তোমার ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতেন?'

'বকিস্‌নে বকিস্‌নে থাম্। সেই ভয় আর তোদের এই মিন্‌মিনে কাপুরুষতা? তার মানে বোঝবার ক্ষ্যামতা তোদের নেই। ওই বৌ জীইয়ে উঠে হু'দিন পরে আবার যদি বলে "আমার যা খুসি তাই করবো", পারবি আটকাতে?'

পারবে কি না সে সন্দেহ অভিমন্যুর নিজেরও আছে, তাই চুপ ক'রে থাকে। পরিহাসের হাওয়ায় এ প্রশ্নের উত্তর উড়িয়ে দিতেও পারেনা।

'আমি তোর মা হই অভি, আমি তোকে এই হুকুম করছি, তুই ওখান থেকে বাক্যিদত্ত করিয়ে আনবি বৌকে, এসে যেন আর ওই সব উন্‌চুটে বিত্তির ছায়া না মাড়ায়।'

অভিমন্যু মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে ধীরভাবে বলে, 'আর যদি বাক্যদত্ত হতে না চায়?'

'তাহ'লে বুঝবো আমার গর্ভে আমি মানুষ ধরিনি, ধরেছি একটা জন্তু।'

অভিমন্যু কি বলতে গিয়ে একবার চুপ ক'রে যায়, তারপর বলে, 'হয়তো তাই বুঝতে হবে তোমাকে, কিন্তু আরও একটা হুকুম তাহ'লে করো। রাজী যদি না হয় তাহ'লে এ-বাড়ীর দরজা কি তার সামনে বন্ধ হয়ে যাবে?'

পূর্ণিমা ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে ছেলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ভার ক'রে বলেন, 'অতো লম্বা

লম্বা কথা ব'লে আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করতে এসোনা বুঝতে পারছি তোমার দরজা আমার সামনেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

তবু যেতে হবে অভিমন্যুকে।

মঞ্জরীকে আজ ইন্‌চার্জ ডক্টর ঘোষালের বিশেষ ক'রে দেখতে আসার কথা। অভিমন্যুই কথা কয়ে রেখেছে।

মানুষ কতো নিরুপায়!

মানুষ কতো বেচারা!

প্রতি পদেই তার পরাজয়।

'সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি'—

কোথায় গেলো সেই দিনগুলি! যার খাঁজে খাঁজে লুকোচুরি খেলতো ইন্দ্রধনুর বর্ণছটা। কে সেই সুখের ঘরে হানা দিলো? বিজয়বাবু? গগন ঘোষ? সমাজ প্রগতি?

মানুষ চলছে, মানুষ এগোচ্ছে। চলা মানেই কি এগোনো? সে চলা—একই বৃত্তপথে ঘুরে ঘুরে চলা কি না কে তার হিসেব দেবে? হয়তো এমনি এক হাস্যকর চলার গৌরব নিয়েই মানুষ অগ্রগতির দাবী করছে। অতীত যুগে একদিন মানুষ মানুষের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারতো, আজ বোমা ছুঁড়ে মারছে, এটাই কি অগ্রগতি? নাঃ। অগ্রগতি তাকেই বলা হবে যেদিন নারীকে নিয়ে পুরুষের দুশ্চিন্তা ফুরোবে। ...ভাবতে ভাবতে চলে অভিমন্যু·· যেদিন জীবনসঙ্গিনী নির্ব্বাচন ক'রে তাকে নিয়ে 'হারাই হারাই' ক'রে অস্থির হতে হবেনা পুরুষকে। যেদিন নারী নিজেকে নিজে রক্ষা করতে শিখবে।···

জনম্
জনমকে
সাথী

প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন, প্রত্যেকের চিন্তাধারা বিভিন্ন। যখন যেদিকে সেই চিন্তার আলো পড়ে সেই দিকটাই সত্যের মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যথার্থ সত্য কি আজও নির্ণয় হয়েছে? আজও কি মানুষ বুঝতে শিখেছে তার সত্যকার কল্যাণের রূপ কি?...

সুনীতি বললো, 'তাহ'লে ওই কথাই থাকলো কি বলো, হ্যাঁ গো? এখান থেকে প্রথমটা মঞ্জু একবার ওর নিজের বাড়ীতেই যাক্, একবস্ত্রে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে চলে এসেছে, এখান থেকে নিয়ে গেলে অসুবিধেয় পড়বে। বাড়ী গিয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে, তারপর যতোদিন না বেশ সেরে উঠবে ততোদিন আমার কাছেই থাকবে। এই শেষ কথা, এর আর নড়চড় নেই।'

তরল চিত্ত সুনীতি হাত দিয়ে হাতি ঠেলতে চায়, চায় ফুঁ দিয়ে পর্ব্বত ওড়াতে। সহজ কথা আর সহজ ভঙ্গি দিয়ে সব কিছুর সমাধান ক'রে নিতে চায় সে।

মঞ্জরী হাসে ওর ছেলেমানুষী দেখে।

বিজয়ভূষণ বলেন, 'একতরফা তো রায় দেওয়া হচ্ছে। শালির মতটা পাওয়া গেলো কই? ওর যে বড়ো কড়া কন্‌ডিশান। তোমার সতীন ক'রে নিয়ে ওকে আমার ঘর করতে দিতে রাজী থাকো তো তোমার বাড়ী পদধূলি দেবে, নচেৎ নয়।'

'তা—তাতেই কি আমি অরাজী না কি? তিনদিন যদি তোমার ম্যাও সামলাতে পারে বুঝবো।'

মঞ্জরী মৃদু হেসে বলে, 'যতো ছুতো করতে

পারো। জামাইবাবুর মতো নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ আর আছে না কি জগতে ?'

'ওই ভ্যাখো। ওহে সুনীতিবালা, ভ্যাখো—গুণগ্রাহী কাকে বলে।'

'আজ তাহ'লে যাই রে মঞ্জু! কাল আসবো আবার। কই, আজ তো অভিমন্যু এলোনা! সন্ধ্যে হয়ে গেলো।'

বিজয়ভূষণ গম্ভীরভাবে বলেন, 'কিছু কলহঘটিত ব্যাপার রয়েছে মনে হচ্ছে।'

'বাজে ধারণা আপনার। কিছুই হয়নি।'

'কলহ-কোঁদল যদি না হয়, তাহ'লে তো ব্যাপার আরো ঘোরালো ক'রে তুলেছো মঞ্জরী দেবী। তুমি যে ভাবিয়ে তুললে।'

'আপনাদের ভাবানোই তো আমাদের কাজ। নইলে পাছে ভুলে যান।'

বিজয়ভূষণ একটু কাছে এসে ওর মাথায় একটু আদরের থাবড়া মেরে স্নেহগম্ভীরস্বরে বলেন, 'দুর্ব্বল মাথায় কতকগুলো বাজে বাজে ধারণা নিয়ে তোলাপাড়া ক'রে শরীর খারাপ করিস্‌নে দিদি! মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সহজ সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে কেবলমাত্র অকারণ সন্দেহে। অপরের দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখতে শিখতে হয়, আর অপরের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখতে হয়। যেই কারো প্রতি অভিমানে অন্ধ হবে, তখনি তার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখতে চেষ্টা করবে—এক্ষেত্রে তুমি নিজে কি করতে। মান আর অপমান এ দুটো শব্দই তো মানুষের তৈরী করা। দেশ ভেদে, সমাজ ভেদে, ব্যক্তি ভেদে ওর আলাদা আলাদা রূপ। তবে আর ওই দুটো কাঁচা শব্দ নিয়ে জীবনের জটিলতা এতো

বাড়ানো কেন? কে কার মান কাড়তে পারে? কে কাকে অপমান করতে পারে? তোমার সম্মান তোমার নিজের কাছে। তার নাম আত্মসম্মান।'

হঠাৎ মঞ্জরীর দুই চোখ ছলছলিয়ে আসে। বলে, 'সেইটে বাঁচাবার জন্যেই তো পালিয়ে আসতে চাই জামাইবাবু। প্রতিষ্ঠার সমস্ত ফাঁকি যে ধরা পড়ে গেছে।'

বিজয়ভূষণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, সুনীতির সহর্ষ কলোচ্ছ্বাসে থেমে গেলেন।

সুনীতি কাকে যেন উদ্দেশ ক'রে বলছে, 'এই যে! বাবুর এতোক্ষণে আসা হলো! আমরা সেই কতোক্ষণ থেকে এসে ব'সে থেকে থেকে এবার উঠে পড়লাম। এতো দেরী কেন? ভালো আছো তো?'

তাকিয়ে দেখলেন বিজয়ভূষণ, তাকিয়ে দেখলো মঞ্জরী।

অভিমন্যু ঘরে ঢুকলো।

একহাতে সন্দেশের বাক্স, একহাতে এক ঠোঙা লেবু আর আপেল।

* * * * *

জনম্ জনমকে সাথী

'নাঃ! এখনো নাকি হসপিটাল থেকে রিমুভ্ করেনি! উঃ, কী কেলেঙ্কারী বলুন তো! আমি তখনি বলেছিলাম ওসব নতুন-ফতুনে কাজ নেই'—সহকারী নলিনীবাবু মুখখানা বেজার ক'রে বলেন, 'এখন দেখুন বিপদ!'

প্রযোজক পরিচালক গগন ঘোষ সিগারেটের ছাই

ঝাড়তে ঝাড়তে স্থিতপ্রজ্ঞস্বরে বলেন, 'সবই এ্যাক্সিডেন্টাল। নতুন বলেই অসুখে পড়েছে, পুরনো হ'লে পড়তোনা, এমন বলতে পারোনা।'

'তা না হয় না বললাম। কিন্তু এই যে আজ ছ'হপ্তা কাজ আট্‌কে রইলো—'

'লোকসান তো হচ্ছেই, কিন্তু উপায় কি? এখন তো আর ওকে বাদ দিয়ে নতুন ক'রে কিছু করা সম্ভব নয়?'

'এদিকে বনলতা যে জবাব দিতে চাইছে। বলে কি না, সামনের মাসে চেঞ্জে যাবে।'

'তাই নাকি? এটা আবার কখন বললো?'

'আজই ফোন্ ক'রে জানতে চাইছিলো শ্যুটিং হচ্ছে কবে। আমার কাছে "এখনো অথই জল" শুনে বললো, 'তাহ'লে এখন সমুদ্রে ডুবুন, আমি চললাম সামনের মাসে।'

'কোথায় যাচ্ছে?'

'কে জানে মুঙ্গেরে না কি যেন বললো।'

'কোথাও যাবেনা। ওসব দর বাড়ানো। যাও, এখন কিছু তৈল প্রদান করোগে। নতুন কি আর সাধে নিয়েছি? এইসব ছুঁড়িদের চাল দেখে দেখে ইচ্ছে করে, গাঁ থেকে 'র' মেয়ে ধরে এনে কাজ করি। তাছাড়া—এই মঞ্জু না কি, এ মেয়েটার মধ্যে পার্টস্ ছিলো। দেখি আর হপ্তাখানেক অপেক্ষা করে।'

'দেবেনা'—নলিনীবাবু মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'এতো শীগগির বাড়ী থেকে আসতে দেবেনা। পেটের দায়ে পয়সা কামাতে আসা তো নয়, সেরেফ্ সখ্। শুনলাম, স্বামী না কি প্রফেসর, স্বামীর দাদারাও আছে বড়োবড়ো লোক। বাড়ীতে দারুণ আপত্তি, আধুনিকা কারো কথা শোনেনেনি।'

জনম্ জনমকে সাথী

'এতো খবর তুমি কোথা থেকে জোগাড় করলে হে?'

'খবর? খবর হাওয়ায় হাঁটে।'

'সে যাক্, তুমি বনলতাকে তোয়াজ ক'রে ঠিক ক'রে রেখো। ব'লে দিও ছবি শেষ না ক'রে কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবেনা।'

'আসছে ছবিতে দয়া ক'রে আর ওটাকে নেবেন না।'

'কোন্‌টাকে? নতুনকে?'

'না, বনলতার কথা বলছি। ভারী চাল। মুখ টিপে হেসে ভিন্ন কথা বলেনা। কথায় যেন অহঙ্কার ছিট্‌কোয়।'

'এখন ওর দিন রয়েছে করবে বৈ কি।' গগন ঘোষ আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে ক্ষুব্ধহাস্যে বলেন, 'কতোই দেখলাম! ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।'

'আর আপনি জীবনভোর ব'সে ব'সে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করুন।'

গগন ঘোষ হেসে ওঠেন।

নলিনীবাবুর রাগে তাঁর ভারী কৌতুক।

মঞ্জরী এদের মুস্কিলে ফেলেছে, রীতিমত ফেলেছে। কিন্তু রাগ ক'রে বাতিল করা চলেনা। স্টেজের থিয়েটার নয় যে, একজনের অনুপস্থিতিতে আর একজন চালিয়ে দেবে। অনেক টাকা ঢেলে অনেকগুলো সীন্ তোলা হয়েছে।···মুস্কিল বনলতাকে নিয়েও। তার ভারী অহঙ্কার। আসলে সে হচ্ছে মঞ্চাভিনেত্রী। গগন ঘোষই পর পর এই দু'খানা ছবিতে নামিয়েছেন তাকে। কিন্তু রাশি ক'রে টাকা নিয়েও তার ভাবভঙ্গি যেন গগন ঘোষের পিতৃদায় উদ্ধার করছে।

জনম্ জনমকে সাথী

'নিশীথ ঠিক আছে তো? না কি তিনি আবার বিলেতে যেতে চাইছেন?'

'চায়নি এখনো। চাইলেই হলো।'

অতঃপর এটা ওটা নানা কথা হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত নলিনীবাবু গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বনলতার তোয়াজ করতে এবং মঞ্জরীর খোঁজ করতে। কবে নাগাদ সে কাজে যোগ দিতে পারবে এটা জানতে পারলে কতকগুলো ব্যাপার ঠিক ক'রে নেওয়া যায়।

গাড়ীতে উঠে নলিনীবাবু বেজার মুখে বিড়বিড় ক'রে বলেন, 'ঝকমারি! শালার 'সহকারী' হয়েই জীবন কাটলো, স্বাধীনভাবে একটা ছবি করবার চান্স্ আর পেলামনা আজ পর্য্যন্ত। শুধু লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়িগুলোর তোয়াজ করতে করতেই প্রাণ গেলো।'

'ক্ষতিপূরণ?' নলিনীবাবু অবজ্ঞার হাসি হেসে বলেন, 'ক্ষতিপূরণ হিসেবে কতো টাকা আপনি দিতে পারেন মিষ্টার—মিষ্টার—'

'লাহিড়ী।' অভিমন্যু বলে।

'ও, ইয়ে-স্। মিষ্টার লাহিড়ী। তাহ'লে প্রশ্ন করি, ছবিটার পিছনে এ পর্য্যন্ত কতো টাকা খরচা হয়েছে, সে আইডিয়া আছে আপনার?'

'ঠিক ধারণা না থাকলেও মোটামুটি একটা আন্দাজ অবশ্যই আছে।' আরক্তমুখে বলে অভিমন্যু।

নলিনীবাবু একচোখ কুঁচ্কে দরাজ সুরে বলেন, 'বলু-ন। ব'লে ফেলুন আপনার আন্দাজটা।'

অপমানের কালি মুখে মেখে অভিমন্যু বলে, 'আমার উকিলের কাছেই বলবো।'

'বে—শ তাই বলবেন। কিন্তু আমার পরামর্শ

যদি শোনেন মিষ্টার লাহিড়ী, তাহ'লে বলছি, ইচ্ছে ক'রে ঝঞ্ঝাট ডেকে না আনাই ভালো। অবশ্য আমার কিছু বলা উচিত নয়, আপনার আর্থিক অবস্থা আপনিই বোঝেন, তবে অকারণ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা—তাছাড়া ফইজতও অনেক আছে।'

অভিমন্যু ভুরু কুঁচ্‌কে বলে, 'চল্লিশ-পঞ্চাশ! ছবি তো অর্দ্ধেক মাত্র তোলা হয়েছে শুনলাম।'

'অর্দ্ধেক নয়, ওয়ান থার্ড। খরচ-খরচার সম্পূর্ণ হিসেব অবশ্যই কোর্টে দাখিল করা হবে। কিন্তু ভেবে দেখুন মিষ্টার লাহিড়ী, মিসেস লাহিড়ীর অসুস্থতার জন্যে আপনি এতো করবেন, অথচ ওঁকে ঠিক বিশ্রাম দিতে পারবেন কি? কোর্টে হাজির হতে হলেও তো কষ্ট আছে—'

অভিমন্যু বিরক্তভাবে বলে, 'সে আমি বুঝবো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে! তাই বুঝবেন। তবে কাজটা ভালো করলেন না! অন্ততঃ একবার যদি আমাকে মঞ্জরীদেবীর সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা করতে দিতেন। তিনি যখন নাবালিকা নন তখন—'

'দেখুন, আমার এখন কাজের সময়। আপনি আসতে পারেন। আপনাদের যা কিছু বক্তব্য কোর্টেই বলবেন।'

'আচ্ছা নমস্কার।'

উঠে গিয়ে গাড়ীতে ওঠেন নলিনীবাবু, মনে মনে গালিগালাজ করতে করতে। কাকে? কাকে নয়? অভিমন্যুকে, মঞ্জরীকে, গগন ঘোষকে, সিনেমা লাইনকে, নিজের ভাগ্যকে।

জনম্ জনমকে সাথী

নলিনীবাবু চলে যাবার পর খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে ব'সে থাকে অভিমন্যু।

ভাবতে চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কি হয়ে গে[illegible]ড়লো যে বচসা হলো লোকটার সঙ্গে, অনেক কথা কাটাকাটি। রা[illegible] শেষ পর্য্যন্ত কিনা কোর্টের ভয় দেখায়! প্রথমটা অভিমন্যু যথেষ্ট ভদ্রতার সুর বজায় রেখেছিলো, হাত জোড় ক'রে বলেছিলো মঞ্জরী অসুস্থ, ডাক্তারের নির্দ্দেশে ওকে এখন দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে, কিন্তু লোকটা যেন নাছোড়বান্দার শিরোমণি। হাত কচলায় আর বলে, 'কথা দিচ্ছি, ওঁকে কোনোরকম কষ্ট পেতে দেবোনা। আউটডোরের কাজ নয়, স্টুডিওর মধ্যে। গাড়ী ক'রে যাবেন, গাড়ী ক'রে আসবেন। বলেন তো আমি নিজে পৌঁছে দেবো। নইলে মারা যাবো স্যর, সেরেফ মারা যাবো। ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই ধূর্ত্তশিয়ালের মতো মুখের বিনয় বচন আর কতোক্ষণ সহ্য করা যায়।

তবু হাত জোড় ক'রে বলেছে অভিমন্যু 'মাপ করবেন মশাই, ডাক্তারের নিষেধ।' সেই কথায় হতভাগা বলে কি না, 'আমাদের একদিন ডাক্তার আনতে দেবেন স্যর? সহরের সেরা ডাক্তারকে নিয়ে আসবো কোম্পানীর খরচায়—'

এরপর আর ভদ্রতা রক্ষা সম্ভব হয়নি। ঝগড়াই হয়ে গেছে। এবং অভিমন্যু প্রস্তাব করেছে, চুক্তিভঙ্গের অপরাধে যা ক্ষতি-পূরণ দিতে হয় সে দিতে প্রস্তুত।

ঝোঁকের মাথায় রোখ চেপেছিলো। নলিনীবাবু চলে যাবার পর অভিমন্যু চোখের সামনে একটা ধোঁয়ার পর্দা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়না। ঝোঁকের মাথায় তো চোটপাট ক'রে বসলো, কিন্তু কোথায় সেই প্রভূত পরিমাণ টাকা? ধার করবে? আত্মীয়জনের কাছে?

জনম
জনমকে
সাথী

যদি শোনেছে ? কারণটা কি বলবে ?

ডেকে হলেই মান বজায় থাকবে ?

উঃ, মঞ্জরী কি তার এতো শত্রুও ছিলো !

অনেক কথা বয়ে যায় মনের মধ্যে, নদীর স্রোতের মতো চিন্তার স্রোত।···সহসা এক সময় চম্‌কে স্তব্ধ হয়ে যায় অভিমন্যু, নিজের এতোক্ষণকার অসতর্ক চিন্তার দিকে তাকিয়ে। নির্জন ঘরে নিজে-নিজেই মরমে মরে যায়।

হ্যাঁ, এতোক্ষণ মরার কথাই ভাবছিলো অভিমন্যু।

নিজের নয়, মঞ্জরীর।

ভাবছিলো এর চাইতে মঞ্জরী যদি সেরে না উঠতো, যদি মারা যেতো, অনেক ভালো হতো। সমস্ত কুশ্রীতার হাত এড়িয়ে নিষ্কলঙ্ক পবিত্র একখানি শোক নিয়ে দিন কাটাতে পারতো অভিমন্যু। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এই অসতর্কতার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

কাল মঞ্জরীকে হাসপাতাল থেকে আনার কথা। এখনো বাড়ী এসে পৌঁছয়নি, আর আজ যদি স্বার্থপর হতভাগা ব্যবসাদারেরা তার কাজে যোগ দেবার দিন ঠিক করতে ধন্না দিতে আসে, রাগ হয়না ? বারবার ভাবতে চেষ্টা করে অভিমন্যু, সে রাগ ক'রে অমন নিষ্করুণ চিন্তাটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলো, কিন্তু বারবার সমস্ত যুক্তি আড়াল ক'রে একখানি মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বেদনাবিধুর বিষণ্ণ শ্যামল একখানি মুখ।

দীর্ঘপল্লবাচ্ছন্ন কালো দুটি চোখে অভিমানের ভর্ৎসনা হেনে বলছে, 'তুমি এই ?'

কিন্তু অভিমন্যু কি করবে ? সেও তো রক্তমাংসের মানুষ ?

কাল মঞ্জরীকে আনবার কথা।

যদিও পূর্ণিমাদেবীর অভিমত স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করতে অভিমন্যু মঞ্জরীর কাছে, শুধু জানিয়েছে, এবার থেকে মা'র ইচ্ছানুরূপ চলতে হবে। নচেৎ নিশ্চয়ই পূর্ণিমাদেবী সংসার ত্যাগ ক'রে তীর্থ বাস করবেন। কিন্তু ইত্যবসরে সুনীতিদেবী বায়না নিয়ে ব'সে আছেন বোনকে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন কাছে রাখবেন। মঞ্জরীরও যেন সেইদিকে 'ঢল' নেমে আছে।

উঃ! কী ক'রে যে এই দুর্দ্দিন কেটে আবার সুদিনের মুখ দেখতে পাবে অভিমন্যু!

সুদিনের মুখ!

সত্যিই কি আর কোনোদিন দেখতে পাবে?

'সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি।'

সমস্ত রং যে কী এক ক্লেদাক্ত কাদা জলের স্পর্শে ধুয়ে মুছে বিবর্ণ হয়ে গেল! হয়তো শীঘ্রই মঞ্জরীর রোগ সেরে যাবে, ঘরে-বাইরে যতো কিছু ঝঞ্ঝাট তাও হয়তো একদিন যাবে। আত্মীয়দের কৌতূহল যাবে, পরিজনদের বিরাগও যাবে, কিন্তু মঞ্জরীর আর তার অবাধ উন্মুক্ত হৃদয়ের মাঝখানে যে অভেদ্য প্রাচীরটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে সেটা কি কোনোদিন যাবে?

বোবা সেই দেওয়ালটার দু'দিকে পরস্পর দু'জনে মাথা কুটবে আর দিন কাটাবে। ধূসর বিবর্ণ আলোহীন উত্তাপহীন দিন।

এখন আর ওসব দিদির বাড়ী-ফাড়ি গিয়ে কাজ নেই। অভিমন্যু মনে মনে ভাবে। ওইসব সংস্পর্শে দুঃসাহস আরো বেড়ে যাবে মঞ্জরীর। মেয়েদের বাপের বাড়ীর দিকে বেশী পৃষ্ঠবল থাকা ভালো নয়।

জনম্ জনমকে সাথী

যদি শোনে। বিজয়বাবুকে জানিয়ে দেবে শীগগির, এখন আর মঞ্জরী ডেকে পাঠাচ্ছেনা, এখানে মা তাহ'লে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।

হবেন বৈ কি, সত্যিই হবেন।

রোগাতুরা পুত্রবধূকে কাছে না পেয়ে নয়, উদ্যতবজ্র শাসন হাতে নিয়ে অপরাধিনীকে হাতে না পেয়ে। দু'বার ক'রে রোগে পড়ার সুযোগে অপরাধের শাস্তিই তো পেলোনা মঞ্জরী।

ফোন্ করবে ব'লে উঠি উঠি করছে এমন সময় শ্রীপদ এলো হাঁপাতে হাঁপাতে, 'ছোড়দাদাবাবু, ছোটবৌদির বড়দির বাড়ী থেকে ডাকতে এসেছে।'

'ডাকতে এসেছে? কাকে ডাকতে এসেছে?'

'আপনাকে আবার কাকে! যান একখুনি যান, জরুরী ডাক।'

'কেন, তা কিছু বলেনি?'

'কিছু বলছেনা। আপনি চলেই যাননা তাড়াতাড়ি।'

'কি মুস্কিল! কে এসেছে কে?'

'ওনাদের বামুনঠাকুর।'

'কোথায় সে? ডাক্ না।'

'পথে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বলছি দাদাবাবু আপনি যান।'

শ্রীপদর আদিখ্যেতায় বিরক্ত অভিমন্যু গেঞ্জির উপরে একটা জামা গায়ে দিতে দিতে নেমে যায়, আর একটা আশঙ্কায় মনটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

মঞ্জরী নিজেই জোর ক'রে হাসপাতাল থেকে ছুটি ক'রে দিদির বাড়ী গিয়ে ওঠেনি তো? ধেৎ, তাই কখনো সম্ভব? হাসপাতালের একটা আইন নেই? ছাড়বে কেন তারা? অভিমন্যুর প্রশ্নের কি জবাব দেবে?

জনম্ জনম্‌কে সাথী

কিন্তু শুধু শুধু সুনীতির হঠাৎ কি এমন দরকার পড়লো যে এমন জরুরী তলব ?

সোনালি সবুজ পাতাগুলো পড়ন্ত বেলার সোনা-রোদে সবটা সোনালি হয়ে গেছে। ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিরঝির ঝিলমিল, মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম নেই। ঘরের মধ্যে খাটে শুয়ে বোঝা যেতোনা কি গাছ, আজকাল বারান্দায় বেরিয়ে এসে বেড়াবার হুকুম পেয়ে বুঝতে পেরেছে মঞ্জরী কি গাছ ওটা।

তেঁতুল গাছ !

বাতাসের ঢেউ লাগে কি না লাগে, পাতায় পাতায় জাগে শিহরণ। তাকিয়ে থাকতে ভারী ভালো লাগে মঞ্জরীর। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোনা-রোদ ম্লান হয়ে আসে, পাতাগুলো সহসা যেন ঘন সবুজ হয়ে ওঠে, আর এই সময় আসে অভিমন্যু, আসে সুনীতি, আসেন বিজয়বাবু। বেশী অসুখের সময় জায়েরা দেখে গেছেন একদিন প্রচুর আঙুর বেদানা আপেল নাসপাতির ভেট নিয়ে, ননদরাও দেখে গেছেন দু'জনে খালি হাতেই। নিকট সম্পর্ক দূর সম্পর্ক অনেকেই এলো এক-একদিন। তখন শুধু শুয়ে থাকতো মঞ্জরী। এখন আর অন্য কেউ আসেনা। এখন বারান্দায় বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে থাকতে থাকতে ওরা আসে। আর আসার আগে পর্য্যন্ত কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগে।

মঞ্জরীর কি আর কেউ ছিলো ? কোনোদিন আর কোনো আশ্রয় ছিলো তার ?

পাতাগুলো ঘন সবুজ হতে হতে গাঢ় কালো

হয়ে গেলো, মুছে গেলো তাদের নৃত্যছন্দের ঝিলমিল। অন্ধকার হয়ে এলো আকাশ। সমস্ত পৃথিবী যেন ক্লান্ত হতাশায় মুখ গুঁজে বসলো।

নার্স ডাকলো, 'ঘরে চলে আসুন দিদি, ঠাণ্ডা লাগবে।'

'যাই।' বলেও চুপচাপ ব'সে থাকে মঞ্জরী ইজিচেয়ারটায়।

নার্স কাছে এসে বলে, 'দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে, আসুন। আপনার বাড়ী থেকে আজ আর কেউ এলেননা বোধহয়।'

'তাই দেখছি।' যতোটা সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে মঞ্জরী।

'আর তো শুধু আজকের রাতটা! কালকেই তো চলে যাচ্ছেন নিজের লোকেদের কাছে, কি বলেন দিদি? খুব মজা লাগছে তো?'

মঞ্জরী শুধু একটু হাসি দিয়ে উত্তর দেয়।

'সেইজন্যেই আজ আর কেউ এলেননা মনে হচ্ছে।'

'তাই হবে।'

'আসুন দিদি, চলে আসুন।'

'যাই।'

দুধের পর গল্পের বই। গল্পের বইয়ের পর রাতের আহার। তখনো মনের মধ্যে প্রতীক্ষার রেশ গুঞ্জরন ক'রে ফেরে। কেবিনের নিয়ম শিথিল। অসময়ে আসা চলে। সন্ধ্যাবেলা কাজে আটকে গেলে, বেশী রাতেও তো আসা যায়।

কিন্তু কতো বেশী রাতে?

এগারোটা? বারোটা? তারপরও কি গেট খোলা থাকে? খোলা থাকে আসার পথ? নার্সটা এক সময় ব'লে ওঠে, 'দিদির আজ ঘুম আসছেনা, না?'

'না। কি রকম যেন গরম হচ্ছে।'

'গরম নয়, আহ্লাদ!' নার্সটা হাসে, 'দেখি তো সব পেসেণ্টকেই, ছাড়া পাবার আগের রাত্তিরে আর ঘুমোয় না।'

আহ্লাদ!

মঞ্জরী ভাবতে চেষ্টা করে, হাসপাতালের ঘর থেকে ছাড়া পাবে ভেবে তার কি খুব আহ্লাদ হচ্ছে? কই? বরং যেন আতঙ্ক! হ্যাঁ আতঙ্ক! এ যেন বেশ ছিলো। দায়হীন চিন্তাহীন শিকড়ের মাটির স্পর্শহীন অদ্ভুত একটা হাল্‌কা জীবন! কাল থেকে কতো যুদ্ধ!

কাল বেলা দশটায় ছুটি।

সুনীতির সঙ্গে কথা হয়ে আছে, বিজয়বাবুও আসবেন বেলা দশটার সময়। হাসপাতালের লেখাপড়ার কাজ মেটানো হ'লেই অভিমন্যুর দায়িত্বের ছুটি।

বিজয়ভূষণের সঙ্গেই চলে যাবে মঞ্জরী।

নিজের ঘর?

নিজের ঘর কোথায় মঞ্জরীর? যে অভিমন্যুর স্পষ্ট সন্দেহ করতে বাধেনা—মঞ্জরী তার অজাত সন্তানকে হত্যা করেছে, সেই অভিমন্যুর ঘর তো?

নির্লজ্জ সেই সন্দেহ,' নগ্ন নিরাবরণ তার উদ্‌ঘাটন। সেই মুহূর্ত্তেই তো সব শেষ হয়ে গেছে। যাচাই হয়ে গেছে প্রেমের আর বিশ্বাসের। নির্ণয় হয়ে গেছে সম্পর্কের নিগূঢ় সত্য রূপ। আবার সেই ঘরে আশ্রয় নিতে যাবে মঞ্জরী? আবার গর্ভে ধারণ করবে অভিমন্যুর সন্তান?

ছি ছি ছি!
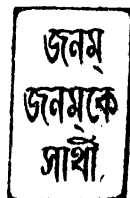
সমস্ত অন্তরাত্মা 'ছি-ছি' ক'রে ওঠে। তবু জ্বালা নয় যন্ত্রণা নয়, সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে গভীর এক শূন্যতায়। সেই পাতা ঝিলমিল সন্ধ্যার হতাশ প্রতীক্ষার শূন্যতায়! অভিমন্যু এলোনা।

আশ্চর্য্য মানুষের মন!

আশ্চর্য্য রহস্যময়ী রাত্রির লীলা!

সকালের রূপ আলাদা।

সূর্য্য স্পষ্ট, সূর্য্য রূঢ়, সূর্য্য বাস্তব। সূর্য্যের আলোয় মোহময়ী দুর্বলতার ঠাঁই নেই। সকালের আলোয় মনকে দৃঢ় ক'রে নিয়েছে মঞ্জরী।

সকালবেলা অভিমন্যু এলো।

দশটা বাজে বাজে তখন।

ক্লিষ্ট অন্ধকার মুখে রাত্রি জাগরণের স্পষ্ট ছাপ।

না, না, ও মুখের দিকে তাকাবে না মঞ্জরী। ও ওর ওই ক্লিষ্ট মুখের অভিনয়ে পরাজিত করতে চায় মঞ্জরীকে। এইতেই জিতে যায় পুরুষ। এই ওদের কৌশল, এ ওদের হাতিয়ার। কঠিন হবে মঞ্জরী, খুব কঠিন।

'চলো।'

'জামাইবাবু এলেন না?'

'না।'

'আমার সঙ্গে কথা ছিলো, তিনিই আসবেন।'

'দেখতেই পাচ্ছো কথা রাখতে পারলেন না।'

'বীডন্ স্ট্রীটের বাড়ীতে আমি যাবো না।'

'পাগলামী কোরোনা। চারদিকে এরা কৌতূহলী হয়ে শুনছে।'

'বেশ, তুমিই তাহ'লে আমাকে দিদির ওখানে পৌঁছে দিয়ে যাও।'

'সে হয়না।'

'কেন হয়না? বলেছি তো তোমাদের বীডন্ স্ট্রীটের বাড়ীতে আমি আর যাবোনা।'

'আমি তোমায় মিনতি করছি মঞ্জরী, এখানে আর ছেলেমানুষী কোরোনা।'

আবার সেই কৌশল। সেই ক্লিষ্ট বিষণ্ণ গভীর বেদনাময় মুখের ফাঁদ।

উপায় নেই, কোনো উপায় নেই। এখানে কেলেঙ্কারী করা চলেনা।

জামাইবাবুর উপর ক্রোধে অভিমানে চোখ ফেটে জল আসতে চায়, দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে মঞ্জরী।

বাড়ী পৌঁছে আর কোনো কথা নয়, টেলিফোনের দিকেই আগে এগিয়ে যায় মঞ্জরী। কিন্তু অভিমন্যু ভেবেছে কি? ও কি মঞ্জরীকে নজরবন্দী ক'রে রাখতে চায়? মঞ্জরীর রিসিভার-ধরা হাতটা চেপে ধ'রে বলে কিনা—'ফোন্ কোরোনা।'

'কেন'? ব্যঙ্গের হাসি হেসে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে মঞ্জরী, 'এ স্বাধীনতাটুকুও নেই?'

'তোমার ভালোর জন্যেই বারণ করছি মঞ্জরী।'

'আমার ভালো? সে করবার সাধ্য আর ভগবানেরও নেই। ছাড়ো, আমি জামাইবাবুকে ডাকছি একখুনি আমায় নিয়ে যেতে।'

'উনি আসবেন না।'
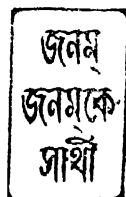
'আসবেন না? আমি ডাকলেও আসবেন না? নিশ্চয় তুমি তাহ'লে ওঁদের সঙ্গে ভয়ানক কিছু একটা করেছো। নইলে আমি ডাকলে—'

'তুমি কেন, কেউ ডাকলেই উনি আর আসবেন না মঞ্জরী! সহস্রবার ডাকলেও শুনতে পাবেন না যে। কাল বিকেলে হঠাৎ ঘাড়ের শির ছিঁড়ে মারা গেছেন বিজয়বাবু।'

ভগবান ব'লে কি সত্যই কেউ আছেন?

ভুল ভুল, কেউ নেই। মানব-জীবনের নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা যদি কেউ থাকে তো সে হিংস্র শক্তিধর ক্রূর একটা আত্মা। কোটি কল্পকাল ধ'রে অত্যাচারিত মানবের অভিশাপে অভিশাপে আরো হিংস্র হয়ে উঠছে সে, উঠছে আরো উন্মাদ হয়ে।

আলুথালু সুনীতি মুখ তুলে মঞ্জুকে দেখে হাহাকার ক'রে ওঠে, 'আর কি দেখতে এলি ভাই? তোর জামাইবাবু আর নেই রে। তোকে আনতে যাবার বদলে নিজেই চলে গেলেন।'

পাথরের পুতুলের মতো ব'সে রইলো মঞ্জু। না দিলো দিদিকে সান্ত্বনা, না কাঁদলো নিজে। তিন মেয়ে সুনীতির, ছোট মাসীর এই নির্মায়িক ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে ফিরে শুলো। এই তিন দিন তারা ওঠেনি, মুখে জল দেয়নি।

জনম্ জনমকে সাথী

সুনীতিই কথা বলতে থাকে, 'তুই এসে থাকবি ব'লে তোর জামাইবাবুর কতো জল্পনা-কল্পনা, রোগা-মানুষ তুই, পাছে কোনো অসুবিধে হয়। আর কোনো দিকে তাকালেন না রে, সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন।'

মঞ্জরী তখন নিশ্চল হয়ে ভাবছে মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তার মূর্ত্তিটা কি রকম। দিদির আক্ষেপ একটু থামলে একসময় বলবে ভেবেছিলো, 'দিদি আমি তোমাকে ছেড়ে যাবোনা, এখানে থাকবো বলেই এসেছি।'

বলা হলোনা। সুনীতির আক্ষেপোক্তির মধ্যেই বোঝা গেল এ-বাড়ীতে আর মুহূর্ত্তকাল টিকতে পারছেনা সে, শ্রাদ্ধ-শান্তি সমাধা হলেই চলে যাবে বড়ো ননদের কাছে হাজারীবাগে। সুনীতিকে তিনি পেটের মেয়ের মতো দেখেন।

অতএব সমস্ত সংকল্প ধূলিসাৎ!

সংকল্প ছিলো নিজের উপার্জ্জনে নিজের ব্যয়ভার বহন করবে দিদির বাড়ীতেই থেকে। সংকল্প ছিলো উপার্জ্জন ক'রে ক'রে শোধ ক'রে দেবে অভিমন্যুর ঋণ! না, এই কয়েক বৎসরব্যাপী দাম্পত্য-জীবনের অন্নবস্ত্রের ঋণ নয়, যে মুহূর্ত্তে অভিমন্যু উচ্চারণ করেছে সেই ভয়ঙ্কর কথা, যে মুহূর্ত্তে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, তারপর থেকে অনাত্মীয় অভিমন্যু যা খরচা করেছে মঞ্জরীর জন্যে সে ঋণ শোধ ক'রে দেবে মঞ্জরী। আইনের সাহায্যে বিবাহ বিচ্ছেদ? সেটা তো পরের ব্যাপার। সত্যকার বিচ্ছেদ তো আগেই ঘটে।

মঞ্জরীর রোগের জন্য অনেক খরচই করেছে অভিমন্যু, যে রোগটা নাকি মঞ্জরীর স্বকৃত। এ ঋণ শোধ না করতে পারলে মঞ্জরীর শান্তি নেই।

কিন্তু এসব সংকল্প আপাততঃ টিকলো না।

এতো বড়ো পৃথিবীতে মঞ্জরীর কোনো আশ্রয় নেই। ভাইদের ঘর? সে তো আরো তিক্ত।

যেখানে যতো আত্মীয়স্বজন আছে মঞ্জরীর, আজ পর্য্যন্ত যে ঘরগুলো দেখেছে, সবগুলো পর পর মনে করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কোথাও নেই আলোর কণিকা। সবাই যেন একজোটে মঞ্জরীর মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে রেখে উপরে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে।

এতএব সেই বীডন্ স্ট্রীটের পুরনো তিনতলাখানা।

যেখানে শুধু পূর্ণিমার ক্রূর সর্পিল, আর অভিমন্যুর আরক্ত থম্থমে মুখ।

সেই মুখ নিয়ে অভিমন্যু মঞ্জরীর মুখের সামনে নামিয়ে দেয় ওষুধের গ্লাস, নামিয়ে দেয় আঙুর বেদানা ছানা সন্দেশ সাজানো প্লেট!

দেখে রক্তের কণায় কণায় জমে ওঠে ধিক্কারের গ্লানি।

স্নায়ুতে স্নায়ুতে আর্ত্তনাদ ওঠে বিদ্রোহের।

মঞ্জরীর শেষ পরিণাম কি তাহ'লে আত্মহত্যা?

বান্ধবী রমলা অবাক হয়ে বলে, 'তুই কি ক্ষেপে গেছিস্? অভিমন্যুবাবুর মতো ভালো লোক জগতে আছে নাকি? তাঁর সঙ্গে বনছেনা তোর?'

মঞ্জরী কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, 'ধরে নে, আমিই বদ্‌লোক। কাজেই ঠোকাঠুকি। মানভরে চলে এসেছি, এখন ফিরে যেতে তো পারিনা? 'পেয়িং গেষ্ট' হিসেবে রাখিস্ তো বল্ বাবা।'

প্রাণ ছিঁড়ে পড়ে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, অপমানে চোখ ফেটে জল ঝরতে চায়, তবু বজায় রাখতে হয়

কাষ্ঠহাসির লজ্জাবরণ। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বন্ধুর কাছে চলে এসেছে সে, স্বামীকে জব্দ করতে। এর বেশী কিছু নয়।

স্বামী স্ত্রীর কলহ! জগতের সমস্ত বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে যা হাল্‌কা।

কিন্তু রমলাও তো বি. এ. পাশ করেছে, করেছে এতোদিন ধ'রে সংসার। ছু'তিন ছেলের মা সে। সর্ব্বোপরি মঞ্জরীর বন্ধু সে। অতএব সে নির্বোধ নয়। নির্বোধ হ'লে কোনোদিনই মঞ্জরীর নাগাল পেতোনা।

কাজেই তার চোখে মঞ্জরীর চেষ্টাকৃত এই আবরণ ভেদ ক'রে সত্য তথ্য ধরা পড়তে দেরী হলোনা। মনে মনে বললো, হুঁ বাবা, যখনি তুমি সিনেমায় নামতে গেছো, তখনি সন্দেহ করেছি, সুখের সংসারে তোমার আগুন লাগলো বুঝি। হয়েছে, বেশ ঘোরালো ব্যাপারই হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তোমার ল্যাজের আগুন নিয়ে আমার সুখের সংসারে কেন বাবা? আমি ঘাড় পাতছিনা।

কিন্তু মুখে ভদ্রতার আর বন্ধুত্বের ঠাট বজায় রাখতেই হয়। তাই মঞ্জরার সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে, 'কী বললি? "পেয়িং গেষ্ট?" আমার বাড়ীতে ছু'দিন থাকবি তুই পেয়িং গেষ্ট হয়ে? যা যা, বেরো বেরো। যে মুখে এই পাপকথা উচ্চারণ করলি, সে মুখ আর দর্শন করতে চাইনে। কেন, আমার কি এমনি হাড়ির হাল যে তুই ছু'দিন থাকলে—'

মঞ্জরী হাসিচাপা মুখের অভিনয় ক'রে বলে, 'ছু'দিন কোথা? বললাম যে বরাবর, জন্মের শোধ।'

জনম্ জনমকে সাথী

'ঈ-স্! তারপর অভিমন্যুবাবু এসে আমার গলায় গামছা দিয়ে শ্রীঘরে নিয়ে যাক আর কি!'

'গেলেই হলো। আমি কি নাবালিকা?'
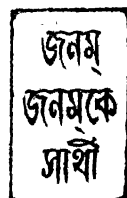
'আরে বাবা, মেয়েমানুষ জাতই নাবালিকা। নাবালিকা কেন, চিরবালিকা। নইলে বুড়োবয়সে এই কেলেঙ্কারী করিস্? নে, আয়, বোস্। ...কি? গাড়ীতে বেডিং স্যুটকেস আছে? তাহ'লে তো রীতিমত একটি উপন্যাস! ভাবনা ধরিয়ে দিলি যে। এ বাড়ীতে যে আবার আমার একটি অবোধ নাবালক পোষ্য আছে, তাকে নিয়ে একতিল স্বস্তি নেই আমার। সে আবার না ফাঁক পেয়ে পরকীয়া রস আস্বাদন করতে বসে। সামলাইগে বাবা!'

হাসির ঝঙ্কার তুলে চলে যায় রমলা, আর কালপেঁচার মতো মুখ ক'রে স্বামীকে গিয়ে বলে, 'ছাখো কী সর্ব্বনেশে উড়ো বিপদ!'

স্বামী-স্ত্রী অনেকক্ষণ পরামর্শ ক'রে কী-ভাবে কথা বলা যুক্তি-সঙ্গত তার একটা প্ল্যান ভেঁজে রমলা যখন ফের এ-ঘরে আসে—দেখে, না আছে মঞ্জরী, না আছে মঞ্জরীর ট্যাক্সি।

শুধু টেবিলের উপর একটুক্‌রো কাগজে ছু'লাইন লেখা।

'রমলা, একটু ঠাট্টা ক'রে গেলাম কিছু মনে করিস্ না ভাই। সত্যি তো আর পাগল হইনি আমি যে তোর ছন্দে-গাঁথা সংসারের ছন্দভঙ্গ করতে এখানে থেকে যাবো।

মঞ্জরী'

পরস্পর মুখের দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে একটা নিশ্বাস ফেললো। ঠিক আশ্বস্তির নিশ্বাস নয়, বরং লজ্জার। এতোক্ষণ ধরে ছু'জনে মঞ্জরীর বিবেচনাকে যে কটু নিন্দাবাদ করেছে, ভারী হাস্যকর হয়ে গেলো সেটা। মঞ্জরীর কবলমুক্ত হবার জন্য যা কিছু দামী দামী প্ল্যান করলো, সেটা যেন মশা মারতে কামান দাগা হয়ে গেলো।

একটু পরে রমলা বললো, 'জানি এইরকমই কিছু একটা করবে। চিরদিনের খামখেয়ালি।'

রমলাপতি মৃদুহেসে বললো, 'নইলে আর তোমার সখী হয় ?'

নাঃ, কোথাও জায়গা হবেনা।
এখন খোলা রইলো দূর বিস্তীর্ণ পথ।
খোলা রইলো সমস্ত বহির্জগৎ।
খোলা রইলো আত্ম-ধ্বংসের দরজা।

এই ধ্বংসের মূর্ত্তিটাই চোখে পড়বে লোকের। চোখে পড়বে সমাজের আর সংসারের। আর কিছু দেখতে পাবেনা কেউ। অবজ্ঞা আর ঔদাসীন্য, ঘৃণা আর অবহেলা, সন্দেহ আর সহানুভূতিহীনতার পাষাণ ভার দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে যারা একটা জীবনকে আত্ম-ধ্বংসের এই ভয়ঙ্কর খাদের ধারে নিয়ে এলো, যারা তাকে সেই খাদে ঝাঁপ দিতে দেখেও হাত গুটিয়ে ব'সে থাকলো, তাদের নাম রইলো মহিমার খাতায়। তারা সতর্ক, তারা সাবধানী, তাদের পা পিছলোয় না।

যে মেয়েরা পথে নামলো, তাদের নেমে আসার ইতিহাসকে কে কবে উদঘাটন ক'রে দেখতে গেছে ?

তারা নেমে গেছে, তলিয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে, এই তাদের পরিচয়।

* * * * *

জনম্ জনমকে সাথী

'আমি বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা
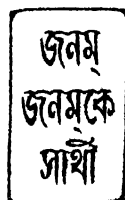
তাম্বুল সাজিনু দীপ জ্বালাইনু
মন্দির হইল আলা।
আমি বঁধুর লাগিয়া—'

'চৌধুরী-ম্যান্‌সন'এর সুউচ্চ ত্রিতলের একটি ফ্ল্যাটের একখানি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে সুকোমল সাটিনের গদিপাতা শয্যায় গা ডুবিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে রেশমী কুশনে ঠেশ দিয়ে ব'সে গুনগুন ক'রে পদাবলীর এই পদটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইছিলো বনলতা।

বনলতার পরিধানে দুধের ফেনার মতো মসৃন মোলায়েম রেশমের পাড়হীন শাড়ী, গায়ে একটা জমাট রক্ত-রঙের ভেলভেটের ব্লাউজ। হাতে বিদ্যুৎ-ঝিলিক্-হানা মোটা একজোড়া বালা, সিঁথিতে সরু চেনে আট্‌কানো ছোট্ট একটি টিক্‌লি। আর কোথাও কোনো আভরণের বালাই নেই—না কানে, না গলায়।

সাজপোষাকে একটা অদ্ভুতত্ব আনাই বনলতার সখ। নিত্য-নতুন ফ্যাসান আবিষ্কার করছে সে, আর অম্লানবদনে যা খুসি তাই সাজে সেজে বেরোচ্ছে।

দেহসজ্জাতে যা খুসি করুক, বনলতার গৃহসজ্জাটি কিন্তু নিখুঁত ভরাট। তিনখানা ঘর আর ব্যালকনি-সম্বলিত এই ফ্ল্যাটটিতে সীলিং থেকে মেঝে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ঐশ্বর্য্য আর বিলাসিতার চিহ্ন পরিস্ফুট।

পুরুষ বন্ধুর অভাব না থাকলেও বাস করে সে একাই। পোষ্যের মধ্যে একটা নেপালী দরোয়ান সর্ব্বদা সিঁড়ির মুখে ব'সে থাকে, আর বাড়ীর ভিতরে চাকর দেবনারাণ সর্ব্বদা চরকি ঘোরে। পান থেকে চুন খসলে, কি জানলার গায়ে একটু ধুলো জমলে,

দেবনারাণের চাকরি টলমল করে। আরো একটি পোষ্য আছে বনলতার, সে তার সৌখিন আর সোহাগী ঝি মালতি।

বনলতা বলে মালতি শুধুই ঝি, মালতি আড়ালে বলে বনলতা তার দূর সম্পর্কের বোন। কিন্তু সে যাক্, আড়ালের কথা কথাই নয়। মালতির কাজ শুধু গৃহকর্ত্রীর ফাই-ফরমাস খাটা, আর তাঁর পরিত্যক্ত হরেকরকম শাড়ী ব্লাউজে বাহার দিয়ে ঘুরে বেড়ানো। দেবনারাণ দু'চক্ষে দেখতে পারেনা তাকে, নেপালী আর মালতি যুগপৎ দু'জনকেই সে নিদারুণ হিংসে করে।

সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরের চারদিকে একবার অলস দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলো বনলতা। কি ভালোই লাগতো যদি এমনি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প'ড়ে থাকা যেতো। কিন্তু ঘণ্টা ছেড়ে কিছু মিনিটও সইবেনা। এখনি উঠে পড়তে হবে। আজ থিয়েটারের দিন। আগে শুধু মঞ্চে ছিলো, তবু কিছু অবসর ছিলো, গগন ঘোষ তাকে প্ররোচনা দিয়ে দিয়ে পর্দ্দায় নামালো। আশ্চর্য্য! সঙ্গে সঙ্গে যেন পর্দ্দার জগৎ লুফে নিতে চাইছে তাকে। ইতিমধ্যেই খান তিন-চার বইয়ের জন্যে কণ্ট্রাক্ট ক'রে ফেলতে হয়েছে।

য[illegible] অর্থ অনুরোধ উপরোধ।

[illegible]স ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কোনোখানে দাঁড়াতে দি[illegible]ী নয় ওরা। ছেড়ে দেবে একেবারে সেইদিন, যেদিন [illegible] হয়ে যাবে বনলতা, পুরনো হয়ে যাবে, যাবে বুড়ো হয়ে। যখন জাম দখল করতে আসবে নতুনের দল। বনলতা জানে সেদিন পরিশ্রান্ত বনলতাকে পথের মাঝখানে ফেলে দিয়ে যাবে ওই—যশ অর্থ আর অনুরোধ উপরোধ। ফিরে তাকিয়ে দেখবেনা আর।

জনম্
জনমকে
সাথী

অতএব যতো পারো লুটে নাও এইবেলা, যতো পারো অহঙ্কার ক'রে নাও এইবেলা।

তবু আজ মোটেই উঠতে ইচ্ছে করছিলোনা বনলতার। তবু উঠতেই হবে। স্টুডিওর কাজে যদিও বা শরীর ভালো নেই ব'লে কামাই চলে, থিয়েটারে মরে না যাওয়া পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। এখুনি উঠতে হবে, গিয়ে হাজির হতে হবে "রঙ্গনাট্যে"র সেই পচা পরিচিত গ্রীণরুমে। এই সৌখিন সাজ-সজ্জা ত্যাগ ক'রে মাথায় ঝুঁটি বেঁধে আর নাকে তিলক কেটে বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনী সেজে দাঁড়াতে হবে হাজার দু'হাজার দর্শকের সামনে। গাইতে হবে 'আমি বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু—'

এর থেকে আর উদ্ধার নেই বনলতার।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

উঠি উঠি করতে করতেই ফোন্ এলো।

'আঃ!'

গান থামিয়ে মুখে বিশ্রী একটা ভঙ্গি ক'রে বনলতা আপন মনে উচ্চারণ করলো, 'এই যে আবার আমার কোন্ বঁধুর টনক নড়লো!'

উঠলোও না, নড়লোও না। শুধু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে [illegible]লো বাক্যবাহী যন্ত্রটার দিকে। [illegible]র চিহ্ন

ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং! টেলিফোন।

ছুটে এলো মালতি, রিসিভারটা তুলে নিয়ে অতি [illegible] একাই। ভঙ্গিতে 'হেলো' 'হেলো' ক'রে কে ডাকছেন জেনে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে কর্ত্রীকে বললো, 'গগন ঘোষ!'

জনম্ জনমকে সাথী

'উঃ! মরেও না তো শয়তানটা!'

ব'লে উঠে এসে রিসিভারটা নিজের হাতে নিয়ে

বনলতা মিহি আদুরে-গলায় সুরু করে—'হ্যাঁ, আমি বনলতা বলছি—কি বলুন? এ্যাঁ! কি বললেন? মঞ্জরী? সেই নতুন মেয়েটা? বলেন কি?...সর্ব্বনাশ করেছে। ...আমার এখানে? ...আমার এখানে কোথায় থাকবে? ...অসম্ভব!...কি বলছেন? মাত্র দু-একবেলার জন্যে? তারপর? ...কি বলছেন? আপনি ব্যবস্থা ক'রে দেবেন?...সেটা এখনি ক'রে ফেলুননা? আবার আমাকে মুস্কিলে ফেলা কেন? মুস্কিল ছাড়া আর কি? আমি তো এখনি বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ! হ্যাঁ আজ থিয়েটার আছে। বাড়ীতে? ...বাড়ীতে আমার ঝি থাকে। ও হ্যাঁ, চাকর দরোয়ান...। ...বেশ, ব'লে যাচ্ছি! কিন্তু শুনুন, কিছু মনে করবেননা, ওই যা বললেন—দু'একবেলা। বুঝতেই পারছেন কিরকম অস্বস্তি বোধ করছি।...ও, হাঃ হাঃ হাঃ। আপনারও আচ্ছা ঝামেলা! কে কোথায় কর্ত্তা-গিন্নিতে ঝগড়া ক'রে গৃহত্যাগ করবে, আর তার ম্যাও সামলাবেন আপনি।...হি হি হি, ও...হ্যাঁ...তা যা বলেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আনুন তাকে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে কিন্তু। নইলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবেনা। হ্যাঁ ...আচ্ছা ছেড়ে দিলাম।'

রিসিভারটা ঠুকে বসিয়ে রেখে বনলতা ধপ্ ক'রে আবার বিছানায় ব'সে প'ড়ে ব'লে ওঠে, 'উঃ, কী ফ্যাসাদ!'

মালতি এতোক্ষণ চোখ ঠিকরে হাঁ ক'রে বনলতার কথাগুলো গিলছিলো, এখন হাঁ করেই প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার গো দিদি?'

'আর বলিস্ কেন? হতভাগা গগন ঘোষ অনাসৃষ্টি এক আবদার ক'রে বসেছে।'

'কী আবদার গো?'

'বলে কিনা এক নতুন ছুঁড়ি নাকি বাড়ীতে বরের

জনম্ জনমকে সাথী

সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তেজ ক'রে চলে এসেছে, তাকে আমার ফ্ল্যাটে উঠতে দিতে হবে।'

'ওমা, সি কি কথা গো দিদি ?'

'ওই কথা ! নে এখন কুলো বরণডালা নিয়ে দোরে দাঁড়াগে যা, এলো ব'লে।'

মালতি অনেক রঙ্গ অনেক ঢং ক'রে ক'রে নানা প্রশ্নে মঞ্জরীর খবর জেনে নিতে চেষ্টা করে, বনলতা যথাসম্ভব বিরক্ত চিত্তে উত্তর দেয় এবং যখন শেষ মন্তব্য করে 'থাম্ মালতি, আর জ্বালাস্নে—' ঠিক সেই সময় দেবনারায়ণ এসে দরজায় দাঁড়ায়।

'গগন ঘোষ বাবু এসেছেন একজনকে নিয়ে। বসার ঘরে বসানো হয়েছে তাঁদের।'

কেশবেশে আর একটু পারিপাট্য সাধন ক'রে বনলতা ধীর মন্থরগতিতে বসবার ঘরে গিয়ে দর্শন দেয়।

'এই যে নিয়ে এলাম এঁকে। দু'একদিনের মধ্যেই যাহোক একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবো আমি। সেই দুটো দিন তোমার এখানে—'

এখন বনলতার সম্পূর্ণ অন্য মূর্ত্তি।

পরম অমায়িকভাবে স্তব্ধ মঞ্জরীর পিঠে একখানা হাত রেখে বনলতা উদার স্বরে বলে, 'ঠিক আছে। ছোট বোন দিদির বাড়ী এসে দু'চারদিন থাকবে তার আবার কথা কি। তবে ভাই, দিদিটি তো তোমার চললো এখন দাসত্ব করতে। আমার লোকজন রইলো, ঝি মালতি আছে খুব চট্‌পটে, যা দরকার হবে ব'লে করিয়ে নিতে হবে, বুঝলে তো ?'

জনম্ জনমকে সাথী
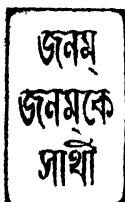
গগন ঘোষ বিনয়ে গ'লে গিয়ে বলেন, 'সে

আমি জানতাম! জানতাম বলেই এঁকে ভরসা দিতে পেরেছি। ···আচ্ছা মিসেস লাহিড়ী, আমি তাহ'লে আসি।'

ঘোষ চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বনলতা চঞ্চল স্বরে বলে, 'আমিও চলি ভাই। কিছু মনে কোরোনা। ···মালতি!'

বলাবাহুল্য মালতি দরজার ও-পিঠেই ছিলো। বনলতা ব্যস্তভাবে বলে, 'এই যে! শোনো, নতুন দিদিমণিকে দেখা-শুনা করো। কি দরকার-টরকার জেনে নাও, বুঝলে? আমার মতো ক'রে যত্ন করবে মনে রেখো। ···চলি ভাই! উঠে পড়ো, তুমিও নিজের বাড়ীর মতো—'

মুহুর্মুহুঃ হর্ণের শব্দে ব্যস্ত বনলতা পায়ে-পরা শ্লিপারটা খুলে রেখে, প্রায় জুতো পরতে-পরতে নেমে যায়। আর আগের মতো স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে মঞ্জরী। ভদ্রতার যে প্রতিদান দেওয়া আবশ্যক, তাও তার মনে থাকেনা।

মালতির বার-বার প্রশ্নে মঞ্জরী একসময় ক্লান্ত স্বরে বলে, 'আমার কিছু লাগবেনা। উনি ফিরুন আগে।'

উনি অর্থে বনলতা।

মালতি ভেবেছিলো খুব গায়ে প'ড়ে আলাপ ক'রে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার রহস্যটা জেনে নেবে, সুবিধে হলোনা। ঠোঁট উল্টে ব'লে চলে গেলো, 'তাহ'লে আর কি বলবো বলুন। দিদি এসে যদি আমায় গাল দেয় তখন দেখবেন।'

[illegible]দে চলে যেতে তবে যেন মঞ্জরী অবাক অভিভূত দৃষ্টি [illegible]মলে চারিদিক তাকিয়ে দেখলো। দেখে আরও অবাক হয়ে গেলো।

[illegible]রী থাকতে এলো এখানে।
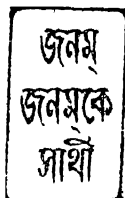
মঞ্জরী।

প্রফেসার লাহিড়ীর স্ত্রী মঞ্জরী লাহিড়ী। সারা কলকাতা জুড়ে যার আত্মীয়গোষ্ঠি—শিক্ষিত সভ্য, মার্জ্জিত রুচি, ধনী অভিজাত! সেই মঞ্জরী রাত্রিবাস করতে এলো এক থিয়েটারের অভিনেত্রীর বাড়ীতে? শুধু থাকা নয়, তার কৃপার দানে থাকা?

আগুন লেগে ঝল্‌সে যাওয়ার মতো জ্বালা করছে পিঠের সেই জায়গাটা যেখানে অভিনেত্রী বনলতার রং-মাখানো ছুঁচলো নোখ্‌ওয়ালা হাতখানা ঠেকেছিলো। অনুকম্পার সেই দাহ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে সর্ব্বাঙ্গে।

দাহ সবখানে!

দেহে, মনে, প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুতে।

সহকারী নলিনীবাবু মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'বেরিয়ে আসবে, তা জানতাম! শ্যাম কুল—দুই কি আর একসঙ্গে রাখা যায়? এ লাইনে যে এসেছে তাকে আর 'সোয়ামী'র ঘর করতে হয়না। অনেক বেটিকেই তো দেখলাম। প্রথমে ভাব দেখায় যেন কুইন ভিক্টোরিয়া, তারপর মদ খেয়ে নাচে।

প্রযোজক পরিচালক মুচ্‌কে হেসে বলেন, 'যাকগে ও ভালোই। টানাপোড়েনে কাজ ভালো হয়না।'

'ওর মধ্যে যে আপনি এমন কি দেখলেন—
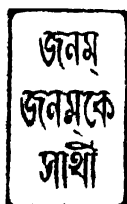
'দেখেছি হে দেখেছি। রীতিমত পার্ট আমার মেয়েটার মধ্যে।'

অতঃপর পরবর্ত্তী বই সম্বন্ধে আলোচনা থাকে, এবং মঞ্জরীকে যাতে আর কেউ ভাঙ্গিয়ে 'সে

যেতে না পারে তার জন্যে চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরির জল্পনা চলে।

মানুষের মন, আশ্চর্য্য এক বস্তু। ও যে কখন কোন্ পথে প্রবাহিত হয়! যে মানুষটা দু'দিন এসে থাকার প্রস্তাবে বনলতা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকেছিলো, তাকেই যে বরাবরের মতো রেখে দিতে চাইবে, কিছুতেই ছাড়বেনা, একথা কি বনলতা নিজেই তখন কল্পনা করতে পেরেছিলো?

আর মঞ্জরী?

সেও অবাক আশ্চর্য্য হয়ে দেখছে কী অদ্ভুত বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে সে। যাকে ঘৃণা করি, অশ্রদ্ধা করি, তার ভালো-বাসার বন্ধনও কি এমন অচ্ছেদ্য?

প্রথম প্রথম গগন ঘোষ দু-চারটে সস্তা ফ্ল্যাটের সন্ধান দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই বনলতা নাক কুঁচকে বলেছে, 'পাগল হয়েছেন? ওখানে মানুষে থাকতে পারে? ওকে আস্তানা না ব'লে আস্তাবল বললেই ঠিক বলা হয়।'

সে ভদ্রলোক যদি ইসারায় মঞ্জরীর আর্থিক অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলেছেন, তো বনলতা কটাকটু শুনিয়ে দিয়েছে, 'পয়সা কম, দিন আপনারা পয়সা? যার ক্যাপাসিটি বেচে লাখ-লাখ টাকা তুলবেন, তাকে তদুপযুক্ত দেবেন নাই বা কেন? ছে[illegible]ন বাদে দেখবেন ওর বাজার দর!'

[illegible]ফোনের ওদিক থেকে ঘোষমশাই যদি বিনীত স্বীকৃতি

জনম্ জনমকে সাথী

হতে [illegible]নয়েছেন, 'আহা, সে কথা কি আমি মানছিনা? নিয়ে [illegible]ার সামর্থ্য অনুযায়ী দেবো বৈকি! নিশ্চয় দেবো—'

সঙ্গে সঙ্গে মুখরা বনলতা বলেছে, 'আপনাদের তো সব সময়ই বৈষ্ণব-বিনয়! সমুদ্রকে বলেন গোষ্পদ। কিন্তু যাক্, আপনার সামর্থ্য হিসেব না ক'রে, ওর সামর্থ্যই হিসেব করুননা? এরপর যখন মোটা টাকা দিয়ে বম্বে থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে, তখন যে হাত কামড়াবেন!'

গগন ঘোষ অগাধ জলের মাছ ব'লে যে একেবারেই তাতবেন্ না তা হ'তে পারেনা, তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'বম্বেকে আট্‌কাতে পারে এতো পয়সা এখানে কার আছে? কে দিচ্ছে? আমাদের ললাট-লিপিই তো ওই। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া ক'রে তুলি, আর চিলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। গাধার দিকে কৃতজ্ঞতার বালাই ব'লে তো কোথাও কিছু থাকেনা?'

রিসিভারের ওপর খিলখিল ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়েছে বনলতা, বলেছে, 'থাকবে কোথা থেকে? গাধা যে? ধোপার প্রতি গাধার কৃতজ্ঞতা দেখেছেন কোথাও?'

এইভাবেই মাসের পর মাস গড়িয়ে গেছে, মঞ্জরী রয়ে গেছে এখানে, আর অদ্ভুত সুন্দর এক সখীত্ব গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে, মঞ্জরী আর বনলতা।

কিন্তু কি ক'রে গড়লো?

মঞ্জরী তো প্রতিনিয়ত বনলতার নীতিকে অসমর্থন করে! ঘৃণা করে তার উচ্ছৃঙ্খলতাকে। বনলতা মদ খেয়ে চুর হয়, বনলতা

জনম্ জনম্কে সাথী

পুরুষ বন্ধুকে এনে রাত্রে আশ্রয় দেয়, বনলতা হুতকিমাকার সাজ করে—যা যে-কোনো ভদ্র-মনের পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত—বিশেষ ক'রে মেয়ে মন। তবু যখন পরদিন সকালে বনলতা হৃতশ্রী পোষাকে

আর বর্ণলেপহীন মলিন মুখে কৌচে কাত হয়ে প'ড়ে করুণ দৃষ্টি তুলে বলে, 'তুই আমায় খুব ঘৃণা করিস্, না মঞ্জু ?'

তখন কেমন এক মমতায় বুকটা ভ'রে ওঠে মঞ্জরীর। রাত্রে নিশ্চিত ক'রে ভেবে রাখে রাত পোহালেই চলে যাবে এই কুৎসিত কদর্য্য পরিবেশ ছেড়ে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকবে কথা বলবেনা, কিন্তু সকালবেলা বনলতার ওই মুখ দেখলেই সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। মানব মনের চিরন্তন রহস্য!

কথা বন্ধ করা হয়না, চলে যাওয়া হয়না, হয় তর্ক।

আজও চলছিলো সেই তর্ক-পর্ব্ব!

চলে যাবে স্থিরসংকল্প নিয়ে সকাল থেকে কাঠ হয়ে ব'সে ছিলো মঞ্জরী, চা পর্য্যন্ত খায়নি। মালতি গিয়ে বনলতাকে সে খবর জানাতেই, ওঘর থেকে এঘরে এসে হাজির হলো বনলতা!

গায়ে একটা সরু ফিতে লাগানো সেমিজ মাত্র সার, যাতে বুক পিঠ সবটাই প্রায় অনাবৃত, তার উপর অতি সূক্ষ্ম একখানা দামী জর্জ্জেট নিতান্ত অগোছালো ক'রে জড়ানো। পায়ে মখমলের চটি, সেটা ঘষতে ঘষতে লটপট ক'রে এলো।

সামনের কৌচে ব'সে প'ড়ে জড়িতস্বরে বললো, 'কি, আমার ওপর ঘেন্নায় জলগ্রহণ করবিনা?'

কাঠ দেহ আরো কঠিন হয়ে উঠলো মঞ্জরীর, ব'সে থাকলো মুখ ফিরিয়ে।

বনলতা এলিয়ে আধশোয়া হয়ে তেমনি জড়ানো স্বরে বলে, 'আমার ওপর রাগ ক'রে কি করবি মঞ্জু? আমি তো খারাপই! আমি মদ খাই, আমি পুরুষ নিয়ে রাত কাটাই, এ কি তুই জানিস্‌না? তবে?'
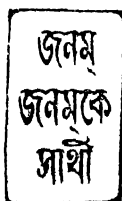
আরো শক্ত হয়ে ওঠে সম্মুখবর্ত্তিনীর চোয়াল দুটো, ভঙ্গি আরো অনমনীয়। তীব্রস্বরে ব'লে ওঠে, 'জানি! আর জেনে বুঝেও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আশায় এখানে প'ড়ে আছি ব'লে নিজের ওপর ঘেন্নায় গা ঘিনঘিন করছে। আমি চলে যাচ্ছি।'

সেকেণ্ড কয়েক মঞ্জরীর সেই ক্রোধারক্ত আর বিতৃষ্ণা-কুঞ্চিত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বনলতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'যা তবে। আর তোকে আটকাবো না। হ্যাঁ, চলেই যা! আমার সংসর্গে থাকিস্‌নে। আমি খারাপ, খুব খারাপ! নর্দ্দমার পোকার মতো খারাপ আমি।'

মঞ্জরী এই স্বীকারোক্তির সামনে বিচলিত হলো।

বিচলিত হলেও ক্রুদ্ধস্বরেই বললো, 'নিজেকে এভাবে ভাবতে তোমার লজ্জা করেনা?'

'লজ্জা! হায় হায়! তুই যে হাসালি মঞ্জু! আমাদের আবার

রাগ চলে যায়, মঞ্জরী হতাশ হয়ে বলে, 'কিন্তু লতাদি, নিজেকে তুমি যতো খারাপ বলো, ততো খারাপ তো তুমি সত্যিই নও।'

'কি বললি? অ্যাঁ? ততো খারাপ নই? হা-হা-হা! হাসিয়ে হাসিয়ে কি মারতে চাস্‌ আমায়? আমি যে কতো খারাপ, আমরা যে কতো খারাপ, তোরা ভদ্রলোকের বৌরা তা ধারণা করতেই পারবিনা মঞ্জু! শুনলে শিউরে উঠবি।'

জনম্ জনমকে সাথী

মঞ্জরী দৃঢ়স্বরে বলে, 'অন্য কারো কথা জানিনা, তবে তোমার কথা বলতে পারি, 'সত্যি অতো খারাপ তুমি নও। ইচ্ছে ক'রে খারাপ সাজো। বেপরোয়া কুশ্রীতা করাই যেন তোমার সখ। এমনি তোমাকে

দেখলে ভাবা যায়না, বিশ্বাস হয়না যে তুমি—অথচ তোমার অভদ্রতা দেখে লজ্জায় ঘেন্নায় আমারই মরতে ইচ্ছে করে।'

'অ্যাঁ, কি বললি? আমার লজ্জায় তোর মরতে ইচ্ছে করে? বলেই সহসা নেশাক্রান্ত বনলতা অদ্ভুত একটা কাণ্ড ক'রে বসে।

দু'হাতে বুকটা চেপে ধ'রে কৌচে গড়িয়ে শুয়ে প'ড়ে হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে।

ছুটে আসে মালতি।

ছুটে আসে দেবনারাণও। মালতি হাতের ইসারায় তাকে ভাগিয়ে দিয়ে ব'লে ওঠে, 'কি হলো গা নতুন দিদিমণি? দিদি হঠাৎ এমন করছে কেন?'

মঞ্জরী মাথা নেড়ে বলে, 'জানিনা!'

'ওমা! জানোনা কি গো! সামনে ব'সে রয়েছো—'

এবার বনলতা কাঁদতে-কাঁদতেই ব'লে ওঠে, 'ওরে, এতো আহ্লাদ আমি যে সইতে পারছিনে, বুক ভেঙে যাচ্ছে।'

'আহ্লাদ আবার কিসের? রাতে বুঝি মাত্রাটার জ্ঞান ছিলোনা।'

বলতে বলতে মালতি উচ্চস্বরে হাঁক পাড়ে, 'দেবা, এক গেলাশ জল আন্ শীগগির।'

জল আসতেই খানিকটা জলের ঝাপ্টা বনলতার চোখে মুখে দিয়ে তাকে টেনে তুলে বসিয়ে গেলাশটা মুখে ধ'রে বলে, 'নাও, খাও দিকি!'

বনলতা এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে ব'লে ওঠে, 'মঞ্জু রে, আবার যে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

'বাঁচতেই হবে তোমায়।'

দৃঢ়স্বরে বলে মঞ্জরী।

'মালতি, তুই যা।'
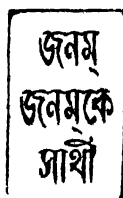
বনলতা জর্জ্জেটের আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছতে মুছতে বলে, 'ও ভেবেছে মদের ঝোঁক। না রে মঞ্জু, হঠাৎ আহ্লাদের ঝোঁক সামলাতে পারলাম না তাই!'

'তুমি ইচ্ছে করলে এখনো ভালো হতে পারো লতাদি।'

বনলতা গভীর ভাবে মাথা নাড়ে।

'আজ উত্তুর দেবোনা, দু'বছর পরে—দু'বছর পরে এর উত্তুর তুই নিজের কাছেই পাবি।'

মঞ্জরী শিউরে ওঠে।

স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সেই শিহরণ।

'কি, ভয় পেলি?' বনলতা একটু অনুকম্পার হাসি হাসে, বলে, 'আগে আমিও ওইরকম শিউরে উঠতাম।'

মঞ্জরী আরো দৃঢ়স্বরে বলে, 'ও আমি বিশ্বাস করিনা। নিজের শক্তি থাকলে নিশ্চয়ই ভালো থাকা যায়। নিজে দুর্ব্বল না হ'লে কার সাধ্য তাকে নষ্ট করে? অভিনয় একটা শিল্প, প্রোফেশন হিসেবে সেটা গ্রহণ করলেই উচ্ছন্ন যেতে হবে এর কোনো মানে আছে? আমি তো ভাবতেই পারিনা, কেন—'

কথার মাঝখানে খিলখিল ক'রে উচ্ছৃঙ্খল হাসি হেসে ওঠে বনলতা।...'আমিও আগে ওইরকম অনেক কিছু ভাবতেই পারতামনা। ধর্ এক বছর আগে তুইই কি ভাবতে পারতিস্, স্বামী সংসার ছেড়ে, মান সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়ে একটা থিয়েটারের মাগীর বাড়ী প'ড়ে থাকবি তুই? ঘটনাচক্র, বুঝলি, সবই ঘটনাচক্র। ঘটনাচক্র।'

জনম্ জনমকে সাথী

না, নিজের দৃষ্টিতে নিজের স্বরূপ ধরা পড়েনা, তাই মানুষ অসতর্ক উক্তি ক'রে বসে, অবোধের মতো কথা বলে। শুধু যদি সহসা অপরের

দর্পণে আপনাকে দেখে ফেলে, তখন স্তব্ধ হয়ে যায়, স্তম্ভিত হয়ে যায়।

যেমন আজ স্তব্ধ হয়ে গেলো মঞ্জরী।

প্রথমদিনের সেই প্রচণ্ড অন্তর্দাহ, দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রবাহের প্রলেপে কবে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো, কবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো এই অদ্ভুত জীবন, এটা এতোদিন এমন স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়েনি।

ঠিক সেই সময় ঠিক এমনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো অভিমন্যু।

ঘরে নয় বারান্দায় নয়, পার্কের বেঞ্চে নয়, কলকাতার কোথাও নয়। বসেছিলো হরিদ্বারের এক নির্জ্জন সীমায়।

এখানে ব'সে গঙ্গা দর্শন হয়না। এব্ড়ো-খেব্ড়ো পাহাড়ের সানুদেশ, খানিকটা উপরে গেলে বুঝি অবহেলিত একটা মন্দির আছে, সেখানে উঠবার একটা লুপ্তপ্রায় সিঁড়িও আছে, এটা তারই চত্বর।

যাত্রীরা এখানে কদাচিৎ আসে। দৈবাৎ কোনো উদারহৃদয় যাত্রী, যারা সর্ব্বজীবে সমভাবের নীতি অনুসরণে স্নানান্তে পথ-মধ্যবর্ত্তী বিগ্রহ নির্বিশেষে হাতের কমণ্ডলুর জলটুকু ছিটোতে ছিটোতে পথ চলে, তারাই একবার ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টি হেনে এই ভাঙাচোরা সিঁড়ি ক'টা অতিক্রম ক'রে এক গণ্ডুষ জল দিয়ে যায় এই মন্দির-বিগ্রহের তৃষ্ণার্ত্ত গাত্রে। বাকী সময় নিস্তব্ধ নির্জ্জন।

নীচে খানিকটা দূরেই হর-কী-প্যারী ঘাটে, কী কলকোলাহল! কী জনসমাবেশ! কে বলবে তারই এতো কাছাকাছি এরকম অদ্ভুত জনহীন একটা জায়গা

আছে। ব'সে থাকতে থাকতে বুঝি বিস্মৃত হয়ে যেতে হয় কোথায় আছি। যেন পৃথিবী-ছাড়ানো কোন একটা অনৈসর্গিক স্তব্ধতা!

অথচ মাত্র কয়েক মিনিটের পথ নেমে গেলেই সহর-জীবনের প্রচণ্ড প্রাচুর্য্য! টাঙাওয়ালাদের চীৎকার, অজস্র রিকশাগাড়ীর অবিরাম ঠুন্‌ঠুনুনি, অসংখ্য দোকানপাট—তার সামনে অগাধ ক্রেতা আর অকথ্য ভিখারীর ভীড়, এবং অগণিত পুণ্যার্থীর অবিরাম স্তোত্রপাঠ ধ্বনি!

সব মিলিয়ে একটা দিশেহারা উদভ্রান্তি!

তারই মাঝখানে রয়েছেন পূর্ণিমা। অভিমন্যু এসেছে এই নির্জ্জন পর্ব্বতগাত্রে।

এই তীর্থ।

এইজন্যই তীর্থমাহাত্ম্য!

এই অপূর্ব্ব আশ্রয়ের আশাতেই কর্ম্মপিষ্ট ক্লান্ত মানুষরা মাঝে মাঝে কর্ম্মপাশ কাঁধ থেকে নামিয়ে মুক্তির আশায় ছুটে আসে তীর্থের পথে। ছুটে আসে উৎসাহী আনন্দকামীরা, আসে হৃতোদ্যম সংসার-পরাজিতেরা, আসে পরলোকলোভী পুণ্যার্থীরা, আসে উদাসীন বৈরাগীরা।

নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাও তো তীর্থে এসো।

নিজেকে খুঁজে পেতে চাও তো তীর্থে এসো।

কে জানে অভিমন্যু কেন এসেছে!

নিজেকে হারাতে, না নিজেকে খুঁজে পেতে?

জনম্ জনমকে

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এসেছে পূর্ণিমার তীব্র প্ররোচনায়। লোকলজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পালিয়ে এসেছেন পূর্ণিমা।

ঘরের বৌ যার দিবা দ্বিপ্রহরে সর্ব্বসমক্ষে কুলত্যাগ ক'রে চলে যায়, তার মুখ লুকোবার জায়গা আর কোথায় আছে—কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার হৃষিকেশ ছাড়া? বলেছেন এখান থেকে যাবেন কেদার-বদরীর পথে।

পূর্ণিমা ঘোরেন মন্দিরে মন্দিরে, ঘাটে ঘাটে, সাধুসন্তদের আশ্রমে আশ্রমে।...অভিমন্যু পালিয়ে বেড়ায় পরিত্যক্ত বিগ্রহের নির্জ্জন মন্দিরপ্রাঙ্গণে।

এই হতভাগ্য বিগ্রহমূর্ত্তিদের মধ্যেই কি লুকানো আছে তার সান্ত্বনা?

'মার্ভেলাস্!'

দু'তিনদিন কারো দেখা মেলেনি।

আজ হঠাৎ একটি বাঙালী যুবকের আবির্ভাব ঘটলো, এক অভিনব পরিবেশে। কমণ্ডলু হাতে নয়, সিগারেটের টিন হাতে।

পরনে ভিজে ধুতি নয়, পাটভাঙা সুট।

'মার্ভেলাস্!'

অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত এই মন্তব্যটুকু ক'রে ফেলেই অভিমন্যুর প্রতি চোখ পড়ে যায় ছোকরার, এবং সঙ্গেসঙ্গেই ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে একটু নমস্কার-গোছ ক'রে বলে, 'মাপ করবেন, দেখতে পাইনি। আপনার শান্তির বিঘ্ন ঘটালাম, দুঃখিত।'

অভিমন্যুও অবশ্য সঙ্গেসঙ্গেই সচকিত হয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে সেও হাত জোড় ক'রে বলে, 'কী-আশ্চর্য্য! এরকম বলছেন কেন? আমি এই বেড়াতে বেড়াতে একটু এসে পড়েছিলাম।'

'আমিও তাই। অবশ্য তার উপর আরও একটু বাড়তি স্বার্থ আছে, জায়গাটা দেখে ভারী ভালো লাগছে।'

ছোকরার মুখে চোখে আনন্দ আর কৌতুকের উচ্ছলতা।

তার কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরাটার প্রতি এবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় অভিমন্যুর। ওঃ, তাই এই পরিত্যক্ত ভূমিতে এঁর আবির্ভাব।

ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে নামাতে নামাতে ছোকরা বলে, 'বেশ বসেছিলেন আপনি, আপনার ফিগারটিও চমৎকার! কথা কয়ে মাটি ক'রে ফেললাম। দিব্যি একখানা ছবি বাগিয়ে নিতাম, আর অ্যালবামে সেঁটে ক্যাপশন লাগাতাম, 'ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া।'

'তার মানে?'

প্রায় বিদ্যুতাহতের মতো চম্‌কে তীব্র প্রশ্ন করে অভিমন্যু, 'আপনার একথার মানে?'

ছোকরা বোধকরি ঠিক এভাবের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলোনা। ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলে, 'গভীর কোনো মানেপূর্ণ কথা আমি বলিনি, এমনি আপনার বসবার ভাবটা বেশ বিরহী বিরহী দেখাচ্ছিলো, তাই ব'লে ফেললাম। কোনো অপরাধ ক'রে ফেলে থাকি তো ক্ষমা করবেন।'

ছোকরার সন্দেহ হয়, এ লোকটা বোধকরি সদ্য বিপত্নীক। এবার লজ্জার পালা অভিমন্যুর।

ফিরতি ক্ষমাপ্রার্থনা সেও করে।

এবং দু'চারটি বাক্যবিনিময়ের মাধ্যমেই যেন বন্ধুত্ব বন্ধন ঘটে যায় ছোকরার সঙ্গে।
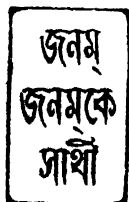
অবিবাহিত তরুণ যুবক।

অভিমন্যুর চাইতে বোধকরি বেশ খানিকটা ছোট।

নাম স্বরেশ্বর।

পেশা ব্যবসা-বাণিজ্য, তবে তার নিজস্ব ভাষায়, 'সেটা হচ্ছে গৌণ বাপ ঠাকুর্দ্দার চালিয়ে দেওয়া গাড়ী, তার উপর চেপে ব'সে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। প্রধান পেশা ফটো তোলা। বাপের পয়সা থাকলে কতো রকম বদখেয়ালীই তো এসে আশ্রয় করে, এ তো তবু মন্দের ভালো। কি বলেন?'

* *　　　*　　　* *

দিনের পর মাস কাটে, মাসের পর বছর।

মহাকালের অক্ষমালা হতে আর-একটি অক্ষ খসে পড়ে, বৃদ্ধা পৃথিবী আর একটু বৃদ্ধা হয়। মানুষের জীবনের জটিলতা আর-একটু বাড়ে। সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে, ব্যক্তিগতজীবনে, নৈতিক আর অর্থনৈতিকজীবনে জটিলতা শুধু বেড়েই চলেছে। বাড়ছে সভ্যতার মান, বাড়ছে শিক্ষার উৎকর্ষ, বাড়ছে জীবন-যাত্রার উপকরণ, তার সঙ্গে বাড়ছে অসহায়তা।

কবে কোন্ যুগে মানুষ আজকের মতো অসহায় ছিলো?

আজকের মানুষের ধরবার কোনো খুঁটি নেই। বিজ্ঞান আর সভ্যতা তাকে ভীমবেগে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চলেছে। কে জানে স্বর্গে কি রসাতলে!

জনম্ জনমকে সাথী

এই তর্ক চলে কেদার-বদরীর পথে অভিমন্যু আর সুরেশ্বরের মধ্যে।

শুধু মাকে নিয়ে তীর্থের পথে পথে ঘুরতে অভিমন্যুর মধ্যে যে ভারাক্রান্ত জড়তা এসে গিয়ে-

ছিলো, তিলে তিলে মনের যে মৃত্যু ঘটছিলো, সুরেশ্বর তার হাত থেকে যেন অভিমন্যুকে বাঁচাতে এসেছে। জীবনকে আবার বুঝি দেখতে পায় অভিমন্যু। এই নীরস দীর্ঘ পথ সরস হয়ে ওঠে দুই অসমবয়সী বন্ধুর তর্কে, গল্পে, কৌতুক হাস্যে।

অভিমন্যু বুঝি ভুলেই গেছে, সে কতো হতভাগ্য, সমাজে তার ঠাঁই কোথায়। ভুলে গেছে আবার তাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে, মুখ দেখাতে হবে পরিচিত সমাজে।

কর্ম্মস্থলে?

সেখান থেকে তো অব্যাহতি নিয়েই এসেছে সে। সুরেশ্বর বলে—সে মানস কৈলাস পর্য্যন্ত ধাওয়া করবে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে। অদ্ভুত সখ! সখের জন্য কী কৃচ্ছ্র সাধনা, কী বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া!

সুরেশ্বর হাসে আর বলে, বাড়ীতে কি কম গালাগাল খেয়েছি? আসবার আগে মা তো সাতদিন কথা বলেনি, মুখ দেখেনি।'

'তবু তুমি—?'

'তা আর কি করা যাবে বলুন? কথাতেই আছে 'এ রোষ রবেনা চিরদিন।' সখ বড়ো দুর্দ্দান্ত নেশা অভিমন্যুদা! ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে ব'সে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু করা যাবে কি? আপনার মতো দেবতা-মানব আর ক'জন থাকে বলুন?'

'হঠাৎ আমাকে আবার এ অপবাদ কেন?'

জনম্ জনমকে সাথী

'নয় কেন? দেখছি তো আপনাকে এতোদিন ধ'রে, এপর্য্যন্ত আপনার মধ্যে মনুষ্যোচিত কোনো গুণ দেখতে পেলামনা। না সখ, না নেশা। পত্নী-বিয়োগ হয়েছে, মলিন বদনে জননীর পদাঙ্কানুসরণ

ক'রে তীর্থ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন! হুঁঃ, আমি হ'লে—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পত্নী সংগ্রহ ক'রে হনিমুনে বেরিয়ে পড়তাম। ভোজ খেতাম, সিগারেট খেতাম, শিকার করতাম, ফটো তুলতাম। তা নয়—ধ্যেৎ!'

পত্নীবিয়োগের সংবাদটা পূর্ণিমাদেবীর পরিকল্পিত। শুনে প্রথমটা অভিমন্যু শিউরে উঠেছিলো, তারপর নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে।

অভিমন্যু মৃদু হেসে বলে, 'একটিই সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারলেনা এখনো, আবার দ্বিতীয়!'

'মনের মতো পাচ্ছিনা অভিমন্যুদা! এই আটাশ বছর ধ'রে পৃথিবীতে চরছি, আজ পর্য্যন্ত এমন মেয়ে চোখে পড়লোনা যাকে দেখে মন ব'লে ওঠে, বাঃ, এই তো আমার বনলতা সেন। যাকে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে হারাতে হারাতে আর পেতে পেতে আসছি।'

'তুমি ভারী ফাজিল।'

'ধ'রে ফেলেছেন দেখছি।' সুরেশ্বরের নির্ম্মল উদাত্ত হাসির স্বরে নির্জ্জন পার্ব্বত্য-পথ সচকিত হয়ে ওঠে।

অনেকটা পিছন থেকে পূর্ণিমা মালা জপতে জপতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আসতে আসতে চেঁচান্ 'তোরা কি আমায় ফেলে এগিয়ে যাবি নাকি? অতো লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিস্ কেন?'

মনে মনে দাঁতে দাঁত পিষে বলেন, 'বেশ ছিলাম দুটি মায়ে-পোয়ে, এই শনি যে কোথা থেকে এসে জুটলো! কপাল আমার!'

জনম্ জনম্কে সাথী

ওদিকে অভিমন্যু মনে মনে ভাবে, 'আঃ, মা যদি

সঙ্গে না থাকতেন। অনায়াসে আমিও পাড়ি দিতাম মানস কৈলাসের পথে। মা এক বাধা!'

সুরেশ্বরের অন্য চিন্তা। প্রচুর ফিল্‌ম এনেছে বটে, কিন্তু তবু—কুলোবে তো? আর কোথায় সংগ্রহ করতে পারা সম্ভব? শুনেছে, বদরী-নারায়ণের মন্দিরের কাছে নাকি দিব্যি দোকানপাট সহর বাজার গজিয়ে উঠেছে আজকাল। জিনিসটা মিলবেনা সেখানে?

'আচ্ছা অভিমন্যুদা, আপনি লেখক-টেখক নয় তো?'

'সে কি? কেন?'

'এমনি জেনে নিলাম, নির্ভয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা যাবে। লেখকগুলো কী মিথ্যুক দেখেছেন?'

'অর্থাৎ?'

'এই দেখুন, এই যে চলেছি মহাপ্রস্থানের পথে—তা একটাও এমন সাহসী বিদুষী সুন্দরী তরুণী আপনার চোখে পড়লো, যে নভেলের নায়িকা হবার উপযুক্ত? এক্ টুকরোও না! এমন কি অলৌকিক শক্তিধারী কোনো সাধু এসেও অকস্মাৎ দর্শন দিলোনা! ওসব হয়না। সব বাজে বানানো কথা।'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'তা সাহিত্য তো বানানো কথারই বেসাতি।'

'ওটা ভুল। কাহিনীটা বানানো হোক্, ঠিক আছে। কিন্তু ঘটনাচক্রগুলো স্বাভাবিক হবার দরকার আছে তো?'

'ঘটনাচক্র! মানুষের জীবনে কতো অস্বাভাবিক ঘটনাচক্র ঘটে তোমার জানা নেই।'

'তার মানে, আপনার জানা আছে।'

'কেন, আবিষ্কার করবার চেষ্টা করবে নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনাকে আবিষ্কার না ক'রে ছাড়বোনা ভাবছি। নিশ্চয়ই আপনি কোনো ঘটনাচক্রে প'ড়ে—'

পূর্ণিমাদেবী কাছে এসে পড়েছেন।

শ্রমপাংশু মুখ! কাঁপা কাঁপা বুক। রোষকষায়িত দৃষ্টি।

'তুই আমার সঙ্গে এমন করবি জানলে আমি এখেনে আসতামনা অভি! হাওয়ার মতন ছুটে এগোচ্ছিস্, জ্ঞান নেই যে মা বুড়ি পেছনে প'ড়ে? উঃ, কী কষ্টই দিচ্ছে ভগবান!'

অভিমন্যু ম্লান অপ্রতিভ মুখে মাকে ধরে।

কিন্তু বেপরোয়া সুরেশ্বর দিব্য হাস্যবদনে ব'লে ওঠে, 'তা মাসীমা আপনি ডাণ্ডি চড়বেননা, কাণ্ডি চড়বেননা, এখন কষ্ট হচ্ছে বললে চলবে কেন? আপনারাই তো বলেন, কষ্ট না করলে কেষ্টপ্রাপ্তি ঘটেনা।'

'তুমি থামো তো বাছা।'

বিরক্ত বিরস মুখে আবার হাঁটা সুরু করেন পূর্ণিমা বিড়বিড় করতে করতে। বৌ যদি বা ঘাড় থেকে নামলো তো কোথা থেকে এক বন্ধু এসে ঘাড়ে চাপলো। শনি, শনি! নেমে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি বাবা। কেদারে আবার মানুষে আসে!'

আসে বৈকি!

হাজার হাজার বছর ধ'রে তো এসেই চলেছে মানুষ। দুর্গম পথের প্রতি দুরন্ত আকর্ষণই যে মানুষের মূল প্রকৃতি। হাজার হাজার বছর ধ'রে কোটি কোটি লোক আসছে যাচ্ছে। যখন পথ ছিলো মারাত্মক ভয়ঙ্কর, সভ্যতার অবদান পৌছয়নি এতো দূর অবধি, তখন ফেরার আশা না রেখেই আসতো, এখন সুগম পথ ধ'রে সহজে

জনম্ জনমকে সাথী

স্বচ্ছন্দে আসছে, ফিরে যাচ্ছে।

অভিমন্যুও ফিরলো একদিন।

আর ফিরে স্টেশনে নেমেই দেখলো সারা কলকাতা যেন তার দিকে তীব্র ব্যঙ্গ দৃষ্টি হেনে নির্লজ্জ হাসি হাসছে।

এ কী কুৎসিত!

এ কী জঘন্য!

এ কি শক্তিশেল! অভিমন্যু কেন ফিরে এলো!

মঞ্জরী লাহিড়ী! মঞ্জরী লাহিড়ী।

সমস্ত কলকাতা সহর মঞ্জরী লাহিড়ী নামের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে ব'সে আছে। সহরের সমস্ত পথে পথে স্মিতাননা মঞ্জরী লাহিড়ী সহস্র পথিকের দিকে কটাক্ষ হেনে মোহন হাসি হাসছে।

এই কিছুদিন আগেও যে মঞ্জরী ছিলো প্রফেসর অভিমন্যু লাহিড়ীর স্ত্রী!

বিরাট 'হোর্ডিং' লাগিয়েছে হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে। মুটেকে পয়সা চুকিয়ে দিতে দিতে কথাটা কানে এলো।...

'কী মনকাড়া হাসিটা হাসছে মাইরি, দেখেছিস্? শালার মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে একেবারে! তুই দেখে নিস্ মাইরি, এ ছুঁড়িই এবার 'শোভারাণী' 'শ্যামলী সেনের' অন্ন মারবে নির্ঘাত।'

জনম্ জনমকে সাথী

একঝলক কটুগন্ধ বিড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেলো ছোকরা দুটো।

কিন্তু হাতে রিভলভার থাকলেই কি ওদের পাঁজরায় গুলি করতে পারতো অভিমন্যু? লাঠি থাকলে বসিয়ে দিতে পারতো মাথায়?

পারতো না।

অভিমন্যু যে ভদ্রলোক। যাদের সবথেকে ভয় কেলেঙ্কারীকে

সমাজের পিছনদিকের অন্ধকার গলিতে যাদের ঘোরাফেরা, তারাও ওই কথাই বলে। স্টুডিওর সাজঘরে উপবিষ্ট উন্মত্তদৃষ্টি আরক্তমুখ মঞ্জরীকে এক হিতৈষী ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে, 'চেপে যান মিসেস লাহিড়ী, চেপে যান। ও নিয়ে আর হৈ চৈ করবেন না। করতে গেলে লাভ কিছুই হবেনা, শুধু লোক জানা-জানি আর আড়ালে হাসাহাসি। আপনি চেঁচামেচি করলে বড়োজোর ডিরেক্টর মজুমদার লোক-দেখানো একটু ধমক দেবে আনন্দকুমারকে। তাতে আপনার ইজ্জত কিছু বাড়বে না। এসব জায়গায় ওটুকু কেউ ধর্ত্তব্যই করেনা। এ লাইনে এসেছেন যখন, ক্রমশঃ দেখতে পাবেন অনেক কিছু।'

অতএব হৈ চৈ করা চলবে না।

তাতে শুধু কেলেঙ্কারী!

এ লাইনে যখন এসেছো, তখন এখানের দস্তুরও শেখো। শেখো কিল খেয়ে কিল চুরি করতে। নইলে শুধু লোক হাসা-হাসি। হাতের কাছে ছুরি থাকলে কি নিজের এই নিটোল মসৃণ গালের খানিকটা মাংস খুব্‌লে কেটে উড়িয়ে দিতো মঞ্জরী? একডেলা আঙরা থাকলে চেপে ধরতো প্রচণ্ড জ্বালা-করা ওই জায়গাটায়? যাতে বিষে বিষক্ষয় হতে পারতো।

নাঃ। থাকলেও কিছুই করতে পারতোনা মঞ্জরী। কারণ আর দশ মিনিট পরেই তাকে অন্য এক স্টুডিওতে যেতে হবে, আর এক ডিরেক্টরের কাছে।

জনম্
জনমকে
সাথী

একসঙ্গে চারখানা বইয়ের কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছে মঞ্জরী।

কেলেঙ্কারী ক'রে সব কিছু পণ্ড করবার সাহস তার নেই।

সাহস তো সব দিকেই গেছে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা মেয়ের এই মহিমা দেখানো হাস্যকর ছাড়া আর কি? দেখাবেই বা কার কাছে? যারা ওটুকুকে ধর্ত্তব্যই করেনা তাদের কাছে?

অতএব ছেড়ে দাও ওটুকু শুচিবাই।

ছেড়ে দাও নিজেকে ছোটবেলার 'শ্লিপে' চড়ার খেলার মতো। ভাগ্যের এই মসৃণ আর ঢালু ফলকটার ডগায় ব'সে শুধু হাত পা ছেড়ে দিয়ে নামিয়ে দাও নিজেকে।

অবিশ্যি নামার হিসেবের সঙ্গে সঙ্গে ওঠারও একটা হিসেব থাকে বৈ কি! জগতের সকল ক্ষেত্রেই যে দাঁড়িপাল্লার ব্যাপার! একদিক নামলেই অপর দিক উঠবে!

পাল্লার অপর দিক উঠছে!

সর্ব্বত্র উঠছে ছবি আর নাম, পত্রিকায় পত্রিকায় উঠছে পরিচিতি আর জীবনী! তরুণ তরুণীর অটোগ্রাফ খাতার পাতায় উঠছে স্বাক্ষর। জ্বরবিকার রোগীকে দেওয়া থার্মোমিটারের তপ্ত পারার মতো ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের অঙ্ক উঠছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

এতো ওঠার চাপেও একটু-আধটু নামার গ্লানিটা ফিকে মেরে যায় বৈ কি!

জনম্ জনমকে সাথী

এখন আর বনলতার ফ্ল্যাটে থাকা মানায় না, নিজেকে আর তার মধ্যে ধরানোও যায়না, আলাদা

একটা ফ্ল্যাট নিতে হয়েছে মঞ্জরীকে। বনলতার ফ্ল্যাটের চাইতে দামী আর বড়ো।

মঞ্জরীর সুরুচি আর সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় বহন করছে তার ফ্ল্যাটের সাজসজ্জা। টাকাই শক্তি, টাকাই সাহস, টাকাই উপায়, টাকাই অভিভাবক। বনলতার ঝি মালতি মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে আর ফিরে গিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'আঙুল ফুলে কলাগাছ!'

বনলতাও আসে কখনো কখনো, মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণে ডাকে মঞ্জরী। ও মুখ বাঁকায় না, শুধু একটু একটু হাসে।

হাসে মঞ্জরীর তীব্র লালরঙে-ছোপানো ওষ্ঠাধর দেখে, হাসে মঞ্জরীর রঙিন এনামেল-করা ছুঁচলো-আগা লম্বা লম্বা নখ দেখে, হাসে মঞ্জরীর সোনার চিরুনি বসিয়ে জোড়াবেণীর কবরী রচনা দেখে, হাসে মঞ্জরীর শালীনতাহীন উগ্র আধুনিক পরন পরিচ্ছদ দেখে। এসবে ভারী ঘৃণা ছিলো মঞ্জরীর!

তবু বনলতা ওকে ভালোবাসে।

মাঝে মাঝে উপদেশ দেয়, 'একসঙ্গে অতোগুলো ছবির কণ্ট্রাক্ট করিস্ কেন? তাড়াতাড়ি সস্তা হয়ে যাবি।'

মঞ্জরী মনে মনে মুচকি হেসে ভাবে, 'আহা, দ্রাক্ষাফল অতিশয় অম্ল।' মুখে অমায়িক হাসি হেসে বলে, 'কি করবো লতাদি, দেশ-সুদ্ধ ডিরেক্টর যে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছে, আমায় না নামাতে পারলে ছবিই করবেনা। কী কাড়াকাড়ি যদি দ্যাখো।'

বনলতা মৃদু হেসে বলে, 'দেখতে হবেনা, কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তবু এইজন্যেই বলি, তোর স্বাস্থ্যটা তো খুব মজবুত না, এতো খাটলে পাছে ভেঙে পড়ে।'

জনম্ জনমকে সাথী

'ভেঙে পড়লে মরে যাবো—' মঞ্জরী উদাসস্বরে বলে, 'এ পৃথিবীতে তাতে কার কি এসে যাবে লতাদি ?'

'ওরে সর্ব্বনাশ'—বনলতা চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বলে, 'বাঙলা দেশের ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাইয়ের সর্ব্বস্ব লোকসান। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়বে সবাই। তুই যে কী বস্তু, তুই নিজেই কি এখনো টের পেয়েছিস্ ?'

মঞ্জরী এ পরিহাসে হাসে। বলে, 'টের পাইয়ে ছাড়ছে। ছাখোনা, বম্বের এক অফার নিয়ে দেবেশ মল্লিক কী লাগাই লেগেছে আমার পিছনে। আমি এখনো মনস্থির করতে পারছি না।'

'বম্বে ?'

বনলতা বিরূপভাবে বলে, 'বম্বেয় গিয়ে এমন কিছুই সুনাম হয়না।'

'সুনাম হয়না, সুদর্শনচক্র তো হয় ?' মঞ্জরী সাটিনের কুশনে কনুই ঠেশিয়ে দেহ ভেঙে ভেঙে হাসতে থাকে।

হ্যাঁ, এরকম হাসি আজকাল হাসতে শিখেছে মঞ্জরী।

'আর বেশী টাকার কী দরকার তোমার ?'

'টাকার কী দরকার ? তুমি যে হাসালে লতাদি। এ প্রশ্ন তো তুমি নিজেকেও করতো পারো ?'

বনলতা গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমার সঙ্গে তোমার তফাত আছে মঞ্জু। আমাকে মদ খেতে হয়, আমাকে প্রায়ই দু'চারটে জন্তু পুষতে হয়, আমাকে দেশের বাড়ীতে টাকা পাঠাতে হয়।'

জনম্ জনমকে সাথী

দেশের বাড়ীতে টাকা।

প্রথম কৈফিয়ত দুটো ঘৃণাভরে শুনছিলো, শেষের কথাটায় চম্‌কে সোজা হয়ে বসে মঞ্জরী।

'তোমার দেশ আছে ?'
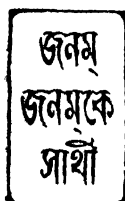
'তা এ প্রশ্ন করতে পারিস্ বটে। আমাদের দেখলে ইকোঁড় বলেই মনে হয়। তাই না?'

'না না, তা বলছিনা। মানে, দেশের বাড়ীতে তোমার কেউ আছে এখনো?'

'আছে বৈ কি।'

'কে আছে?'

'সবাই। মা বাপ ভাই ভাজ।'

মঞ্জরী স্তম্ভিত দৃষ্টি মেলে বলে, 'তারা তোমার টাকা নেয়?'

'আগে নিতোনা। নেবার কথা ভাবতেই পারতোনা আমিই লুকিয়ে দেশে গিয়ে ভাজের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা ক'রে -পায়ে ধ'রে রাজী করিয়ে—'

'কেন?' মঞ্জরী সহসা উদ্ধতভাবে সোজা হয়ে ব' বলে, 'কেন, এতো হাতে-পায়ে পড়া কেন?'

বনলতা বিষণ্ণ ম্লান হাসি হেসে বলে, 'বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ভাই পাগল।'

'ওঃ। তার মানে, নিতান্ত নিরুপায় বলেই তাঁরা দয়া ক'রে তোমার টাকাটি নিয়ে কৃতার্থ করছেন তোমাকে, এই তো? নইলে বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলেও ছুঁতেন না অবশ্যই।'

'সে তো নিশ্চয়ই।'

আরো বিষণ্ণ হাসি হাসে বনলতা।

'তবু তোমার তাদের দুঃখে মায়া আসে?'

'আসে তো।'

'ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলো?'

বনলতা হেসে ফেলে ওর উষ্মা দেখে। হেসে
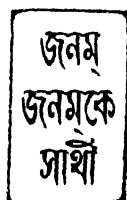
বলে, 'মিথ্যে নয়, বদনামটা সত্যি।'

'হুঁ। কিন্তু সব কলঙ্ক তাহ'লে টাকায় চাপা পড়ে?'

'তা কি আর পড়ে মঞ্জু? তা পড়েনা। কিন্তু অভাব জিনিসটা যে বড়ো সর্ব্বনাশী। সকলের আগে তো পেট। তার পরে মর্য্যাদার প্রশ্ন।'

'হুঁ। কিন্তু হাত পেতে যারা তোমার টাকা নিয়ে পেট ভরাচ্ছে, এখনো তো তারা তোমাকে বাড়ীর উঠোনে ঢুকতে দেবেনা?'

'ঢুকতে দেবেনা!'

সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা দেখা দিলো বনলতার রঙমাখা ঠোঁটের কোণে। বললো, 'তা দেবে। দেয়ও।'

'কি? তুমি যাও নাকি সেখানে?'

মঞ্জরীর চোখে অবিশ্বাসের বিস্ময়।

'মাঝে মাঝে! প্রায় দৈবাৎই! যদি কোনোদিন একটু বেশী অবসর থাকে—খুব দূরে তো নয়! বড়ো জোর মাইল তিরিশ।'

'তারা তোমার মুখ ছ্যাখে? তোমার সঙ্গে কথা বলে?'

বনলতা তেমনি মৃদু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, 'শুধু কথা বলে? কোথায় বসাবে, কি ক'রে মান রাখবে, ভেবে দিশেহারা হয়ে যায়।'

'আশ্চর্য্য! টাকা এমনই জিনিস তাহ'লে?'

'না, ঠিক টাকাই নয় মঞ্জু! প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আসল জিনিস! ওরা গরীব ব'লে ভাবছো শুধু টাকার জন্যেই—তা নয়! বড়োলোক হ'লেও করতো। যে কোনো বিষয়েই হোক, খানিকটা প্রতিষ্ঠা যদি অর্জ্জন করতে পারো, যারা একদিন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে তারাই কথা বলতে পেলে কৃতার্থ হয়ে যাবে। আমার ছেলেবেলার সই, যে আমার

প্রথম বয়সে আমার দুর্মতির সংকল্প শুনে বলেছিলো—আমি মরে গেলে হরিরলুঠ দেবে, সে আমার কাছে পাস নিয়ে বক্সে ব'সে থিয়েটার ছাখে, তিনকুলের গুষ্টিকে ডেকে এনে দেখায়।'

'আর তুমি ধন্য হয়ে তার জোগান দাও?'

বনলতা ওর রাগ দেখে হেসে উঠে বলে, 'তা মানুষের কোনোখানে তো একটু দুর্ব্বলতা থাকবেই।'

মিনিটখানেক গুম্ হয়ে থেকে মঞ্জরী ব'লে ওঠে, 'বম্বে আমাকে যেতেই হবে।'

'হঠাৎ সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেলো না কি?'

'হ্যাঁ তাই। আমার যশ চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, আর টাকাও চাই। অনেক টাকা…অজস্র টাকা…'

বনলতা মুচ্‌কে হেসে বলে, 'কেন? ত্যাগ-ক'রে-আসা স্বামীকে ফের টাকা দিয়ে কিন্‌বি?'

'সেই চেষ্টাই দেখবো।'

'কী লজ্জা! কী লজ্জা!' বড়ো জা আর মেজ জা একসঙ্গে মিলিত হয়ে লজ্জায় মরে গিয়ে বলে, 'শেষপর্য্যন্ত বম্বেতেও? এর-পরে আর বাকী কি থাকবে? তবু এতোদিন মনে করতাম, জেদ ক'রে একটা ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছে, হয়তো পরে ভুল বুঝতে পারবে, আর যে আমাদের গ'লে-যাওয়া ছাওর, হয়তো বা ফের ঘরেই নেবে, সে আশা নির্মূল হলো।'

কথার সুর শুনে কিন্তু বোঝা যায়না কোনটা কাম্য ছিলো এঁদের।

উঃ, সাহস বটে!' ওরা যেন অবাক হয়ে হয়েও

কূলকিনারা পাচ্ছেনা···'থাকতো কেমন শাস্ত সভ্য মতন, কে জানতো ভেতরে ভেতরে এতো বড়ো বুকের পাটা!'

'তবু যাহোক দেশের মধ্যে ছিলো, এরপর আর! ছি ছি! বিনা অভিভাবকে বম্বে চলে গেলে আর রইলো কি?'

'আছেই বা কি? মেজ জা মুখ বাঁকিয়ে বলেন, 'আমাদের হিঁদুর ঘরের মেয়ে, ঘরের বাইরে এক রাত কাটালেই জাত যায়, আর সে কি না এই দু'দুটো বছর কাটিয়ে দিলো। তাও কোন্ লাইনে? শুনতে পাই নাকি আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে লোকজন রেখে রামরাজত্ব করছে, গাড়ীও কিনেছে নাকি। না কিনবেই বা কেন, দু'হাতে রোজগার তো করছে!'

'আশ্চর্য্য! বিশ্বাস হতে চায়না যেন! সেই আমাদের ছোটবৌ!'

'অবিশ্বাসের আবার কি আছে?' মেজ জা আর একবার মাথা ঝাঁকানি দেন, 'এই যে লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে খারাপ মেয়েমানুষ, সকলেই কিছু আর খারাপ হয়ে আকাশ থেকে পড়েনি! তারাও একদিন মা বাপের সন্তান ছিলো, ছিলো স্বামীর স্ত্রী, হয়তো বা ছেলেমেয়ের মা।'

'উঃ, আমাদের ঘরে এমন হবে কে কবে ভেবেছিলো! এই যে আমরা অসুবিধেয় প'ড়ে আলাদা হয়ে এসেছি, এতেই কতো নিন্দে হয়েছে আমাদের, ওই ছোট ঠাকুরপোই তাই নিয়ে কতো ঠাট্টা-তামাসা করেছে, আর এখন?'

জনম্ জনমকে সাথী

'বেশী শাস্তি হয়েছে ভাসুরদের। ইনি তো বলেন, 'চেনা পরিচিত লোকের সঙ্গে পথে বেরোতে হ'লে চোখ তুলে চাইতে পারিনে, মাথা হেঁট ক'রে পথ চলি।'

'দেখতে দেখতে নামটাও ক'রে ফেললো বাবা! নামতে না নামতেই ষ্টার! হেন ছবি নেই যাতে না ওর নাম।'

'কী ছলাকলা! কী বেহায়াপনা! দেখতে ব'সে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ন'টার শো ভিন্ন যাইনা, পাছে কেউ দেখে ফেলে!'

'তুই তো তবু গিয়ে মরিস্, আমার ওপর তোর বট্‌ঠাকুরের কড়া নিষেধ।'

'আহা, সে নিষেধ কি আর আমার ওপরই নেই? শুনিনা। কৌতূহলের জ্বালায় মরি যে!'

'আচ্ছা, ছোট ঠাকুরপো ছ্যাখে ব'লে মনে হয় তোর?'

'ঈশ্বর জানেন। ছ্যাখে কি আর? দেখতে পারে? যতোই হোক ওর বুকের জ্বালা আলাদা। নিজের বিয়ে-করা স্ত্রী অপর পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে প্রেমের পার্ট করছে, সহ্য করা কি সোজা?'

ছোট-নন্দাই স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে হাসে আর ক্ষ্যাপায়, 'যাই বলো, তোমার ব্রাদারটি একটু ভুল ক'রে ফেললো। ওই গিন্নীটিকে অতো উড়তে না দিয়ে বাড়ীতে আট্‌কে রাখতে পারতো তো ইহ-জীবনে তাকে আর খেটে খেতে হতোনা! দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে—তিনতলা বাড়ী, শেভ্রলে গাড়ী, লোকলস্কর, মান মর্য্যাদা—'

'মান মর্য্যাদা?'

তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ওঠে শ্রোত্রীর কণ্ঠ থেকে।

'আহা, তা নয়ই বা কেন? মঞ্জরী লাহিড়ীকে নিয়ে আজ চারিদিক থেকে কাড়াকাড়ি কতো! বম্বে থেকে সাধছে—'
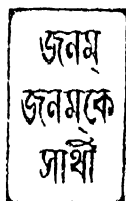
ছোট ননদ উদাসগম্ভীর মন্তব্য করে, 'বলো, যা প্রাণ চায় ব'লে নাও! বলবার দিন পেয়েছো যখন।'

বড়ো ননদের বাড়ীতে আবার অন্য ব্যবস্থা।

সেখানে অলিখিত শাসনে বড়ো থেকে ছোটটি পর্য্যন্ত মঞ্জরী সম্বন্ধে একেবারে নীরব! মঞ্জরীর নাম উচ্চারিত হয়না সে বাড়ীতে। সিনেমা দেখার মতো জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ আনন্দ বন্ধ হয়ে গেছে ওদের।

স্নীতি হাজারিবাগ থেকে ফিরে এসেছে অনেকদিন! ননদের মাথার দিব্যি দেওয়া যত্নে অতিরিক্ত ঘী দুধ আর আতপচাল খেয়ে খেয়ে কেমন একটা অস্বাভাবিক থপ্‌থপে মোটা হয়ে গেছে সে। স্থবির হয়ে গেছে অদ্ভুত ভাবে। শুধু মঞ্জরী সম্বন্ধে কেন, পৃথিবীর কোনো কিছু সম্বন্ধেই যেন তার আর কোনো চেতনা নেই। কিছুই যেন এসে যায়না তার—মঞ্জরী থাকুক আর উচ্ছন্ন যাক্‌। বড়ো মেয়ে কমল একদিন সসঙ্কোচে দুঃখ প্রকাশ করেছিলো—'তখন যদি আমরা ছোটমাসীকে এখানে রাখতাম মা, তাহ'লে হয়তো ছোটমাসী এভাবে—'

স্নীতি ক্লান্তস্বরে বলেছিলো, 'নিয়তিতে যাকে টানে, তাকে ধ'রে রাখবে কে কমলা?'

ছোট মেয়ে চঞ্চলা প্রথম দু'একদিন খবরের কাগজের খোলা পাতাখানা ধ'রে সাগ্রহে মাকে দেখাতে এসেছিলো ছোটমাসীর নাম আর ছবি।

জনম্ জনমকে সাথী

সুনীতি শ্রান্তস্বরে বলেছিলো, 'ওঘরে নিয়ে গিয়ে তোমরা ছ্যাখোগে।'

বোঝা যায়না মঞ্জরীর জন্যে তার মধ্যে আর একতিলও সহানুভূতি অবশিষ্ট আছে কি না। কে জানে, হয়তো নেই। যদি কষ্টে পড়তো মঞ্জরী, খেতে পেতোনা পরতে পেতোনা, তাহ'লে হয়তো সুনীতি তার কলঙ্ক ক্ষমা করতো, সস্নেহে কাছে টেনে নিতো। কিন্তু মঞ্জরী যে কলঙ্কের মূল্যে আহরণ ক'রে নিচ্ছে যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, স্বাচ্ছন্দ্য! আর কি প্রয়োজন আছে ওর দিকে চাইবার? ওর ভিতরের স্নেহকাঙালিনীকে ফিরে দেখবার গরজ কার হবে? সে কাঙালিনীকে বিশ্বাস করবে কে?

যার টাকা আছে তার আবার প্রয়োজনের কি আছে? না, তার জন্যে কারো হৃদয়ে মমতার দরজা খোলা থাকেনা! এখন তার জন্যে যদি কিছু মজুত থাকে, সে হচ্ছে ঘৃণা।

মঞ্জরী মুছে গেছে সুনীতির মন থেকে।

খানিকটা মুছে নিয়েছিলো ওর দুঃসাহস, বাকীটা মুছে নিয়েছে ওর সাফল্য।

শুধু কিশোরী চঞ্চলা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ব'সে ব'সে ভাবে।

লুকিয়ে চঞ্চলা একটা সংগ্রহশালা খুলেছে।

কাগজে পোষ্টারে, প্রোগ্রাম বইতে, সিনেমা-পত্রিকায় যেখানে যতো ছবি দেখতে পায় মঞ্জরীর, সব কেটে কেটে জমা করে সেই গোপন ভাণ্ডারে।

নানা মূর্ত্তি, নানা ভঙ্গি, নানা রূপ!

নিঃসঙ্গ কোনো দুপুরে সেইগুলো বার ক'রে বিছিয়ে বসে আর দেখে চঞ্চলা! দেখে আর ভাবে।
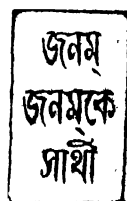
পত্রিকার মলাটে এই যে মুখ, যার মুখে দুরন্ত এক চপল হাসি, চোখে চটুল কটাক্ষ, গ্রীবায় অপূর্ব্ব ভঙ্গি, যে মুখ দেখলে বুকের মধ্যে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে, সারা শরীরে ভয় ভয় করে, এ কি সত্যই তাদের সেই ছোটমাসী? ছেলেবেলায় যে তাদের খেলার মধ্যে দলপতির অংশ গ্রহণ ক'রে হৈ হৈ করেছে, যে পরম উদারতায় অক্লেশে নিজের ভাগের চকোলেট লজেঞ্জস্ আর নিজের গলার পাথরের মালা, কাঁচপুঁতির মালা বোনঝিদের দান করেছে, এই সেদিনও যে তাদের সঙ্গে একত্রে খেয়েছে শুয়েছে গল্প করেছে!

সত্যি সেই? সত্যি সেই?

আবার এই যে কাগজের পৃষ্ঠায়?

বিষাদপ্রতিমা বিধবা নারী!

যার চোখের তারায় আকাশের অসীম শূন্যতা, যার ঠোঁটের রেখায় অসহায় বেদনার গভীর ব্যঞ্জনা!

এও কি তাদের সেই ছোটমাসী?

কোন্‌টা সত্যি তবে?

কোন্ রূপটা ওর যথার্থ রূপ?

ভাবতে ভাবতে মনটা যেন ভারী হয়ে ওঠে চঞ্চলার—হঠাৎ চোখের কোণে কোণে জমে ওঠে জলের রেখা।

এক একসময় ভারী ইচ্ছে হয় ছোটমাসীকে একবার দেখতে! দেখতে—ছোটমাসী তাকে চিনতে পারে কি না, তার সঙ্গে কথা বলে কি না।

কিন্তু কোথায় সে উপায়?

আবার নাকি শোনা যাচ্ছে—কলকাতা থেকে
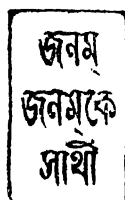
চলে যাবে বোম্বাই। কে জানে সেই অজানা জনারণ্যে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে কিনা ছোটমাসী···

কোনো কোনো রাত্রে, যে রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসেনা মঞ্জরীর, বিছানায় শুয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে, সেরাত্রে চোখের তারায় আকাশের অসীম শূন্যতা, আর ঠোঁটের কোণায় অসহায় বেদনার গভীর ব্যঞ্জনা নিয়ে মঞ্জরী যে জানলার ধারে ব'সে ব'সে ভাবে—সমস্ত পৃথিবী থেকে সে বুঝি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার চিরকালের পরিচিত জগৎ থেকে চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—সেটা ভুল ক'রে ভাবে। তার পরিচিত জগতের প্রত্যেকের মনেই সে বেঁচে আছে।

বেঁচে আছে 'জ্বালা' হয়ে।

অপমানের জ্বালা হয়ে, অভিমানের জ্বালা হয়ে, বিস্ময়ের জ্বালা হয়ে, ঈর্ষার জ্বালা হয়ে।

দিনেরবেলায় মনের চেহারা আলাদা।

দিনেরবেলায় কিছুই এসে যায়না মঞ্জরীর—কে তাকে মনে রাখলো আর কে না রাখলো। তখন শুধু এগিয়ে চলা, আরো এগিয়ে চলা। জয়ের পথে, যশের পথে। প্রতি মুহূর্তে পান করা চাই নতুন নতুন উত্তেজনার কড়া মদ। নিজেকে ধ্বংস ক'রে, নিজেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে আর খণ্ড খণ্ড ক'রে বিকশিত করতে হবে।

এই তো চেয়েছিলো সে।
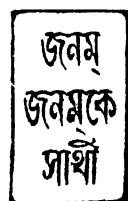
ললিত লাবণ্যে নিজেকে বিকশিত করতে।

এই চেয়েছিলো মঞ্জরী ?

চেয়েছিলো বই কি। বুঝে না বুঝে হাত দিলেও আগুন কি তার স্বধর্ম্ম ছাড়ে ? অবোধ ব'লে ক্ষমা করে ?

রঙিন কাঁচের গ্লাশের জৌলুসে মুগ্ধ হয়ে মঞ্জরী হাত বাড়িয়ে বিষের পাত্র নিয়ে চুমুক দিয়েছে, বিষের দাহ সুরু হবে না ?

তারপর ?

তার পর তো মৃত্যু আছেই।

আজ ছুটি।

আজ সুটিং নেই।

অনেক কষ্টে আর অনেক অঙ্ক ক'ষে এই ছুটিটুকু বার করা।

বাড়ীতে আজ কিছু অতিথি সমাগমের আয়োজন করেছে মঞ্জরী।

হ্যাঁ। নিজের বাড়ীতে এরকম একটা পার্টি দেবার সাহস মঞ্জরীর হয়েছে। টাকা মানেই তো সাহস।

নিমন্ত্রিতেরা এখনো কেউ এসে পৌঁছয়নি।

ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে প্রসাধনপর্ব্ব সারছিলো মঞ্জরী। নিজেকে কতো মনোহারিণী ক'রে তোলা যায় এ বোধকরি তারই সাধনা।

পরেছে সমুদ্রের ঢেউ-রঙা মিহি সিল্কের শাড়ী, মিহি অদ্ভুত রকমের মিহি, প্রায় জলের মতোই স্বচ্ছ, শুধু চোখ-জ্বলা ঝক-ঝকে চওড়া রুপোলী জরীর ভারী পাড়টা ভারসাম্য বজায় রেখে শাড়ীটাকে দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে রাখতে সাহায্য করছে।
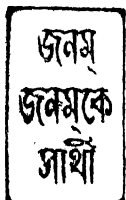
মঞ্জরী কি আগে কখনো কল্পনা করতে পারতো,

সাতপাটেও স্বচ্ছতা হারায় না এমন শাড়ী প'রে অক্লেশে ঘুরে বেড়াতে পারবে সে?

অথচ সহজেই পারছে এখন।

এই সাগরনীল শাড়ীটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরেছে একটা সিঁদুরলাল ব্লাউজ, হাতে দুটো মোটা মোটা ঢল্‌ঢলে বালা, গলায় শুধু একটা চওড়া চিক্‌। আজ আর সোনার চিরুনি গাঁথা খোঁপা নয়। আজ সাদা সিল্কের চওড়া ফিতে দিয়ে শুধু একটু আল্‌গা ক'রে গোড়া বেঁধে-রাখা এলো চুল, পায়ে জরির চটি।

মাজাঘষা গালে আর একবার আল্‌তো ক'রে একটু পাউডার বুলিয়ে নিলো, গাঢ় লালরঙে ছোপানো ঠোঁটে আর একটু টাট্‌কা লালের আভাস, চোখের কোলে কোলে সুর্মার টানটা নিখুঁত আছে কিনা দেখে নিলো আর একবার।

মনোহারিণী নয়, মনোমোহিনী।

মঞ্জরীর গায়ের রং যে কোনোদিনই ফর্সা ছিলোনা, ছিলো শ্যামলা শ্যামলা, সে আর এখন ধরবার উপায় নেই।

প্রসাধন শেষ ক'রে বসবার ঘরে যাবার আগে মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠলো মঞ্জরীর।

বোম্বাই তারকাদের কাছে কি রূপে হার মানবে?

ইস্‌!

কিন্তু আশ্চর্য্য!

মুখের মৃদু দাম্ভিক হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়ে সহসা একটা ক্লান্তির ছায়া নামলো। স্খলিত পায়ে এঘরে এসে একটা সোফায় ব'সে পড়লো মঞ্জরী।

আশ্চর্য্য!

তার পুরনো জগতটা কি সত্যিই এ সহর থেকে

বিলুপ্ত হয়ে গেছে ? নইলে কোনো সূত্রে এক মুহূর্তের জন্যও কাউকে দেখতে পাওয়া যায়না কেন ? সম্ভব অসম্ভব কতো জায়গাতেই তো কতো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মানুষের। শুধু মঞ্জরীর ভাগ্যটাই আলাদা বিধাতার তৈরি ?

এতো তাড়াতাড়ি, পয়সা হতে না হতে গাড়ী কেনবার দরকার কি ছিলো মঞ্জরীর ? কেনা তো শুধু এতোটুকু অবসর মিললেই ড্রাইভারটাকে পথে পথে ঘুরিয়ে মারার জন্যে !

অথচ যে পাড়ায় গেলে নিশ্চিত কারো দেখা মিলবে, সেখানে যেতে সাহস হয়না। শুধু আশে-পাশে, শুধু এখানে-সেখানে। কিন্তু আশ্চর্য্য !

মঞ্জরীর পুরনো পরিচিতের জগতটা যেন এ সহর থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মঞ্জরীই বা এতো বোকামী করে কেন ?

কতোদিন অনেক রাত্রে গাড়ী বার করতে ব'লে অভিসারিকার রোমাঞ্চ নিয়ে প্রস্তুত হয়, নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করে—দ্বিধা সঙ্কোচ না রেখে বিশেষ একটা রাস্তায় যাবার নির্দ্দেশ করবে ! দেখবে আজও দোতলার সেই ঘরটায় অনেক রাত অবধি আলো জ্বলে কি না, দেখবে জানলায় সেই অনেক যত্নে তৈরি ছুঁচের-কাজ-করা পর্দ্দাগুলো এখনো আছে কি না, দেখবে ঘুমের আগে একবার মিনিট দুয়েকের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো কিনা একজন।

অনেক রাত্রে গাড়ী একখানা যদি কোনো একটা বাড়ীর আশে-পাশে দু'চারবার ঘুরেই মরে, কে লক্ষ্য করতে যাচ্ছে ?

জনম্ জনমকে সাথী

সবকিছু ভেবে সাহস ক'রে গাড়ী বার করতে বলে, কিন্তু পথে বেরিয়েই কী এক সর্ব্বনাশা ভয়ে সমস্ত মন শিথিল হয়ে আসে, বুক ঢিপ ঢিপ করে, ঠিক ঠিকানা আর বলা হয়না। শুধু এলোমেলো ভাবে

একটু ঘুরে আসার নির্দ্দেশ দিতে বুকের পাথর নামে। নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে বুক ভ'রে বাতাস নেয়—অনেক রাত্রের নির্জ্জন-হয়ে-আসা সহরের খোলা হাওয়া।

না, কিছুতেই কোনোদিন কোনো জানা রাস্তার নাম উচ্চারণ করতে পারেনা মঞ্জরী ড্রাইভারের সামনে।

তবু প্রতিদিনই সকাল থেকে মনের এক নিভৃততম কোণে ক্ষীণ একটু আশার সুর বাজে। প্রতিদিনই মনে হয় 'আজ নিশ্চয়ই।'

বনলতার দাসী মালতি মনিবানীর পিছন পিছন এসেও আগে প্রশ্ন করে, 'কি গো নতুন দিদিমণি, আপনার বাড়ীতে আজ কিসের ঘটা?'

মঞ্জরী ললিতহাসি হেসে বলে, 'নিজেই নিজের ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি!'

বসলো ওরা।

বনলতা বললো, 'ওখানের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেছে?'

'হুঁ।'

'কে নিচ্ছে?'

মঞ্জরী বম্বের একটা বিখ্যাত চিত্রনির্ম্মাতা কোম্পানীর নাম করলো।

'কতোদিনের জন্যে?'

'আপাততঃ একবছর। তারপর—তারপর হয়তো আর কখনো এখানে ফিরবোই না।'

'বাঙলাকে কানা ক'রে জন্মের শোধ চলে যাবার খেয়াল কেন?'
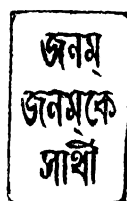
মঞ্জরীর সুর্মাটানা আঁখিপল্লব ঈষৎ কেঁপে ওঠে, উদাসভাবে বলে, 'এখানে আমাকে কে চায় লতাদি ?'

বনলতা কিছু বলার আগেই অদূরে দণ্ডায়মানা মালতি কণ্ঠে মধু ঢেলে বলে, 'ওমা ! কি কথা বলে গো নতুন দিদিমণি ! আপনাকে তো এখন সবাই চাইছে ।'

বনলতা ওর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'আচ্ছা, আপাততঃ তোমাকে কেউ চাইছে না । বাইরে গিয়ে বসতে পারো ।'

অপমানের রাঙামুখ নিয়ে ঝনাৎ ক'রে বেরিয়ে যায় মালতি ।

'আর কে কে আসবে ?' বললো বনলতা ।

'বেশী কেউ না । শ্যামল সেন, লোকেশ মল্লিক, রেবা দাস, নিশীথ রায়, আনন্দকুমার—'

বনলতা বাধা দিয়ে বাঁকা কটাক্ষ হানলো 'তাকেও ?'

'বললাম ।' মঞ্জরী উদাসভাবে বলে, 'যাবার বেলা বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই ।'

বনলতা হীরের আংটি-ঝলসানো চাঁপারকলি আঙুলে কপালে-উড়ে-পড়া চুলগুলো আল্‌তো ছোঁয়ায় সরিয়ে দিয়ে বলে, 'এ তো সে যাত্রা নয়, এ যে একেবারে সর্ব্বনাশের আকর্ষণে যাত্রা ।'

'সর্ব্বনাশের মাঝখানেই তো বাসা বেঁধেছি ।'

'তবু এখানে তোমাকে রক্ষা করছে তোমার জন্মকালের বন্ধন, আজন্মের সংস্কার, সেখানে তুমি স্রোতের শ্যাওলা ।'

আস্তে ক'রে একটু হাসলো মঞ্জরী—'পদ্ম হয়ে ফুটতে যে না পারলো, শ্যাওলা হয়ে ভাসাই তো তার পরিণতি ।'

জনম্ জনমকে সাথী

বনলতা মিনিটখানেক স্তব্ধ থেকে বললো, 'তোর মনে আছে, আমায় একদিন বলেছিলি, "ইচ্ছে করলেই তুমি ভালো হতে পারো লতাদি ।" আছে মনে ?'

হঠাৎ পেণ্ট্ পাউডার রুজ সব-কিছু ছাপিয়ে জেগে ওঠে একটা পাংশু মলিনতা, ভারী করুণ দেখায় সে মুখ, কিন্তু সে সামান্যক্ষণের জন্যই। সেই পাংশু হয়ে যাওয়া মুখে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে ওঠে মঞ্জরী, বেখাপ্পা বেয়াড়া হাসি।

হাসতে হাসতে লাল হয়ে গিয়ে বলে, 'মনে আছে বৈকি, খুব আছে। সেই প্রশ্ন আবার তুমিই বুঝি আমাকে করবে?'

'তাই ভাবছি।'

'কিন্তু তার উত্তর তো তুমি নিজেই সেদিন দিয়েছিলে লতাদি।'

দিয়েছিলাম। তবু ভেবেছিলাম, তুই বুঝি ব্যতিক্রম হবি। তুই বুঝি আলাদা ধাতু দিয়ে তৈরী।"

হাসি থামিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে গম্ভীর হয়ে বললো মঞ্জরী, 'সৃষ্টিকর্তার ভাঁড়ারে মাত্র দুটোই ধাতু আছে লতাদি। তারতম্য যা কিছু নক্সায় আর পালিশে। সব মেয়েমানুষ এক ধাতুতে তৈরী, সব পুরুষই এক ধাতুতে।'

বনলতা কি বলতে যাচ্ছিলো, সিঁড়িতে পদধ্বনি উঠলো।

উদ্দাম অসম পদক্ষেপ, তার সঙ্গে নারী ও পুরুষ-কণ্ঠের সম্মিলিত কলধ্বনি।

বাকীরা এসে গেছে।

জীবনে যতো বিরাট পরিবর্ত্তনই আসুক, তবু আস্তে আস্তে নিজেকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে মানুষ। দৈনন্দিন কর্মচক্রের ঘুর্ণিপাকে সে পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে স্থির থাকতে পারেনা, খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় অচেতন মনের খাঁজে খাঁজে।

জনম্ জনমকে সাথী

তীব্র জ্বালা, অসহনীয় যন্ত্রণা, সবই ক্রমশঃ অনুভূতির জগৎ থেকে ধূসর হয়ে আসে। পোড়খাওয়া মোচড়খাওয়া মানুষও আবার হাসে, গল্প করে, খায়, বেড়ায়।

অভিমন্যুও ক্রমশঃই স্থির হ'তে থাকে।

অবশ্য অস্থিরতার বাহ্যিক প্রকাশ কোনোদিনই ছিলোনা তার। কলকাতা ছেড়ে যে পালিয়েছিলো, সেও পূর্ণিমার জ্বালাতনে।

অধ্যাপনার কাজটা ছেড়ে দিয়েছিলো ছাত্রীমহলে অপদস্থ হবার ভয়ে। কেদার-বদরী থেকে ঘুরে এসে একটা সংবাদপত্রের অফিসে কাজ জোগাড় ক'রে ফেলে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জীবনটাকে।

নিঃসঙ্গ জননীকে সঙ্গ দিতে বোনেরা আজকাল ঘনঘন আসেন, তাদের সঙ্গে বাইরে থেকে অন্ততঃ স্বাভাবিক ভাবেই গল্প করে অভিমন্যু, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের নিয়ে খুনসুটি আর খেলা—তাও করে বৈকি। শুধু একটু যেন স্তিমিত, একটু যেন নিষ্প্রাণ।

রাস্তার দেয়ালের পোষ্টার, কাগজের অরুচিকর বিজ্ঞাপন, এসব আর যেন তেমন ক'রে চাবুক মারেনা, চোখের উপর দিয়ে ভেসে চলে যায়।

এমনি সময় একদিন সুরেশ্বরের সঙ্গে দেখা হলো, সেকথা পরে বলছি।

জনম্ জনমকে সাথী

ফেরার সময় গাড়ীতে উঠে মালতি ভুরু কোঁচকালো। বললো, 'সবাই তো যে যার জায়গায় চলে গেলো দিদি,

ওই আপনাদের নিশীথ রায়টা এখনো ব'সে রইলো কেন বলো তো ?'

এ প্রশ্ন বনলতার মনেও তোলাপাড়া করছিলো, নিশীথ রায়ের মতলবটা যেন আজ ভালো নয়। আর মঞ্জরীও যেন দেখাতে চাইছে 'ছাখো আমার কতো সাহস!' কী ভাবছে ও ? আগুন নিয়ে খেলা করবে ? না কি চরম সর্ব্বনাশের আগুনে আহুতি দিতে চায় নিজেকে ?

নিশীথ রায়ের চোখে আজ সেই সর্ব্বনাশের আগুন দেখতে পেয়েছে ভুক্তভোগী বনলতা। কিন্তু বনলতার করবার কি আছে ? ও তো মঞ্জরীর গার্জেন নয় যে জোর ক'রে তার সর্ব্বনাশের দরজা আট্‌কে ধরবে ?

যে আর আগের মতো নেই সে অবশ্য স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কেউই থাকেনা। জড়োসড়ো মুখচোরা মেয়েরাও ছ'দিনে বেহায়া হয়ে ওঠে, বাচাল হয়ে ওঠে। কিন্তু মঞ্জরী কি একেবারে তেমন সাধারণ ? নিজেকে একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলতে বাধবে না ওর ? বনলতার এতোদিনের ধারণা কি তবে ভুল ?

গাড়ী চলতে থাকে।

মালতি আর একবার নড়ে-চড়ে ব'সে বলে, 'আমার কিন্তু আজ নতুনদিদিমণির জন্যে ভাবনা হচ্ছে। যতোই হোক, ভদ্দরঘরের বৌ, এ পর্য্যন্ত আর যাই করুক—'

'উচ্ছন্ন যাক্‌!' বনলতা চরম বিরক্তির স্বরে ব'লে ওঠে, 'জাহান্নমে যাক্‌। তুই চুপ করবি ?'

জনম্ জনমকে সাথী
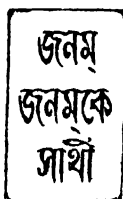
যাকে নিয়ে এতো ভাবনা মালতির, সত্যই সে

তখনো মঞ্জরীর বসবার ঘরে রেশমী কুশনে ঠেশ দিয়ে ব'সে পরম আলস্যভরে ধূমকুণ্ডলীর সৃষ্টি করছিলো। উঠবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা।

বনলতা যতক্ষণ ছিলো, দর্পিতা বিজয়িনীর রূপে হাসিতে আর কথায় সকলের মন হরণ করছিলো মঞ্জরী। বনলতা চলে যেতেই হঠাৎ কেমন 'ফ্যাকাসে' মেরে গেলো, চঞ্চল হয়ে উঠলো।

'সবাই চলে গেলো, আপনি এখনো ব'সে কেন ?'

এ প্রশ্ন কোনো ভদ্রলোককে সহসা করা যায়না। আবার করলে হয়তো উত্তরটাই আতঙ্ক আর আশঙ্কাকে মুহূর্ত্তে স্পষ্ট ক'রে তুলবে। ভয়কে উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখতে যাবার সাহস কার আছে ? ভয়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করাই মানুষের স্বধর্ম্ম।

'প্লীজ্ এক মিনিট—' লীলায়িত ভঙ্গিটা বজায় রেখেই মঞ্জরী উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় হাতজোড় ক'রে বলে, 'আমার লোকজনদের খাওয়া হ'লো কি না দেখে আসি—'

নিশীথ রায় ভঙ্গির অলসতা ত্যাগ ক'রে উঠে ব'সে বলে, 'লোক-জনদের ? মানে, চাকর-বাকরদের ?'

'হুঁ।'

'এই তুচ্ছ কাজটার জন্যে আপনি ?'

মঞ্জরী গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমি একে তুচ্ছ কাজ ভাবিনা মিষ্টার রায়!'

জনম্ জনমকে সাথী

'ভালো ভালো! সর্ব্বজীবে সমভাব! আচ্ছা আসুন আপনার মহৎ কর্ত্তব্য সেরে, আমি অপেক্ষা করবো।'

অপেক্ষা! কিসের অপেক্ষা!

ঘড়ির দিকে চোখটা গেল অজ্ঞাতসারে।

বুকটা কেঁপে ওঠে মঞ্জরীর। উজ্জ্বল আলোর নীচে মুখটা অসম্ভব পাণ্ডুর দেখায়। কপালে ঘাম ফুটে ওঠে।

কিন্তু বুক-কাঁপানো মারাত্মক ভয়ই বোধকরি সাহসের জন্মদাতা। ভয়ের মধ্যে থেকে সাহস সঞ্চয় ক'রে নেয় মঞ্জরী। কিসের ভয়? মঞ্জরী তো রাস্তায় প'ড়ে নেই? এটা তার নিজের বাড়ী, তার হুকুমের অপেক্ষায় অবহিত হয়ে আছে তিন-তিনটে চাকর-দাসী। কোমলগঠন মুখের নমনীয় রেখার তলায় তলায় কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

'অপেক্ষা করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?'

'প্রয়োজন?' নিশীথ রায় মুচকি হাসে। 'ভয়ানক প্রয়োজন।'

'ধূর্ত্ত শিয়াল' কথাটা বরাবর শুনে এসেছে মঞ্জরী, কখনো চোখে দেখেনি। আজ এই মুহূর্ত্তে যেন কথাটার অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওর কাছে। নিশীথ রায়ের ক্ষৌরমসৃণ সুগঠন মুখের মোলায়েম খাঁজে খাঁজে সেই অর্থের ব্যাখ্যা।

'আমি তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না।'

গম্ভীর গলায় বললো মঞ্জরী।

'প্রয়োজনটা আমার দিকে।'

আর একবার শৃগাল-হাসি হাসে নিশীথ রায়।

'আমি কোনো প্রয়োজন দেখিনা। আপনার যদি বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকে ব'লে নিন, এক মিনিট সময় দিচ্ছি।'

'বক্তব্য? আমার বক্তব্য তো এক মিনিটে শেষ হবার নয় মঞ্জরীদেবী?' নিশীথ রায় আরামের আলস্য ভঙ্গি ক'রে ফের কুশানে গা ডুবিয়ে বলে, 'সারারাত সময় পেলে হয়তো কতকটা—'

'সুধীর!'

তীব্র তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদের মতো চীৎকার ক'রে ওঠে মঞ্জরী।

'আহা-হা, অতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

নিশীথ রায় আবার সোজা হয়ে বসে।

সুধীর এসে দরজায় দাঁড়ালো।

আধবুড়ো-গোছের একটু গ্রাম্য প্যাটার্ণের লোকটা। 'মা, ডাকছেন?'

পরক্ষণেই ধূর্ত্তশিয়ালের মুখ থেকে আদেশবাণী উচ্চারিত হয়, 'হ্যাঁ, এক গ্লাশ জল আনো তো।'

একজোড়া ঘোলাটে আর বোকাটে গ্রাম্য-চোখে দুটো আগুনের ফিন্‌কি জ্বলে উঠে ফের নিভলো। নিঃশব্দে আদেশ পালন করতে ফিরে দাঁড়ালো সে।

'জল নয়, শোনো, দাঁড়াও!'

মঞ্জরীর স্বর হিংস্র দৃঢ়। 'শোনো, বাবু যাচ্ছেন, এঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো।'

সুধীরের মুখ দেখে মনে হলো সে যেন এইমাত্র ঈশ্বরের দৈববাণীতে বরাভয় পেয়েছে।

'চলুন বাবু!'

সিগারেটের টিনটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিশীথ। তার চোখেও হিংস্র জানোয়ারের উদ্যত আক্রমণের দৃষ্টি। কিন্তু কথার স্বর তার আশ্চর্য্যরকমের শান্ত আর আরো আশ্চর্য্য ঠোঁটের ভঙ্গিতে সকরুণ একটি বিষাদ।

'দু'মিনিটের জন্যে তুমি একটু বাইরে যাও সুধীর, তোমার মায়ের সঙ্গে আমার দু'একটা কথা আছে।'

বলা বাহুল্য, সুধীর গেলোনা। মঞ্জরী গম্ভীরভাবে বললো, 'না, আমার সঙ্গে আপনার কোনো কথা নেই।'

'কী মুস্কিল! সামান্য কারণে আপনি এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন মঞ্জরীদেবী? আপনি তো বড়ো নার্ভাস? দু'একটা কথা অন্ততঃ বলতে দিন আমায়?'

লোকটার স্পর্দ্ধা দেখে অবাক হয়ে যায় মঞ্জরী। আর থতমত খেয়ে যায় ওর ঠোঁটের গম্ভীর বিষণ্ণ ভঙ্গিটি দেখে। ভুলে যায় লোকটা একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। মনে হয়—দু'একটা কথা শুনলে আর এমন কি ক্ষতি। সত্যি, এমন আর কি অপরাধ করেছে একটা অসতর্ক উক্তি উচ্চারণ ক'রে ফেলা ছাড়া?

'কি বলবেন বলুন?'

চোখের ইঙ্গিতে সুধীরকে বাইরে যাবার আদেশ দিয়ে আবার কৌচে ব'সে পড়ে মঞ্জরী।

জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে চলে যায় সুধীর।

মাইনেটাই যে অস্বাভাবিক স্ফীত সংখ্যার বন্ধনে বেঁধে রেখেছে তাকে এখানে। নইলে এসব জায়গায় কি সুধীরের মতো লোকের পোষায়? মেয়েমানুষের বাচালতা দেখলেই যার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে!

'বলুন কী আপনার বলবার আছে?'

'আমার বক্তব্য কী আপনি বুঝতে পারছেন না মঞ্জরীদেবী? আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি—দারুণ ভালোবেসে ফেলেছি, এই আমার বক্তব্য।'

মঞ্জরীকে ভাগ্যান্বেষণে অনেক দূরে যেতে হবে।

মঞ্জরীকে নিজের সমস্ত দায় বহন করতে হবে।

মঞ্জরীর নিজেকে নিজে রক্ষা করতে হবে।

জনম্
জনম্কে
সাথী

বিচলিত হয়ে উঠে পড়লে মঞ্জরীর চলবে না।

মনে মনে এই রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে মঞ্জরী শান্ত সংযত স্বরে বলে, 'এটা স্টুডিও নয় নিশীথবাবু!'

'সারা পৃথিবীটাই তো স্টুডিও মঞ্জরীদেবী!'

'ওটা খুব নতুন কথা নয়। আশা করি আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে!'

'আপনি বড়ো নিষ্ঠুর মঞ্জরীদেবী'—মুখের চেহারায় বিষাদ বিষণ্ণতার অতি করুণ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে নিশীথ রায় বলে, 'আপনি নিজের প্রতিও নিষ্ঠুরতা করছেন, অপরের প্রতিও—'

'কি করা যাবে বলুন, সকলের ভিতরে সমান দয়া থাকেনা।'

'কিন্তু এ যে আপনার আত্ম-পীড়ন মঞ্জরীদেবী—'

'বিচলিত হবোনা' এ কথা ভাবা সহজ, কাজে করা বড়ো শক্ত। তবু কষ্টে সংযত থেকে মঞ্জরী উত্তর দেয়, 'আমার ব্যাপার আপনি একটু কম ভাবলেই সুখী হবো নিশীথবাবু!'

'না ভেবে যে আমার উপায় নেই মঞ্জরীদেবী! প্রতিনিয়ত শুধু আপনার চিন্তাই যে আমাকে জখম ক'রে ফেলেছে। কেন আপনি অকারণ নিজেকে উপবাসী রেখে বঞ্চিত হচ্ছেন? সমাজ আপনাকে কি দিয়েছে? অকারণ অপমান আর অন্যায় অবিচার! এছাড়া আর কিছু? বলুন মঞ্জরীদেবী, কেউ আপনার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে? আপনার হিস্ট্রি আমি জানি। আপনি তেজী মেয়ে, মিথ্যা অপবাদের লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। কই, আপনার সমাজ কি অনুতপ্ত হয়ে আপনাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে? তবে? সে সমাজের পরোয়া কেন করবেন আপনি? বলুন? জবাব দিন আমায়?'

ক্রুদ্ধা সর্পিনীকে যেন ওষধীলতার ধোঁয়া দেওয়া হচ্ছে, ক্রমশঃই তেজ হারিয়ে ফেলছে সর্পিনী! যে দৃঢ়তায় উচ্চারণ করা সম্ভব হয়েছিলো—'সুধীর, বাবু বাইরে যাবেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—' সে দৃঢ়তা কোথাও যেন আর খুঁজে পাচ্ছেনা মঞ্জরী। মুখের রং ক্রমশঃ সাদাটে হয়ে আসছে যেন, বুকের মধ্যে শুধু দুপ্‌দাপ্‌ শব্দের মিছিল! মাথার মধ্যে রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ ক'রে শুধু বাজছে কয়েকটা শব্দ! শব্দ নয়, এতোটুকু বাক্যাংশ!...

'সমাজ আপনাকে কি দিয়েছে? সমাজ আপনাকে কী দিয়েছে? অকারণ অপমান আর অন্যায় অবিচার, এই তো?...এই তো? আপনার সমাজ কি অনুতপ্ত হয়ে আপনাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলো?...

পাকা খেলোয়াড়রা জানে খেলার কোথায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়, আর কোথায় ঔদাসীন্য দেখাতে হয়, তাই নিশীথ রায় আরো বিষণ্নমুখে আরো উদাস করুণ সুরে বলে, 'আপনি আমাকে দরোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারেন মঞ্জরীদেবী, মাথা হেঁট ক'রে চলে যাবো আমি। কিন্তু মনে জানবেন, নিতান্ত খারাপ লোকেরাও কখনো কখনো সত্যিকার ভালোবেসে ফেলতে পারে। তার সারা জীবনের ইতিহাস দিয়ে বিচার করতে গেলে বড্ডো বেশী অবিচার করা হয়।'

ভয় বরং ভালো তাতে চীৎকার করা যায়, চাকর দরোয়ান ডাকা যায়। বিপন্নতা আরো ভয়ঙ্কর! এখানে মানুষ আরো অসহায়।

অসহায় বিপন্নমুখে তাকিয়ে থাকে মঞ্জরী।

সাপুড়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে এই মন্ত্রাহত বিপন্নমুখের

দিকে তাকায় নিশীথ রায়। আবার বলতে সুরু করে, 'জানি আপনি পবিত্র, আপনি বলিষ্ঠচিত্ত, আমি দুর্ব্বল। কারণ আমি রক্তমাংসের মানুষ। তাই আমার দুর্ব্বলতাকে আমি অপরাধ বলেও ভাবতে পারছিনা মঞ্জরীদেবী। স্বীকার করছি আমি দেবচরিত্র নই, কিন্তু ভালোবাসা যে কী বস্তু সেও যে এর আগে এমন ক'রে অনুভব করিনি।'

মঞ্জরী চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায়, শুকনো মুখে বলে, 'আমি আপনার কি উপকার করতে পারি বলুন?'

'উপকার!' নিশীথ রায় সেই বিষণ্ণ-বিধুর হাসি হেসে বলে, 'না মঞ্জরীদেবী, এর উত্তর আপনার সামনে দেবার সাহস আমার নেই। আমি বিদায় হচ্ছি। আপনাকে অন্যায় খানিকটা বিরক্ত করলাম, যদি পারেন তো মার্জ্জনা করবেন। আপনি অনেক দূর চলে যাচ্ছেন, তবু হয়তো—কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের আবার কখনো দেখা হবে, কিন্তু অতিথিদের সমাদর যে আর কোনোদিন পাবোনা তা জানি। আচ্ছা নমস্কার!'

মঞ্জরী বিমূঢ়ভাবে দুই হাত তুলে নমস্কার ক'রে বলে, 'কিন্তু আমি তো আপনাকে আসতে বারণ করিনি।'

'করেননি, সে আপনার মহত্ত্ব, কিন্তু আমি তো জানি সে অধিকার আমি হারিয়ে গেলাম। তবু বিদায় নেবার সময় ব'লে যাচ্ছি মঞ্জরীদেবী, নিজেকে নিজে একবার প্রশ্ন ক'রে দেখবেন কেন আপনি কৃচ্ছ্রসাধন করবেন? কিসের মূল্যে? আপনার এই কৃচ্ছ্রসাধনা কি কেউ বিশ্বাস করবে? মাথা খুঁড়ে ফেল্লেও বিশ্বাস করবে?'
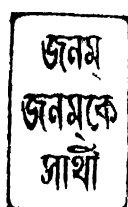
জনম জনমকে সাথী

ধীরে ধীরে নেমে যায় নিশীথ রায়।

নেমে গিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে শিস দিয়ে ওঠে।

কৌচের পিঠটা ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জরী। আর ঘরের সমস্ত বায়ুমণ্ডলে যেন নিশীথ রায়ের শেষ কথাটা ধাক্কা দিয়ে ফেরে।...

কেউ কি বিশ্বাস করবে ?

কেউ কি বিশ্বাস করবে ? মাথা খুঁড়ে ফেললেও বিশ্বাস করবে ?...

কিন্তু কেবল মাত্র অপরের বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকতে পারা ছাড়া পবিত্রতার আর কোনো মূল্য নেই ?

সমাজ শাসন ছাড়া আর কোথাও কোনো শাসন নেই ?

* *　　　*　　　* *

'দ্বারকা যাবেন অভিমন্যুদা ?'

হুড়মুড়িয়ে এসে বিনা ভূমিকায় হুড়মুড়িয়েই প্রশ্ন ক'রে উঠলো সুরেশ্বর, 'যাবেন তো চলুন।'

অভিমন্যু তো অবাকের অবাক !

'তুমি হঠাৎ কোথা থেকে হে ? মানসকৈলাস থেকে ফিরলে কবে ? আমার বাড়ী চিনলে কি ক'রে ? আবার একখুনি দ্বারকা যাবে মানে কি ?'

'থামুন থামুন ! একে একে। ...হঠাৎ কোথা থেকে ? আপাতত: অধমের ব্যারাকপুরের বাসভবন থেকে ! ...মানসকৈলাস থেকে ফিরলাম কবে ? প্রায় মাস পাঁচ-ছয়। কালস্রোত জলস্রোতের মতোই অহরহ প্রবহমান অভিমন্যুদা ! ...আপনার বাড়ী চিনলাম কি ক'রে ? ঠিকানার জোরে। যদিও আপনার ভৃত্য মহাপ্রভু আমাকে প্রায় ভাগাচ্ছিলো।'

জনম্ জনমকে সাথী

'ভাগাচ্ছিলো ?'

'হ্যাঁ গো ! বলে কিনা না বাবুর শরীর ভালো নয়, মেলা পাঁচ-জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষেৎ করেন না।'

'হুঁ, খুব সর্দ্দার হয়েছে দেখছি।'

'তারপর ? যাচ্ছেন তো ?'

'যাচ্ছি ? কোথায় যাচ্ছি ?'

'বাঃ, বললাম যে ? দ্বারকা পুণা নাসিক বম্বে—'

'দু'দিন বুঝি এক জায়গায় স্থির থাকতে পারোনা ? ভিতরে কি আছে ? ঘূর্ণ্যমান চক্র ?'

'বোধ হয় ! সত্যি অভিমন্যুদা, ছ'মাস কোথাও না বেরোলেই যেন মনে হয় বাতে ধ'রে যাচ্ছে।'

'সমুদ্র পাড়ির ব্যাপার বুঝি মিটিয়ে ফেলেছো ? অবশ্য সমুদ্র-পাড়ি, অথবা আকাশ পাড়ি—'

'নাঃ, সে আর বেশীদূর এগোলো কই ? মাত্র জাপান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম একবার। মাতৃভূমিতেই এক-এক জায়গায় দু'চারবার হচ্ছে।'

'পাগল নাম্বার ওয়ান।'

'তা যা বলেন। তারপর—মাসীমার খবর কি ?'

'ভালোই আছেন।'

'কোথায় ? দোতলায় বুঝি ? চলুন না একবার—দ্বারকার নাম শুনিয়ে আসি।'

'রক্ষে দাও সুরেশ্বর, মাকে আর উৎসাহিত কোরোনা।'

'না করলে আপনাকে টেনে বার করা যাবে ?'

'আমার কথা পরে বিবেচ্য।'

'বিবেচনার মধ্যে আমি নেই, একেবারে পাকা কথা চাই। সত্যি অভিমন্যুদা, গতবার থেকে ঠিক ক'রে রেখেছি, পরবর্ত্তী অভিযানে আপনাকে পাকড়াবোই।'

অভিমন্যু সকৌতুকে বলে, 'কেন বলো তো?'

'ওই তো কে বলে? কি যেন কথা আছে না, যার সঙ্গে যার মজে মন। তাই আর কি। তাহ'লে কথা পাকা তো?'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'কবে যাবে কি বৃত্তান্ত কিছুই জানলাম না, পাকা কথা আদায় করতে চাও?'

'আহা, সে সব ঠিকই জানতে পাবেন। যাবার আগের দিন পর্য্যন্ত রোজ একবার ক'রে এসে হানা দেবো। কই, মাসীমার সঙ্গে একবার দেখা করি চলুন?'

'চলো। কিন্তু এসব যাওয়ার কথা কিছু তুলো না সুরেশ্বর, দোহাই তোমার! যদি সত্যিই আবার কোথাও বেরোই, একাই বেরোবো।

'আর মাসীমা? তিনি কোথায় থাকবেন?'

'তাঁর থাকার অভাব কিছু নেই হে! এই অধম জীবটিই তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা অকৃতী সন্তান। আরো দুই বিজ্ঞ বিচক্ষণ পুত্র আছেন তাঁর, তাঁদের সুরম্য অট্টালিকা, সুদৃশ্য মোটর, ইত্যাদি ইত্যাদি। কন্যা আছেন সর্ব্বসাকল্যে চারটি—'

'তাই নাকি?' সুরেশ্বর সকৌতুকে বলে, 'এসব তো কই কোনোদিন বলেননি? আমি জানি আপনিই সবেধন নীলমণি।'

সহসা চুপ ক'রে যায় অভিমন্যু।

সে তো জানে পূর্ণিমা দেবী কেন পরিচয় পরিচিতির দিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর ওর চুপ ক'রে যাওয়ার প্রতি কটাক্ষপাত

ক'রে বলে, 'আপনি বড়ো বেশী রিজার্ভ অভিমন্যুদা! নিজের সম্পর্কে আপনি একটি শব্দ উচ্চারণ করতে রাজী নন।'

অভিমন্যু ফ্যাকাসে-হাসি হেসে বলে, 'বুদ্ধিমানদের লক্ষণই তাই।'

'ওই ফাঁকে নিজের বিজ্ঞাপন দিয়ে নিলেন?'

ব'লে হো হো ক'রে হেসে ওঠে সুরেশ্বর।

আশ্চর্য্য এই ছেলেটা!

আর আশ্চর্য্য তার ক্ষমতা!

অভিমন্যুর সমস্ত ওজর আপত্তি ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে সত্যিই একদিন তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো দ্বারকার পথে।

পূর্ণিমা দেবী অভিমানে দ্বিরুক্তি করেননি, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন মেজছেলের কাছে। কিন্তু অভিমন্যুর যেন এতেও কোনো আক্ষেপ নেই।

সুরেশ্বরের ওপর হাড়ে চটে গেলেও এই প্রথম যেন স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করলেন পূর্ণিমাদেবী, ছেলের এবং তাঁর মাঝখানের বধূরূপী ব্যবধান-প্রাচীরটি দূরে স'রে গিয়ে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান যেন আরো বেড়েই গেছে। লক্ষ যোজনব্যাপী এ ব্যবধান কোনোদিনই আর দূর হবেনা।

এই প্রথম সন্দেহ ক'রে শিউরে উঠলেন তিনি, অভিমন্যু হয়তো বা তার নিঃসঙ্গ হৃদয়ের হাহাকার নিয়ে এর জন্য মাকেই অনেকাংশে দায়ী করছে।

নিশ্চয়ই করছে?

পূর্ণিমা যদি পুত্রবধূকে অমন ক্ষমাহীন কঠোর

বিচারকের দৃষ্টিতে না দেখতেন, হয়তো পুত্রবধূও এমনভাবে ভেসে যেতোনা। অভিমন্যুও এমন নোঙরছেঁড়া নৌকোর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াতোনা। আর পূর্ণিমাকেও বিড়ালছানা নাড়ানাড়ির মতো নিত্যি এখানে একবার ওখানে একবার আসন গাড়তে হতোনা।

সেকালে যে নিয়ম ছিলো—শেষ বয়সে তীর্থবাস, ভালো নিয়ম ছিলো। তাতে শেষ বয়সে নিজেকে এমন অবান্তর মনে হতো না।

* * * * * *

'ঘূর্ণ্যমান চক্র!'

কথাটা ঠিকই বলেছে অভিমন্যু।

আপন প্রাণচাঞ্চল্যে অস্থির সুরেশ্বর অভিমন্যুকে এতো ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে চায় যে হাঁপিয়ে ওঠে অভিমন্যু। একবেলা চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকতে পারেনা।

মন নিয়ে বিলাস [illegible] ওর অসহ্য।

'বেরোতে মন লাগছেনা—ও আবার একটা পুরুষোচিত কথা হলো নাকি অভিমন্যুদা? মনকে লাগান? মন আপনার ইচ্ছাধীন, না আপনি মনের ইচ্ছাধীন?'

'তোমার মতো এমন একটি পালকের বল-এর মতো হাল্‌কা মনের অধিকারী হ'লে হয়তো ব্যাপারটা তাই হতো।'

'ইচ্ছে করলেই পালকের বল করা যায় অভিমন্যুদা, না করলেই বাইশ মণ বোঝা। মানুষ চিরদিন বাঁচবার জন্যে পৃথিবীতে আসেনা। যার দিন ফুরোবে, সে চলে যাবে, সেই মৃত্যুটাকে অহরহ আর-একজনের মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয়?'

মৃত্যু ! কার সে মৃত্যু ? মঞ্জরীর ?

কথাটা সুরেশ্বরই আর-একবার কানে যেন উচ্চারণ করেছিলো না ?

কিন্তু অভিমন্যুর চম্‌কাবার কি আছে ?

তার জীবন থেকে তো মঞ্জরীর মৃত্যুই হয়েছে।

তবু কথাটা এতো স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হ'তে শুনলে চম্‌কানি আসে

তবু মনে করলেই ভিতরে কী অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হতে থাকে

ভিতরে ? মাথার ভিতরে ? না মনের ?

'মন' বস্তুটা মস্তিষ্কেরই কোন্‌খানে অবস্থান করে না ?

মঞ্জরীর ছবিতে সহরের দেয়ালগুলো ভর্তি। তাকাবোনা ভাবলেও না তাকিয়ে উপায় নেই। কিন্তু বিজ্ঞাপনের কেউ তাকে মঞ্জরী ব'লে মনে হয়না ?

সত্যকার মঞ্জরী, রক্তমাংসের দেহধারী সেই মানুষটা কেমন দেখতে আছে এখনও ? তাকেও দেখলে মঞ্জরী ব'লে চেনা যাবেনা ?

'কী অভিমন্যুদা, রেগে গেলেন নাকি ? আপনি কি সেন্টিমেণ্টাল, আশ্চর্য্য ! চলুন চলুন, মন্দিরদর্শন ক'রে আসা যাক্‌। ভারতের লোকের পুণ্যি না ক'রে উপায় নেই, দেখেছেন ? যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, যেখানে স্থাপত্যশিল্প, যেখানে ইতিহাসের প্রাচীন নিদর্শন, সেখানেই সর্ব্বস্ব জুড়ে এক এক বিগ্রহ স্থাপনা করা আছে।'

'তাছাড়া আর কি হবে ? দেবতাকেন্দ্রিক দেশ।'

'আমার কিন্তু কি মনে হয় জানেন অভিমন্যুদা ? ভক্তি-ফক্তি কিছু নয়, এও একরকম কূটনীতি। দেবতার নাম ক'রে ধনসম্পদ সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা।

জনসাধারণ সহজে লুঠেপুটে নেবেনা, উত্তরাধিকারীরা উড়িয়ে দিতে পারবেনা, এই সব আর কি।'

'সব জিনিসেরই একশো রকম ব্যাখ্যা করা যায় সুরেশ্বর! মানুষের ব্রেণ যে সব সময় কাজ করছে, ওটা তার নিদর্শন।'

সুরেশ্বর চকিত হয়ে বলে, 'কোন্‌টা?'

'এই ব্যাখ্যাগুলো।'

'ও! কিন্তু যাই বলুন অভিমন্যুদা, আপনাকে দেখে যেন মনে হয় আপনি ব্রেণকে এবং মনকে একদম সীল্ ক'রে রেখে দিয়েছেন, কোনো রকমে নাড়াচাড়া করতে রাজী নয়।'

স্বভাবগত পদ্ধতিতে হেসে ওঠে সুরেশ্বর।

বর্ণ আর ঔজ্জ্বল্যের চোখ ধাঁধানো সমাবেশ।

বিছানার উপর শাড়ীর পাহাড়, কৌচের উপর ব্লাউজের বৃন্দাবন, এখানে-সেখানে আরো কত কি। ঘরের মেঝেয় তিন-চারটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুটকেস হাঁ ক'রে প'ড়ে আছে। আলমারি থেকে বার ক'রে ঢেলে রাখা এই জিনিসগুলো ওই সুটকেস ক'টার মধ্যে গুছিয়ে নিতে হবে।

নবনিযুক্ত দাসী প্রমদা সাহায্য করবার আশায় এবং কর্ত্রীর নির্দ্দেশের আশায় অনেকক্ষণ এ-ঘরে অপেক্ষা করেছিলো, একটু আগে মঞ্জরী তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'এখন পালা, পরে ডাকবো।'

ঢাকাই বেনারসী সিল্ক, জর্জ্জেট ক্রেপ্ শিফন্, জরি রেশমের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য। শাড়ীগুলো একত্রে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে মঞ্জরী। পাগলের

জনম্ জনমকে সাথী

মতো এ কী করেছে সে ? এতো শাড়ী, এতো ব্লাউজ, প্রয়োজনীয় প্রসাধনের আর অকারণ বিলাসের এতো উপকরণ কোন্ ফাঁকে জমে উঠেছে ?

জোয়ারের জলের প্রচণ্ড টান যেমন আকর্ষিত করে তীরবর্ত্তী খড়কুটো পাতা-লতা, পোড়া বাঁশ, ভাঙা-মালসার স্তূপীকৃত জঞ্জাল, তাকিয়ে দেখেনা কি সংগ্রহ করছি আর না করছি, তেমনি করেই কি দোকানে দোকানে স্তূপীকৃত এই জঞ্জালগুলো এসে জমা হয়েছে মঞ্জরীর ঘরে ?

অপ্রত্যাশিত অগাধ উপার্জ্জনের নতুন জোয়ারে ভাসতে ভাসতে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো মঞ্জরী ?

মঞ্জরী এতো লোভী ?

তুচ্ছ বস্তুর প্রতি এমন দুর্দ্দান্ত লোভ কোথায় লুকিয়েছিলো মঞ্জরীর মধ্যে ? এই লোভই কি তাহ'লে মঞ্জরীকে কেন্দ্রচ্যুত করেছে ?

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা নিজেকে নিজে এই প্রশ্ন।

'কোন্ সুটকেসে কোন্‌গুলো রাখবো দিদিমণি, ব'লে দিন—'

প্রমদার এই বারংবার একঘেয়ে প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে তাকে আপাততঃ দূর ক'রে দিয়ে ডাঁই ক'রে ঢালা শাড়ীগুলো একপাশে ঠেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো মঞ্জরী।

আর চোখবোজা চোখের সামনে ভাসছিলো অনেকদিন আগের একটা ছবি।...অভিমন্যু আর মঞ্জরী কয়েকদিনের জন্যে রাঁচী বেড়াতে গিয়েছিলো। মাত্র কয়েকদিনের জন্যে ব'লে অভিমন্যু বলেছিলো, দু'জনের একটা সুটকেসই যথেষ্ট। মঞ্জরী একটা সুটকেসের মধ্যে

দু'জনের জামা-কাপড় ঠেশে ঠেশে ভরতে ঘেমে গিয়ে হেসে ফেলে বলেছিলো, 'অসাধ্য সাধন করালে তুমি আমাকে দিয়ে। উঃ! একেই বলে থলির মধ্যে হাতী পোরা। অথচ আমার শাড়ীটাড়ী তো কিছুই নিতে পারলাম না। এরপর যেখানে যাবো—মনে রেখো, কেবলমাত্র আমার একলার জন্যেই দশটা স্যুটকেস নেবো।'

অভিমন্যু হেসে বলেছিলো, 'তার মধ্যে ভরবে কি? ঘুঁটেকয়লা?'

'তার মানে?'

'তা—গরীব লেকচারারের স্ত্রী, দশটা স্যুটকেস ভরানোর উপযুক্ত ওর থেকে দামী মাল আর পাবে কোথায়?'

'পাবো কোথায়? ইস্!' মঞ্জরী ভ্রূভঙ্গী ক'রে বলেছিলো— 'তোমরাই ভিখিরী ভোলানাথের জাত, আমরা চির অন্নপূর্ণা, চিরলক্ষ্মী। বুঝলে মশাই?'

'বুঝলাম।' ব'লে অভিমন্যু হাত দিয়ে মঞ্জরীর কপালের ঘাম মুছে দিয়েছিলো।

সেই ঘামের সঙ্গে সঙ্গে কি অভিমন্যু মঞ্জরীর কপালের সৌভাগ্যের লেখাটাও মুছে দিয়েছিলো?

অভিমন্যুর সঙ্গে আর কোথাও যাওয়া হয়নি মঞ্জরীর দশটা স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে।

জনম্ জনম্কে

চোখের জল এতো অবাধ্য কেন?

'মা, একটা ছেলে আর দুটো মেয়ে এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

চাকরটার ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো মঞ্জরী।

একটা ছেলে আর দুটো মেয়ে! কে তারা?

উঠে ব'সে মঞ্জরী বলে, 'কত বড়ো ছেলে মেয়ে?'

'এই—ইস্কুলের মিস্কুলের ছেলে মেয়ে হবে।'

মঞ্জরী অবাক হয়ে বলে, 'কই, ডাক্ তো দেখি।'

সাংবাদিকের "সাক্ষাৎকার" সূত্রে কেউ কেউ আসছে মাঝে মাঝে বটে, কিন্তু এরকম 'ছেলে মেয়ে' গোছের তো নয় তারা!

উঠে চেয়ারে এসে বসে।

আর পরক্ষণেই দু'জনকে বাইরে বসিয়ে রেখে একজনকে মাত্র নিয়ে এসে ঘরে ঢোকে চাকরটা। যাকে নিয়ে এসেছে, সে দরজার কাছে এসেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে, মঞ্জরী তার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত-বিস্ময়ে শুধু বলতে পারে, 'চঞ্চলা?'

ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে থেমে যায়।

সে অধিকার মঞ্জরীর আর আছে?

'আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি ছোটমাসী!' চঞ্চলাই এবার মঞ্জরীর বাধা ভেঙে দেয়, কাছে এসে জড়িয়ে ধরে।

'তুই! তুই! কি ক'রে তুই আমার বাড়ী খুঁজে বার করলি রে চঞ্চল? দুষ্টু মেয়ে সোনা মেয়ে!'

চঞ্চলার এবার চমক ভাঙলো। অবহিত হয়ে বললো, 'আমি বার করিনি, আমাদের স্কুলের একটা মেয়ের দাদা—' ঢোক গিলে চঞ্চলা বলে, 'মেয়েটা বললো—ওর দাদা তোমার কাছে আসবে অটোগ্রাফ নিতে, তাই আমি—'

'কেন এলি? দিদি জানতে পারলে নিশ্চয় তোর উপর খুব রাগ করবেন!' বিষণ্ণ স্বরে বলে মঞ্জরী।

চঞ্চলা কুণ্ঠিত হয়ে বলে, 'রাগ আবার কি করবেন। মার আর ওসব কিছু নেই ছোটমাসী, কি রকম যেন হয়ে গেছেন।'

'কি রকম? কি রকম হয়ে গেছেন?'

মঞ্জরীর কণ্ঠে আর্ত্তনাদের সুর।

'কি রকম যেন। আগের মতো আর নেই। বাড়ীতে থাকতে আমার আর ভালো লাগেনা ছোটমাসী।'

মঞ্জরী পুরনো অভ্যাসে পরিহাসের সুরে বলতে যাচ্ছিলো, 'বাড়ীতে ভালো লাগছেনা? তাহ'লে শ্বশুরবাড়ী যা?' কিন্তু কি ভেবে বললো না। শুধু বললো, 'কিন্তু তারা কোথায় তাহ'লে? তোর বন্ধু আর তার দাদা?'

'নীচের ঘরে।'

'ও মা সে কি, ডাক তাদের?'

'ডাকছি। আমার কথাটা আগে ব'লে নিই—'

'কি কথা রে? বল্। চুপ ক'রে আছিস্ কেন?'

সহসা মুখ তুলে চঞ্চলা ব'লে ওঠে, 'ছোটমাসী, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দেবে?'

'কী সর্ব্বনাশ!' শিউরে উঠে মঞ্জরী বলে, 'অমন কথা মুখে আনিস্নে। আমার কাছে আবার মানুষে থাকে!'

'কেন থাকবেনা। কী দোষ করেছো তুমি? ওদের কথা আমার বিশ্বাস হয়না।'

'কাদের কথা?'

'এই—ইয়ে—সব্বাইয়ের কথা। সব্বাই বলে তুমি না কি অন্যরকম হয়ে গেছো ছোটমাসী। কই, আমি তো তা দেখছিনা। ঠিক সেই রকমই তো আছো।'

কথাটা ব'লে এতোক্ষণে ঘরের সম্পূর্ণ চেহারাটা তাকিয়ে দেখে চঞ্চলা।

এতো জিনিসপত্র, এই ঘর-বাড়ী সব ছোটমাসীর।

সব তার নিজের রোজগারের। বিশ্বাস হয়না যেন। কিন্তু মঞ্জরী আর অন্য রকম কোথায়?

মঞ্জরী গম্ভীরভাবে বলে, 'কে বললে সেই রকম আছি? বদ্‌লে গেছি, একেবারে বদ্‌লে গেছি আমি।'

'মোটেই না!' চঞ্চলা জোর দিয়ে বলে, 'ঠিক তো সেই রকমই রয়েছো। আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাওনা ছোটমাসী।'

হায় অবোধ মেয়ে!

বুকের ভিতরটা টন্‌টনিয়ে ওঠে মঞ্জরীর, তবু হেসে বলে, 'আমি তো সিনেমা ক'রে বেড়াই, আমার কাছে থেকে কি করবি?'

'আমিও সিনেমা করবো।'

'সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে আনিস্‌নে চঞ্চল, স্বপ্নেও মনে আনিস্‌নে। দুর্গা দুর্গা!'

'বাঃ। নিজে তো বেশ—তোমার কতো নাম, কতো সুখ্যাতি, কতো টাকা!'

মঞ্জরী হাসির আবরণ মুখে পরিয়ে ক্লিষ্টস্বরে বলে, 'কতো দুঃখ কতো জ্বালা—'

'দুঃখ! দুঃখ আবার কি? শুধু আপনার লোকেরা তোমার নিন্দে করে, এইতো?'

জনম্ জনমকে সাথী

'তা সেটাই কি কম দুঃখ রে?'

'ছাই। আপনার লোকেরা তো সবতাতেই নিন্দে করে। ও বলে—' বলেই থেমে যায় চঞ্চলা।

'কে কি বলে?'

মঞ্জরীর স্বর বিস্ময়াভিভূত।

'মানে, ওই যে ছেলেটা আমার সঙ্গে এসেছে। আমার বন্ধুর দাদা তো? ও বলে যে, "পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই যাতে আত্মীয়রা নিন্দে না করে! দেশের সেবা করলেও করবে, পরোপকার করলেও করবে, দাতা হ'লেও করবে, সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেলেও করবে। ও নিন্দেয় কান দিলে চলেনা।" ও বলে যে, ও নাকি কারুর নিন্দেয় কান না দিয়ে—সিনেমা এ্যাক্‌ট্রেসকে বিয়ে করবে!'

ওর বর্ণনায় চমৎকৃত মঞ্জরী বলে, 'ছেলেটা বেশ মহৎ, না রে?'

চঞ্চলা মহোৎসাহে উত্তর দেয়, 'খু-ব! অন্যরা যাকে ঘৃণা করে, ও তাকেই ভক্তি করে—'

চঞ্চলার এই উৎসাহের মধ্যে থেকে তার সিনেমা করবার উৎসাহের কিছু সূত্র আবিষ্কার ক'রে ফেলে ঈষৎ বিমনা হয়ে পড়ে মঞ্জরী। সন্দেহ নেই—একটি ইয়ার ছোকরার পাল্লায় পড়েছে মেয়েটা! কিন্তু মঞ্জরী কি করবে? নিবৃত্ত করবার কোনো উপায় তার হাতে আছে? তবু বলে, 'সত্যি বুঝি? অদ্ভুত ছেলে তো! তা ডাক দিকি তাকে, দেখি।'

চঞ্চলা উঠে দাঁড়ায়।

বলে, 'ডাকছি।'

'ডাকছিস্? রোস্, দাঁড়া, একটা কথা বলছিলাম—'

'কি কথা?' থম্‌কে দাঁড়ালো চঞ্চলা!

কি কথা। সত্যই তো কি কথা। যে কথা পূর্ণিমার সমুদ্রের মতো উদ্বেল হয়ে উঠছে বুকের মধ্যে, সে কথা বলবার ক্ষমতা কই? দেহের সমস্ত শক্তি মুখের দরজায় জড়ো ক'রে এনেও নিতান্ত সহজ ভঙ্গিতে বলা যায়না, 'হাঁরে, তোর ছোট মেসোর খবর-টবর কি? আসে-

টাসে তোদের বাড়ীতে? তোরা যাস্ তার বাড়ী?'

কিছুতেই বলা গেলোনা। কিন্তু আশ্চর্য্য! চঞ্চলাও তো কোনো ছলেই সেই লোকটার প্রসঙ্গে এলোনা!

চঞ্চলা একটু অপেক্ষা ক'রে বলে, 'কই, বললে না?'

'হ্যাঁ—এই যে! বলছিলাম কি, আমি তো ক'দিন পরে বম্বে চলে যাচ্ছি চঞ্চল, তুই আমার কাছে থাকবিই বা কি ক'রে?'

যাহোক্ একটা কথা ব'লে পার পাওয়া।

চঞ্চলা কিন্তু উৎসাহের দীপ্তি মুখে মাখিয়ে ব'লে ওঠে, 'সে তো আমি জানিই—! 'চিত্রজগৎ'-পত্রিকায় তো তোমরা কখন কোথায় যাচ্ছো—ছেড়ে, কি দিয়ে ভাত খাও তা পর্য্যন্ত থাকে। সেই জন্যেই তো বলছি, তোমার সঙ্গে আমিও চলে যাবো। কেউ চট্ ক'রে ধ'রে আনতে পারবেনা।'

মঞ্জরীর হাহাকার-করা শূন্য হৃদয় সহসা দুরন্ত এক লোভে তৃষিত হয়ে ওঠে। তা যদি সম্ভব হতো! এতোটুকু একটু স্নেহের ধনকেও যদি কাছে রাখতে পারা যেতো!

যায়! রাখা যায়!

বিবেককে চুপ করিয়ে রাখতে পারলেই রাখা যায়! চলুক্ না মঞ্জরী ওকে নিয়ে পালিয়ে! সুনীতির ক্ষতি হবে?

হোক্ না!

সুনীতির একটু অবহেলায় মঞ্জরীর জীবনের কতো-বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছে, সে হিসেব কি কোনোদিন করেছে সুনীতি? 'মঞ্জরী' ব'লে একটা অবোধ মেয়ে যে এক প্রবল ঝড়ের ধাকায় ছিট্‌কে তার কাছে আশ্রয় নিতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলো, ফিরে এসে সে যে

ছুঃখে অভিমানে নিরুপায় হয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো, সে কথা ভেবে কি সুনীতি কোনোদিন অনুতাপ করেছিলো ?

না, করেনি। করলে, অনায়াসেই একটা চিঠি লিখে খোঁজ নিতে পারতো সুনীতি, কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে টেলিফোন রিসিভারটা একবার তুলে নিতো।

মঞ্জরী লুকিয়ে পালিয়ে নেই যে তার খোঁজ মিলবেনা।

সুনীতি মঞ্জরীর খোঁজ নেবার চেষ্টা করেনি, শুধু আর পাঁচজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'ছি ছি' করেছে। তাছাড়া আর কি ?

তবে মঞ্জরীই বা তাকে দয়া করবে কেন ? কেন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নেবেনা ? মনকে কঠিন ক'রে নিয়ে মঞ্জরী বলে, 'আচ্ছা, আমাকে ছু'একটা দিন ভাবতে দে। তুইও ঠিক ক'রে ভেবে নে। যদি সত্যিই আমার কাছে চলে আসতে চাস্, বুধবার সন্ধ্যায়—হ্যাঁ, বুধবার সন্ধ্যায় ফের এখানে আসবি।'

"ঠিক আসবো দেখো। একেবারে জিনিস-টিনিস নিয়ে—'

'জিনিস-টিনিস তোকে কিচ্ছু আনতে হবেনা রে—দেখছিস্ না এই কতো জিনিস ? এ সব তোকে দিয়ে দেবো, সব।'

'আহা।'

অবশ্যই কথাটা পরিহাস।

ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে চঞ্চলা।

'কিন্তু ভাবছি—সত্যিই আস্‌তে পারবি তো ? দিদি জানতে পারলে—'

'কেউই জানতে পারবেনা। ওই যে ওই ছেলেটা, ও বলেছে আমাকে সিনেমা এ্যাকট্রেস হবার জন্য সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।'

উত্তরোত্তর চমৎকৃত মঞ্জরী বিবেককে সান্ত্বনা দেয়, মঞ্জরী প্রতি-হিংসা সাধন না করলেও কি সুনীতি এই বোকা মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারবে? সুনীতি বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধন আর নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য নিয়ে কেবল মাত্র নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে থেকে আরো 'কি রকম যেন' হয়ে যেতে থাকবে, আর কর্ত্তাহীন বাড়ীতে অসহায় দুটো তরুণী মেয়ে জীবনকে এলোমেলো ক'রে ফেলবে। বললো, 'হ্যাঁরে, তোর মেজদির খবর কি?'

'মেজদি? মেজদি তো শুধু মার কাছে ব'সে থাকে গম্ভীর হয়ে, আর কাঁদে। আমারই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে!'

'হুঁ। আচ্ছা! যা ওদের ডেকে আন্‌গে!'

রোগা সিড়িঙ্গে হাফ্‌সার্ট আর পায়জামা-পরা একটা ছেলে, পিছন পিছন তদনুরূপই ফ্রক-পরা একটা মেয়ে। অটোগ্রাফের খাতা হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

ছেলেটা যেন গড়িয়ে-পড়া বিনয়ের অবতার, মেয়েটা কুণ্ঠিত ভীত লজ্জাবনত।

দেখে হাসিও পেলো, অবাকও লাগলো মঞ্জরীর।

এই দীন হীন ভঙ্গি আর নিতান্ত নাবালক বয়সের মধ্যে এতো দুঃসাহস এলো কোথা থেকে? এতোটুকু ছেলেটা দু'দুটো মেয়েকে ঘাড়ে ক'রে লুকিয়ে এসে হানা দিয়েছে সহরের একজন নামকরা অভিনেত্রীর বাড়ীতে!

জনম্
জনমকে
সাথী

আশ্চর্য্য!

ছেলেটাকে দেখলে অবশ্য হাসিই পাচ্ছে, কিন্তু চঞ্চলার মতো হাবাগোবা মেয়েদের ক্ষতি করতে, এরাই করে।

শুধু [illegible]র নয়, বাণীও চাই।

যথারীতি বাণী বিতরণ ক'রে মঞ্জরী ওদের পরিতুষ্ট ক'রে খাওয়ায়। 'হিম আধার' খুলে খাওয়ায় ঠাণ্ডা ফল আর ঠাণ্ডা মালাই।

মাসীগৌরবে গৌরবান্বিত চঞ্চলা আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুলক-কম্পিত চিত্তে সবান্ধবে বিদায় নেয়।

মঞ্জরী মিনিটকয়েক চিন্তা-হারানো স্তব্ধ মন নিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থেকে সহসা উঠে প'ড়ে বিছানায় রাশ-করা শাড়ীগুলো নিয়ে মহোৎসাহে গোছাতে বসে একটা সুটকেস টেনে নিয়ে। চঞ্চলাকে নিয়ে পালিয়েই যাবে সে। কেন যাবে না? তার মুখের দিকে কে কবে চেয়েছে যে সে অপরের মুখের দিকে তাকাবে? বেশ করবে মঞ্জরী, সমাজ আর সংসারের অনিষ্ট ক'রে। সমাজ যদি তার জন্যে মঞ্জুর ক'রে রেখে থাকে শুধু ঘৃণার বিষ, মঞ্জরীই-বা অমৃত পাবে কোথায়? সেই বিষের পুঁজি নিয়ে সমাজকে ছোবলই হানবে।

কঠিন কঠিন সংকল্পমন্ত্র কখন কোন্ অবসরে নিস্তেজ হয়ে যায়। কোন্ কোন্ শাড়ীগুলো চঞ্চলাকে মানাবে, কোন্ কোন্ অলঙ্কারগুলো চঞ্চলাকে দিয়ে দেবে, কতোটুকু ছোট ক'রে নিলে মঞ্জরীর ব্লাউজ-গুলো চঞ্চলার গায়ে ফিট্ করবে, এই সবই ভাবতে সুরু করে মঞ্জরী।

অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক দ্বিধা! অনেক বিচার বিবেচনা বিতর্ক। প্রচণ্ড লড়াইয়ে মন ক্ষত বিক্ষত। নিজেকে নিয়ে ধ্বংসের পথে এগোতেও বোধকরি এতো লড়াই করতে হয়নি মঞ্জরীকে। পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, সত্য অসত্য! এসব শব্দ নিয়ে এতো বেশী বিশ্লেষণ

জনম্ জনমকে সাথী

করবার অবকাশও ছিলোনা তখন। সে ছিলো আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে আগুনে ঝাঁপ।

এ অন্য।

এ যে ঠাণ্ডা মাথায় নরহত্যা।

তবু একদিন লড়াইয়ের জয়-পরাজয় ঘোষিত হলো।

বম্বেগামী একখানি ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় চঞ্চলাকে দেখা গেলো মঞ্জরীর পাশে।

চঞ্চলার মুখ শুকনো, গালে শুকিয়ে-যাওয়া চোখের জলের দাগ, আর চোখে উৎসাহের দীপ্তি।

মঞ্জরীর ?

মঞ্জরীর কিছু বোঝা যাচ্ছেনা।

মঞ্জরী যে প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী !

যারা তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে তারা যে স্টেশনে স্টেশনে খোঁজ নিতে আসছে মঞ্জরীর।

না, চঞ্চলার সম্পর্কে কারো কোনো বিস্ময় নেই।

অনেকেই অমন ছোটখাটো একটি আত্মীয়া-টাত্মীয়া সঙ্গে আনে।

ট্রেন ছোটে, পিছনে পিছনে একটা ভয় ছুটে আসে তাড়া ক'রে। মেয়ে-চুরির শাস্তি কি ?

কিন্তু ভয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটু ভরসা উঁকি মারে কেন ?

জনম্ জনমকে সাথী

অভিযোগ করবে কে ? সুনীতি তো ? তাকে তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাবে ?...কে জানে যাবে কি না, কে জানে কি নিয়ম !

* *　　　*　　　* *

বোম্বাই সহর।

তারই একান্তে তার চিত্রজগৎ।

একেই বলে চিত্রজগৎ?

কিন্তু এতোদিন তবে কোথায় ছিলো মঞ্জরী? সেও তো চিত্র-জগৎই। কিছু না, কিছু না, সে এর তুলনায় নাবালক শিশুমাত্র।

এ কী দুরন্ত দীপ্তি, এ কী চোখ ঝলসানো আগুনে-আলো, এ কী শ্বাসরোধকারি কর্ম্মব্যস্ততা, এ কী দম আট্‌কানো রুচিহীনতা।

এ কোথায় এসে পড়লো মঞ্জরী।

কোথায় নিয়ে এলো বেচারা চঞ্চলাকে!

মনে পড়লো বনলতার নিষেধ, মনে পড়লো নিশীথ রায়ের বিষণ্ণ ব্যঙ্গোক্তি।...

'আজ আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন মঞ্জরীদেবী, কিন্তু বম্বে আপনাকে ফিরিয়ে দেবেনা।'

কী প্রচণ্ড ভবিষ্যৎবাণী!

জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই দীর্ঘ দুটো বছর যে বাঁধকে রক্ষা ক'রে এসেছে মঞ্জরী, দু'দিনে সে বাঁধ ভেঙে যেতে বসেছে যে।

এ কী দুরন্ত আকর্ষণ!

স্নান করতে এসে, হাঙরের মুখে পা পড়েছে!

কার আর তবে সাধ্য আছে রক্ষা করবে তাকে?

যে বস্তু নাকি সোনার কৌটোয় রক্ষিত সাত

জনম্
জনমকে
সাথী

রাজার ধন এক মাণিক, সেই বস্তু নিয়ে এখানে যেন ছিনিমিনি খেলা।

মদের গ্লাশে চুমুক দিতে না চাওয়াটা এখানে 'পিসিমার গোবর জল'-এর মতোই হাস্যকর শুচিবাই। দৈহিক পবিত্রতার মান এখানে অদ্ভুত রকমের উদার।

রাত্তিরের আর দিশ-দিশা থাকে না।

প্রত্যেক দিনই বাড়ী ফিরে দেখে চঞ্চলা ঘুমিয়ে পড়েছে।

আশ্চর্য্য! আজ পর্য্যন্ত মেয়ে-চুরির অভিযোগে ওয়ারেণ্ট এলোনা মঞ্জরীর নামে।

সুনীতি 'কেমন' হয়ে গেছে।

একটা মেয়ে হারিয়ে গেলেও তার কিছু যায় আসেনা?

বাড়ীতে রাতের খাওয়া! সে তো প্রায় ভুলতেই বসেছে মঞ্জরী! ক্লান্ত অবসন্ন নেশাচ্ছন্ন দেহটাকে টেনে এনে কোনোরকমে বিছানায় এনে ফেলা!

আশ্চর্য্য, ঘুম আসেনা। শোবার আগে মনে হয়, বালিশে মাথা রাখার আগেই ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু কি যে হয়! মাথার মধ্যে লক্ষ করতালির বাজনা বাজে, সমস্ত স্নায়ুশিরা দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে, রক্তের কণায় কণায় উদ্দাম নর্ত্তন।

ঘুম আসে সেই শেষ রাত্রে।

জনম্ জনমকে সাথী

সে ঘুম ভাঙে অনেক বেলায়। চঞ্চলা তখন স্নান সেরে জলখাবার খেয়ে ম্লানমুখে হয়তো একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে।

প্রথম প্রথম মঞ্জরী চেষ্টা করেছিলো মেয়েটাকে একটু সাহচর্য্য দেবার, কিন্তু সে চেষ্টা হাস্যকর

চেষ্টায় পরিণত হয়েছিলো। সময় কোথা? মোটা টাকা দাদন দিয়ে যে সুন্দরী অভিনেত্রীটিকে কলকাতা থেকে এতোদুর টেনে আনা হয়েছে, তাকে কে সময় দেবে তুচ্ছ একটা বালিকাকে সাহচর্য্য দেবার?

তার সাহচর্য্য কতো মূল্যবান, সে কথা বোঝবারই কি ক্ষমতা আছে মেয়েটার?

মঞ্জরী লাহিড়ীকে এখানের সমাজ পালকের বলের মতো কাড়াকাড়ি লোফালুফি করতে চাইছে।

পরিচালক নন্দপ্রকাশজী নিজের ফ্ল্যাটের পাশেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিরভিভাবক বাঙালী অভিনেত্রীকে। বিদেশে ওঁরাই মা বাপ যে!

মাঝে মাঝে নিজের গাড়ীতেও তুলে নিয়ে আসেন তিনি মঞ্জরীদেবীকে। আনেন মানে, আনতে হয়। যেমন আজ হলো। নেশায় বেহুঁশ বেএক্তার মানুষটাকে একটু নজরে রাখতে হবে বৈ কি।

এখানে নন্দপ্রকাশজীর স্ত্রীপুত্র আছে, তারা এটাকে ভালো চক্ষে দেখেনা, তবু ভদ্রলোক দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। প্রায় ধরে-ধরেই সিঁড়িতে তুলে মঞ্জরীকে তার ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নন্দপ্রকাশ প্রশ্ন করেন, 'যাইতে পারবেন? ওসুবিধা হোবেনা?'

'নো। নো। থ্যাঙ্কস্।'

জড়িতকণ্ঠে ধন্যবাদ জানিয়ে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে সোফায় ব'সে পড়ে মঞ্জরী।

জনম্
জনমকে
সাথী
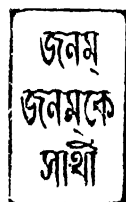
মৃদু নীল আলো জ্বলছে ঘরে, দেয়ালের কাছে সরু খাটের বিছানায় চঞ্চলা ঘুমোচ্ছে, যেন বন্দিনী রাজকন্যা।

ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ হুহু ক'রে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে মঞ্জরী, যেমন ক'রে একদিন বনলতা কেঁদেছিলো।

চম্‌কে জেগে ওঠে চঞ্চলা, খাট থেকে নেমে এসে মঞ্জরীকে 'ছোটমাসী ছোটমাসী' ব'লেই ছিট্‌কে পাঁচ হাত দূরে স'রে যায়। পূর্ব্ব পরিচিতি না থাকলেও সহজাত বোধশক্তিতে বুঝতে দেরী হয়না তার, ছোটমাসীর সর্ব্বাঙ্গে কিসের গন্ধ।

ওকে স'রে যেতে দেখে আরো ডুক্‌রে ওঠে মঞ্জরী, 'চলে যা। চলে যা। আরো অনেক দূরে স'রে চলে যা। আমি মদ খেয়েছি, আমি মাতাল। বুঝলি? বুঝতে পারলি? আমি তোর মাসী, প্রফেসর অভিমন্যু লাহিড়ীর স্ত্রী মঞ্জরী লাহিড়ী, আমি মাতাল হয়ে এসেছি, খারাপ হয়ে এসেছি।'

জড়িত কণ্ঠ আরো জড়িয়ে আসে, সোফার ওপর মুখ ঘষতে থাকে মঞ্জরী।

কাঠের মতো দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিলো চঞ্চলা, মাঝ-রাত্তিরের সদ্য-ঘুমভাঙা চেতনা নিয়ে, এ দৃশ্যে সেও প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে নন্দপ্রকাশজীর স্ত্রীর ঘরের দরজায় ধাক্কা মারে। এই ক'দিনে ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার কিছু আলাপ হয়ে গেছে, ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও।

জনম্ জনমকে সাথী

মাঝরাত্রে রীতিমত একটি নাটক জমে ওঠে।

নন্দপ্রকাশজী আসেন, তাঁর স্ত্রী আসেন, ছেলেমেয়েরা দরজার কাছে ভিড় করে, চাকরবাকররা উঁকি দেয়।

পরদিন শুকনো-মুখ রুক্ষচুল মঞ্জরী এসে নন্দপ্রকাশজীকে ধরে, 'আমায় কয়েকটা দিন ছুটি দিন জী।'

ছুটির নামে আঁৎকে উঠেই ভদ্রলোক কি ভেবে চুপ ক'রে যান। এক মিনিট ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে বলেন, 'আচ্ছা। ক'দিন? চার দিন?'

'এক সপ্তাহ হয়না?'

'এক সপ্তাহ, সাত দিন? এতো লাগবে?'

'শরীরটা বড়ো খারাপ হয়েছে জী।'

'আচ্ছা, ওই হোবে। সুটিং প্রোগ্রাম চেঞ্জ কোরতে হোবে।'

চঞ্চলার জীবনে উৎসব এলো।

মঞ্জরী সারাদিন ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সকাল বিকেল সন্ধ্যে। ম্লান বিষণ্ণ ভয়গ্রস্ত প্রাণীটাকে আদরে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। উপহারের প্রাচুর্য্যে ডুবিয়ে রাখতে চায় সব কিছু।

সন্ধ্যায় সমুদ্রতীর।

আলোকোজ্জ্বল মেরিণ ড্রাইভ।

ঝলমলে ঝকঝকে। খ'সে-পড়া এক টুক্‌রো পরীরাজ্য

অভিভূত চঞ্চলা দিশে পায়না কোন্‌দিকে তাকাবে। দূরে ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য। ওদের এসব গা-সওয়া।

জনম্
জনমকে
সাথী

সে-রাত্রের ভয়টা জোর ক'রে ভুলেছে চঞ্চলা,
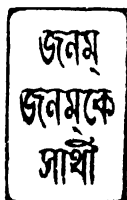
জোর করেই সহজ হতে চেষ্টা করছে, তবু তার সমস্ত অন্তরাত্মা তৃষিত হয়ে পথে পার্কে দোকানে পশারে মানুষের ভিড়ের দিকে তাকায়। এতো লোক, এতো অজস্র লোক, কলকাতার কোনো লোক থাকেনা এখানে? যাকে চঞ্চলা চিনতে পারে, যার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যেতে পারে?

কলকাতায় গিয়ে মার পায়ে প'ড়ে কেঁদেকেটে সব ঠিক ক'রে নেবে। উঃ, কে জানতো ছোটমাসী এমন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। অবিশ্যি এই ক'টা দিন সম্পূর্ণ বদলে গেছে ছোটমাসী, আগের মতো লাগছে, তবু প্রাণের মধ্যে আর স্বস্তি নেই চঞ্চলার। তাই পথে বেরিয়ে ও খালি জনারণ্যের মুখের পানে তাকায়।

কিন্তু কী কঠিন যন্ত্রের মতো মুখওলা লোকগুলো এখানকার! অনবরত সবাই যেন ছুটছে। সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে তাও ব্যস্ততা, তাও তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি!

আসছে যাচ্ছে, দু'মিনিট বসছে, উঠে চলে যাচ্ছে। আজ শুধু অনেকক্ষণ থেকে ওরা নিজেরা চুপচাপ ব'সে থাকতে থাকতে দেখেছে, খানিকটা তফাতে দু'জন লোক ব'সে আছে তাদেরই মতো চুপ ক'রে পিছন ফিরে।

পাঞ্জাবী-পরা ওই পিঠটা কেন অনবরত এমন ক'রে টানছে চঞ্চলাকে? কেন মনে হচ্ছে ওই ভঙ্গিটা যেন বহু পরিচিত?

লোক দুটো উঠে কি এইদিকে আসবে?

ছোটমাসী ওদিকে মোটে তাকাচ্ছে না যে।

'তুই মোটে কথা বলছিস্ না কেন রে চঞ্চল?'

চমকে উত্তর দেয় চঞ্চলা, 'বলছি তো।'

'কোথায়? শুধু তো হাঁ ক'রে আকাশ পানে চেয়ে আছিস্

'ছোটমাসী!'

'কি রে?'

'ওই লোকটাকে দেখেছো?'

'কোন্ লোকটা?' বলেই চকিত দৃষ্টিপাত করে মঞ্জরী, এদিকে ওদিকে।

'ওই যে!'

পলকপাত মাত্র। বিদ্যুত-শিহরণের মতো একটা শিহরণ ওঠে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিসের আশায় চঞ্চলা তাকে ডেকে দেখাতে চায়?

স্বপ্নলোকের কোন্ এক ব্যক্তির সঙ্গে ভঙ্গির সামান্যতম একটু সাদৃশ্য আছে ব'লে? আলো-আঁধারি সমুদ্র-বেলায় পিছু ফিরে ব'সে থাকা একটা লোকের শুধু পিঠের একটু ভঙ্গি।

বাঙালী অবশ্যই।

ধুতি পাঞ্জাবী তো এখানে চোখেই পড়েনা। কিন্তু তাই ব'লে—?

চঞ্চলা পাগল হতে পারে, মঞ্জরী তো পাগল নয়।

'আমি একটু ওদিকে যাবো ছোটমাসী?'

'কেন? না না! ওদিকে গিয়ে কি হবে?'

'কিছু না। শুধু দেখবো লোকটা বাঙালী কি না!'

'হলোই বা বাঙালী, কি লাভ?'

'এমনি! যাই না ছোটমাসী?'

'যদি পুলিসের লোক হয়?'

'কেন?' চঞ্চলা ভয়ে ভয়ে বলে, 'পুলিসের লোক কেন?'
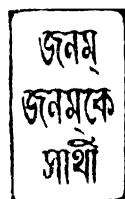
'তোকে ধরতে, আমাকে ধরতে। তুই ঘরভেঙে পালিয়ে এসেছিস্, আমি নাবালিকা বালিকাকে ভুলিয়ে পথে বার করেছি— এ দোষে জেল হয়।'

'বাঃ, আমি বলবো, আমি নিজে ইচ্ছে ক'রে এসেছি।'

'তোর কথার কোনো মূল্যই নেই। খবর পেলেই তোকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাবে, আর আমাকে জেলে নিয়ে যাবে।'

'ও ছোটমাসী, ওরা উঠে যাচ্ছে—'

আর অনুমতির অপেক্ষা না করেই চঞ্চলা হঠাৎ তীরবেগে দৌড়ে যায়, আর সমুদ্রের ধারের উতলা বাতাসকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে তার আনন্দের আর্ত্তনাদ তীক্ষ্ণস্বরে ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে—'ছোট মেসোমশাই!'

'চঞ্চলা!'

'মেসোমশাই!'

'তুমি এখানে? কবে এসেছো? বড়দি এসেছেন?'

অনেকদিন ধ'রে কলকাতার বাইরে আছে অভিমন্যু, চঞ্চলার নিরুদ্দেশের বার্ত্তা তার জানা নেই।

হঠাৎ আনন্দে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো চঞ্চলা, এ প্রশ্নে থতমত খেয়ে ধাতস্থ হয়ে বলে, 'না, মা আসেননি। আপনি কবে এসেছেন?'

অভিমন্যুর পার্শ্ববর্ত্তী লোকটাকে অবশ্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই আলাপ চলে।

জনম্ জনমকে সাথী

'আমি? এখানে অবশ্য দু'দিন মাত্র, কলকাতা ছেড়েছি অনেকদিন। তারপর, বাড়ীর সব ভালো তো?'

'হ্যাঁ।'

'তা, এখানে একলা একলা ঘুরছো যে? এসেছো কার সঙ্গে?'

চঞ্চলা কি যে উত্তর দিলো, বোঝা গেলোনা।

অভিমন্যু এ ভাব-বৈলক্ষণ্য বুঝতে পারেনা।

সুরেশ্বরের উপস্থিতিকেই ওর এই আড়ষ্টতার কারণ ব'লে মনে করে।

'উঠেছো কোথায়?'

'কি জানি। এখানের রাস্তার নাম বুঝতে পারিনা।'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'তা ঠিক। কমলাদের সঙ্গে এসেছো বুঝি? না কি তোমার সেই মোটা পিসিটির সঙ্গে?'

'না, ওদের সঙ্গে নয়।'

'তবে?'

অভিমন্যুর কণ্ঠে বিস্ময়।

'আমি—আমি এসেছি, ছোটমাসীর সঙ্গে।'

'কার সঙ্গে?'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনা ব'লেই এই প্রশ্ন ক'রে বসে অভিমন্যু।

চঞ্চলা সাহস সঞ্চয় ক'রে ঝাঁ ক'রে ব'লে ফ্যালে, 'ছোটমাসীর সঙ্গে। ওই যে ওখানে ব'সে আছে ছোটমাসী—ও কি, কোথায় গেলো?'

আবার পাগলের মতো উল্টোমুখো দৌড়োয় চঞ্চলা।

সুরেশ্বর অবাক হয়ে বলে, 'ব্যাপার কি অভিমন্যুদা?'

অভিমন্যু সামনের অনেকখানি শূন্যের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলে, 'বোধকরি ভাগ্যচক্র।'

জনম্ জনমকে সাথী
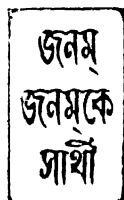
'মেসোমশাই!'

ফিরে এলো চঞ্চলা, শুকনো-গলায় বললো. 'কোথাও দেখতে পাচ্ছিনা, ট্যাক্সিটাকেও না।'

'ট্যাক্সি? কোথায় ছিলো সেটা?'

'ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো।'

মনের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে কণ্ঠস্বরকে শান্ত রেখে অভিমন্যু বলে, 'তোমায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন তিনি?'

এই শান্ত ব্যঙ্গোক্তিতে হঠাৎ একঝলক জল এসে পড়ে চঞ্চলার চোখে, ঘাড় হেঁট ক'রে চুপ ক'রে থাকে বেচারী।

অভিমন্যু ওর অবস্থাটা অনুমান করতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারেনা, মঞ্জরীর কাছে চঞ্চলা কি ক'রে এলো? তাও কলকাতা ছেড়ে এতো দূরে। সুনীতি কি হঠাৎ এতো প্রগতিশীলা হয়ে উঠেছেন? না কি গোড়া থেকেই অভিমন্যুর অজানিতে মঞ্জরীর সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধন বজায় রেখেছিলেন সুনীতি? বিদেশে আসতে—সঙ্গিনী হিসেবে দিদির একটি মেয়েকে চেয়ে এনেছে মঞ্জরী?

তাই সম্ভব।

তাছাড়া আর কি!

মঞ্জরী সম্বন্ধে সব ভাবনা ছেড়ে দিলেও, দুঃস্বপ্নেও এমন অদ্ভুত কথা ভাবতে পারে না অভিমন্যু, দিদির মেয়েকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছে মঞ্জরী।

জনম্ জনম্কে

'কোথায় থাকো তোমরা? মানে, ঠিকানা কি?'

যতোই অদ্ভুত অবস্থায় পড়ুক অভিমন্যু, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে দেহের রক্ত যতোই দাপাদাপি করুক, তবু এই মেয়েটাকে এই রাতের

বেলা একা এখানে ফেলে রেখে চলে যাবার কথা কল্পনা করতে পারেনা। অথচ মঞ্জরী এমন কাজ করলো কি ব'লে? এমন কথাও ভাবছেনা, এ ছাড়া আর কি করতে পারতো মঞ্জরী।

চঞ্চলা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'জানিনা!'

'ঠিকানা জানো না? কতোদিন এসেছো?'

'অনেক দিন, দু'তিন মাস।'

'ঠিকানা জানো না কেন?'

'কিরকম শক্ত শক্ত কথা, ভুলে যাই।'

'বাড়ীতে চিঠি লেখো না?'

উথ্‌লে ওঠে চাপা উৎস, ডুক্‌রে ওঠে চঞ্চলা, 'না।'

সেকেণ্ড-কয়েক চুপ ক'রে থেকে অভিমন্যু গম্ভীরভাবে বলে, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে-টালিয়ে আসোনি তো?'

আর উত্তর নেই।

ফোঁপানি দুর্দ্দমনীয়তাই উত্তর।

'কেন এলে?'

বোকা মেয়েটা ভয়ের চোটে এবার একটা মিছেকথা ব'লে বসে। বলে, ছোটমাসীর জন্যে মন কেমন করছিলো, দেখতে গিয়েছিলাম—তা ছোটমাসী বললো যে, বম্বে যাবি?'

'বললো আর তুমি চলে এলে? বড়দি—মানে তোমার মা রাজী হলেন?'

আর কথা কহানো যায়না চঞ্চলাকে। অনেক প্রশ্নবান নিক্ষেপ করেও না।

সুরেশ্বর এতোক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর তীক্ষ্ণকর্ণ হয়ে এদের কথা শুনছিলো, এবার নীচুস্বরে আবার বলে, 'ব্যাপারটা কি অভিমন্যুদা?'

'সবটা আমারও হৃদয়ঙ্গম হচ্ছেনা, যতোটুকু হচ্ছে, বলতে সময় লাগবে।'

এটা উত্তর-এড়ানো কথা, বুঝতে পারে সুরেশ্বর। কিন্তু না বুঝে থাকাও তো শক্ত। একটা শব্দ যে তার মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে।

স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সুরেশ্বর, চঞ্চলার উৎফুল্ল ডাক—'ছোট মেসোমশাই!' তার পরই শুনেছে 'ছোটমাসী ওখানে—'

কী এই রহস্য। কে এই ছোটমাসী?

পতিপরিত্যক্তা? স্বামীত্যাগিনী? অভিমন্যুর কি একাধিক বিবাহ।

অভিমন্যুর জীবনে যে একটা রহস্য লুকোনো আছে এ সন্দেহ বারবারই মনে এসেছে সুরেশ্বরের, আজ যেন তার হদিস মিলবার সুযোগ এসেছে।

সুরেশ্বরকে নিরুত্তর দেখে অভিমন্যু আবার বলে, 'ব্যাপার তোমায় ধীরেসুস্থে বোঝাবো সুরেশ্বর, এখন এই বালিকাটিকে তো যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'তা এ তো শুনছি, ঠিকানাই জানেনা।'

'সেই তো মুস্কিল। এখান থেকে কতোটা দূর চঞ্চলা?'

চঞ্চলা ম্রিয়মান ভাবে বলে, 'অনেকদূর।'

'গাড়ী ক'রে নিয়ে গেলে রাস্তা চিনিয়ে দিতে পারবে?'

'পারবোনা' এমন আত্মঅবমাননাকর কথাটা বলতে বোধকরি লজ্জা হয় চঞ্চলার, তাই ঘাড় নীচু ক'রে বলে, 'পারবো।'

শুধু মেসোমশাই নয়, সঙ্গে আর একটি তরুণ যুবক। তার ষোলোবছরের কুমারী-হৃদয়ে এই লজ্জার

বেদনা বড়ো কঠিন হয়ে বাজছে। কেন সে বাড়ীর ঠিকানাটা মুখস্থ ক'রে রাখেনি? কেন সে এমন বোকার মতো কেঁদে ফেললো।

'সুরেশ্বর, এ কাজটির ভার তোমাকেই দিচ্ছি ভাই।'

'সে কী? আপনি?'

'আমি হোটেলে ফিরছি। তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওর ডিরেকশান মতো—'

চঞ্চলা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অভিমন্যুর একটা হাত চেপে ধরে। সেই চেপে ধরার মধ্যে রয়েছে একটি নিতান্ত কাতর মিনতি।

অভিমন্যু ঈষৎ বিচলিতভাবে ওর মাথায় একটু মৃদু আদরের চাপড় দিয়ে বলে, 'ভয় কি চঞ্চলা, উনি তোমার দাদার মতো। আর দ্যাখোনা, একখুনি এক মিনিটে এমন ভাব ক'রে ফেলবে—'

'আপনার না যাওয়ার কারণটাই বা কি অভিমন্যুদা?'

অভিমন্যু উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'কারণ কিছুই নেই, এমনিই শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, মাথাটা ধরেছে মনে হচ্ছে। চলোনা তোমাদের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি—ট্যাক্সি নিতে তো হাঁটতে হবে অনেকটা…'

সুরেশ্বর এবার সরাসর চঞ্চলাকেই প্রশ্ন করে, 'যাঁর সঙ্গে এসেছিলে, উনি তোমার কে হন?'

'মাসীমা।'

অস্ফুট উচ্চারণে কথাটা জানায় চঞ্চলা।

'উনি এভাবে চলে গেলেন যে?'

বলাবাহুল্য চঞ্চলা নিরুত্তর।

'তুমি যদি বাড়ী চিনিয়ে দিতে না পারো কি হবে?'

চঞ্চলা আর বোকা ব'নে থাকতে চায়না, সহসা
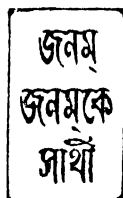
মুখ তুলে বেশ স্পষ্টস্বরে ব'লে বসে, 'ওঁর ঠিকানা জোগাড় করা শক্ত হবেনা, ওঁকে সকলেই চেনে।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। উনি অভিনেত্রী মঞ্জরীদেবী।' ডিরেক্টার নন্দপ্রকাশজীর বাড়ীতে থাকেন।

চম্‌কে ওঠে সুরেশ্বর, চম্‌কে ওঠে অভিমন্যুও।

অভিমন্যু চম্‌কায় এতো স্পষ্ট ক'রে মঞ্জরীর নামটা শুনে, সুরেশ্বর চম্‌কায় অনেক কিছু কারণে।

এর পর সহসা তিনজনেই নীরব।

নীরবে অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে এসে, আর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অবশেষে ট্যাক্সি মেলে। সুরেশ্বর গম্ভীর-ভাবে বলে, 'উঠে আসুন অভিমন্যুদা, মিছিমিছি এ বেচারাকে ভয় খাইয়ে কোনো লাভ নেই।'

কথাটা যুক্তিযুক্ত।

রাত হয়ে গেছে, এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি যুবকের সঙ্গে চঞ্চলাকে একগাড়ীতে তুলে দিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা অসমীচীন। নীরবে গাড়ীতে উঠে বসে অভিমন্যু।

গাড়ী চলতে থাকে, সুরেশ্বর মিনিটে মিনিটে চঞ্চলাকে পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকে। চঞ্চলা ঘাব্‌ড়ে গিয়ে কিছুই ব'লে উঠতে পারেনা এবং ড্রাইভারটা উত্তক্ত হয়ে শেষপর্য্যন্ত উদ্ধত প্রশ্ন করে, সে পাগলের পাল্লায় পড়েছে কি না।

জনম্
জনমকে
সাথী

ডিরেক্টর নন্দপ্রকাশজীকে চঞ্চলা যতোই সমীহ করুক, দেখা গেলো—বম্বের পথচারী নাগরিকগণ তেমন করেনা। যে যার নিজের ধান্ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, প্রশ্ন করলে কেউ কানই করেনা, কান করলেও যথেচ্ছ একটা উত্তর দিয়ে কেটে পড়ে।

এমন বিপাকেও মানুষে পড়ে!

শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে সুরেশ্বর বলে, 'আজ আর হবেনা অভিমন্যুদা, কাল সকালে স্টুডিওয় ফোন্ ক'রে যা হয় হবে। একে আমাদের ওখানেই নিয়ে যাওয়া যাক্, খিদে-টিদেও তো পেয়ে গেছে বেচারার।'

চঞ্চলা সবেগে ব'লে ওঠে, 'খিদে পায়নি।'

'আহা, তোমার না পাক্, আমাদের তো পেয়েছে। খিদেয় মাথা ঘুরছে আমার।'

এতো বড়ো লোকটার—এ হেন ছেলেমানুষী কথায় চঞ্চলা হঠাৎ হেসে ফ্যালে, অভিমন্যু একসেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তবে চলো তাই। আর তো কোনো উপায়ও দেখছি না।'

হোটেল অভিমুখে চলতে চলতে অভিমন্যুর এই কথাই মনে হতে থাকে, তার সঙ্গে মঞ্জরীর সম্পর্ক যেন শুধু বিপদে ফেলারই সম্পর্ক। অভিমন্যুর ভাগ্যবিধাতা কি অদ্ভুত কৌতুকপ্রিয়!

ভাবতে ভাবতে-খেইহারা চিন্তা কোথায় ছড়িয়ে পড়ে।

মঞ্জরী কি এখনো তাকে মনের মধ্যে স্বীকার করে?

নাহ'লে অমন ভূতে তাড়া খাওয়ার মতো—দিশেহারা হয়ে পালালো কেন?

জনম্ জনমকে সাথী

মঞ্জরীর না কি আজকাল নানা দুর্নাম, সে না কি
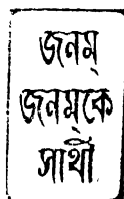
বড্ডো বেহায়া, বড্ডো বাচাল, আর বড্ডো না কি অর্থলিপ্সু,

এ মঞ্জরী, কোন্ মঞ্জরী ?

অন্ধকারে অভিমন্যুর ছায়া দেখে যে ছুটে পালালো সে ?

ভূতাহতের মতো যে পালিয়ে এসেছিলো, সে যে কেমন ক'রে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে এসে ব'সে পড়লো, নিজেই জানেনা সে।

অনেকক্ষণ লাগলো উত্তাল বক্ষস্পন্দন স্থির হতে।

কিন্তু তারপর ?

তারপর স্থুরু হলো পাগলের মতো ছট্‌ফটানি।

এ কী ক'রে বসলো সে ?

চঞ্চলাকে ফেলে পালিয়ে এলো !

এ কী বোকামী ! এ কী দুর্ব্বলতা ! কেন সে এমন দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে বসলো ? কেন নিতান্ত অবহেলায় অভিমন্যুকে গ্রাহ্য না ক'রে চঞ্চলাকে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে গাড়ীতে এসে উঠলো না ?

অভিমন্যু যেমন পরম অবহেলায় মঞ্জরীর জীবনটাকে ধূলোয় ছড়িয়ে দিয়েছে, মঞ্জরী কেন তেমনি ক'রে অভিমন্যুর সামনে গাড়ীর চাকার ধূলো উড়িয়ে দিয়ে চলে এলোনা ?

নিজেকে নিজে মারতে ইচ্ছে করে মঞ্জরীর।

আবার অভিমন্যুর সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত দর্শন-লাভের সুযোগটুকু নিতান্ত নির্বোধের মতো হারিয়ে ফেলে সমস্ত প্রাণ যতো হায় হায় করতে থাকে, ততো ছট্‌ফট্ করতে থাকে চঞ্চলার জন্যে।

এ কী দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ ক'রে বসলো সে ?

তবু সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত গ্লানি, রক্তের কোষে কোষে রক্তধারার উন্মাদ নর্ত্তনের সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরালে বাজতে থাকে অতি মধুর অতি কোমল একটি প্রত্যাশার সুর।

এই রাত্তিরবেলা চঞ্চলাকে সমুদ্রতীরে বালুবেলায় একা ফেলে রেখে চলে যাওয়া কি অভিমন্যুর পক্ষে সম্ভব হবে ?

তাকে তার জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ঘাড়ে না নিয়ে পারবে অভিমন্যু ?

চঞ্চলা যে এমন বোকা যে, বাড়ীর ঠিকানাটা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতাও নেই তার, এ-কথা মঞ্জরী ভাবতেও পারেনা। রাত্রি যতো বাড়তে থাকে, ততোই ভয়ে ভাবনায় রক্ত হিম হয়ে আসতে থাকে তার।

এর সবটাই ভুল নয় তো ?

চঞ্চলাই দেখেছিলো, বুদ্ধিহীন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন চঞ্চলা! মঞ্জরী নিজে তেমন স্পষ্ট ক'রে দেখেছিলো কি ? সে কি সত্যই অভিমন্যু ?

দেখেছিলো বৈ কি। হোক্ একমুহূর্ত্তের জন্য, তবু দেখেছিলো নির্ভুল স্পষ্ট—চঞ্চলার উচ্ছ্বসিত আহ্বানে হঠাৎ যখন মুখ ফিরিয়েছিলো অভিমন্যু।

রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষের নিশ্চিত বিশ্বাসের মূল কেমন শিথিল হয়ে আসে, নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে মঞ্জরী। আপন হৃদয়তত্ত্ব কোন্-ফাঁকে বিস্মৃত হয়ে যায়, শুধু

উত্তরোত্তর একটা ভয়ঙ্কর ভয় দাঁতালো জন্তুর মতো ক্রমশঃ গ্রাস ক'রে ফ্যালে তাকে।

এতক্ষণ আশার যে ক্ষীণ সুরটি সমস্ত দুর্ভাবনার তলায় তলায় বেজে চলেছিলো, সে সুর স্তব্ধ হয়ে গেছে, অথচ কোনো দিশে পাচ্ছেনা। আবার যাবে ট্যাক্সি নিয়ে সেই পরিত্যক্ত জায়গাটায়? হয়তো দেখতে পাবে সমস্ত ভ্রমণবিলাসীরা যে যার আপন আপন জায়গায় ফিরে গেছে, চঞ্চলা সেই নির্জ্জন সমুদ্রসৈকতে একা ব'সে কাঁদছে!

কিন্তু কতো রাত এখন?

সাড়ে-বারোটা না? মঞ্জরী যাবে এখন? একা? আর পৃথিবীটা কি শুকদেবের আশ্রম? সেখানে দুপুর রাতে লোকচক্ষুহীন নির্জ্জনতায় ষোলবছরের এক স্বাস্থ্যবতী মেয়ে একা ব'সে কাঁদবার অবকাশ পায়?

ক্রমশঃ মনের সমস্ত স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলে মঞ্জরী। ওর মনে হতে থাকে, চঞ্চলাকে ও বাঘের খাঁচায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এসেছে। এসেছে কেবলমাত্র একটা মূঢ় ভয়ে।

অভিমন্যুকে দেখেনি মঞ্জরী। না না, অসম্ভব। অভিমন্যু সেখানে আসতেই পারেনা। চঞ্চলার দৃষ্টিভ্রম, মঞ্জরীর দৃষ্টিভ্রম।

তবে এখন কি করবে মঞ্জরী?

চঞ্চলাকে মন থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকবে? একান্তভাবে মঞ্জরীকে নির্ভর ক'রে যে বুদ্ধিহীন মেয়েটা সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে এসেছে, মঞ্জরীর বুদ্ধিহীনতাও যার জন্য ষোলো আনা দায়ী—সেই চঞ্চলাকে হয়তো এখন বন্যপশুতে—

শিউরে চীৎকার ক'রে উঠতে গিয়ে থেমে যায়

মঞ্জরী। ভাবে, উঠে গিয়ে নন্দপ্রকাশজীর স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা বিবৃত ক'রে পরামর্শ চায়, কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারেনা। কি বিবৃতি দেবে? ভুলক্রমে মেয়ে ফেলে চলে এসেছে মঞ্জরী? তারপর নিজের ভয়ে তাকে আর আনবার চেষ্টা করেনি? এর বেশী আর কি বলবার আছে মঞ্জরীর?

শেষপর্য্যন্ত হয়তো অজ্ঞান হয়েই শুয়ে পড়তো মঞ্জরী, হয়তো পাগলের মতো ছুটোছুটিই করতো, সহসা চম্‌কে উঠলো নন্দপ্রকাশজীর গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে।

গম্ভীর বনেদীগলায় তিনি 'মঞ্জী বহিন'কে ডাক দিচ্ছেন।

ধড়মড় ক'রে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো মঞ্জরী, একটা অজানিত ভয়ে বুক কেঁপে উঠছে।

নন্দ-গৃহিণী খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালেন, চঞ্চলা তার যে আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গেছে, তাঁরা নন্দপ্রকাশজীর নম্বরে ফোন্ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, খাওয়া-দাওয়ায় রাত হয়ে গেছে ব'লে ও আজ সেখানেই রয়ে গেলো, কাল সকালে আসবে। রাত বহুত হয়েছে, এতো রাতে চাকর-বাকরকে দিয়ে খবর দেওয়াটা অসভ্যতা বিবেচনায় বাধ্য হয়ে তাঁকেই আসতে হলো।

সংবাদটুকু এবং মন্তব্যটুকু নিবেদন ক'রে মহীয়সী ভঙ্গিমায় চলে গেলেন তিনি, আর মঞ্জরী শুধু অস্ফুটে একবার 'ভগবান' ব'লে দরজার কাছ থেকে স'রে এসে দু'হাতে বুকটা চেপে ব'সে পড়লো।

বুকের মধ্যে এ কী দুরন্ত যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা কি—আনন্দের?

কিসের এই আনন্দ, যা যন্ত্রণার মতো মোচড় দিয়ে দিয়ে নিজের আবির্ভাব জানায়?

চঞ্চলার নিরাপত্তার সংবাদের আনন্দ?

'ভগবান আছেন' এই চিন্তার আনন্দ?

জনম্ জনম্‌কে সাথী

অভিমন্যু ফোন্ ক'রে 'মঞ্জরীদেবী'র কাছে সংবাদ পাঠিয়েছে এই আনন্দ ?

অভিমন্যু তো খবর না দিয়ে মঞ্জরীকে জব্দ ক'রে নৃশংস আনন্দ উপভোগ করতে পারতো। অভিমন্যু তো চঞ্চলাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে সুনীতিকে দিয়ে মঞ্জরীর নামে মেয়েচুরির মামলা তুলতে পারতো। অভিমন্যু তো চঞ্চলাকে উপলক্ষ্য ক'রে অনেক অনিষ্ট করতে পারতো মঞ্জরীর।

কিন্তু না। অভিমন্যু তা করেনি। সে মঞ্জরীর একান্ত প্রিয় প্রাণীটিকে সযত্নে সমাদরে নিজের আস্তানায় নিয়ে গেছে, মঞ্জরী আবার পাছে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয় ব'লে তাকে তার খবর পাঠিয়েছে।

বারে বারে অভিমন্যুই শুধু জিতে যাবে তাহ'লে ?

মঞ্জরীর বারে-বারেই পরাজয় ?

চায়ের পর্ব্ব শেষ হতেই অভিমন্যু বলে, 'চঞ্চলা, ইতিমধ্যে তো তোমার সুরেশ্বরদার সঙ্গে রীতিমত ভাব জমিয়ে ফেলেছো দেখছি, আর তাহ'লে ওর সঙ্গে বাড়ী যেতেও আপত্তি হবেনা ?'

চঞ্চলা সুরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হাসি হাসে। বাস্তবিকই গতরাত্রে আহারের টেবিলে এবং আজ এই সকালের মধ্যে সুরেশ্বরকে যেন তার অভিমন্যুর চাইতেও অধিক পরিচিত আত্মীয় ব'লে মনে হচ্ছে।

জনম্ জনমকে সাথী

সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলে, 'আমাদের কিছুতেই আপত্তি নেই, ওটা আপনারই ব্যাপার।'

'যাক্, সেটা তো তাহ'লে জেনেই নিয়েছো দেখছি।'

অভিমন্যু চেয়ার থেকে উঠে ব্যাল্‌কনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। সুরেশ্বরও পিছু পিছু উঠে আসে। তেমনি গম্ভীরভাবে বলে, 'অভিমন্যুদা, মাঝে মাঝে মনে হতো ,আপনি বেশ দেবতুল্য ব্যক্তি, সে ভুল ভাঙলো।'

অভিমন্যু মুখ ফিরিয়ে মৃদুহেসে বলে, 'ভুল ধারণা যতো ভাঙে ততোই মঙ্গল।'

'এখন দেখছি আপনি একটি পাষণ্ড!'

'জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়া আরও মঙ্গল।'

'ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। ছি ছি! চঞ্চলার কাছে শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেছি। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে আপনি দিব্যি 'মড়া' ব'লে চালিয়ে আসছিলেন?'

অভিমন্যু মুখের হাসি প্রায় তেমনি বজায় রেখে বলে, 'অনেক সময় মৃত্যুরও তো নানা রকম রূপ থাকে সুরেশ্বর!'

'হুঁ! তিনি আপনার কাছে মৃত এই বলতে চান তো? কিন্তু কেন?'

,চঞ্চলা যখন তোমার কাছে তার মনের দরজা খুলেছে, তখন সব খবরই দিয়েছে আশা করছি।'

সুরেশ্বরও এবার হেসে ফেলে বলে, 'তা অবশ্য দিয়েছে। ওর বান্ধবীর দাদা সিনেমা·এ্যাকট্রেস ছাড়া বিয়ে করবেনা বলেই বেচারা তার মাসীমার অঞ্চলপ্রান্ত ধ'রে সিনেমা এ্যাকট্রেসের কারখানায় এসে হাজির হয়েছে, তা ও জানতে দিয়েছে, কিন্তু কথা তো তা নয়! বৌদিকে আপনার ত্যাগ করার কোনো মানে হয়না! সিনেমা করা, জলসায় গান করা, বা বেতার বক্তৃতা করা, এগুলো তো

জনম্
জনমকে
সাথী

এ-যুগে এক পর্য্যায়ের জিনিস, এর জন্যে আপনি স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন? ছিঃ! আপনি যে এতো গোঁড়া, এতো সেকেলে, তা ভাবাই যায়না।'

'ছ্যাখো সুরেশ্বর'—অভিমন্যু ম্লান গম্ভীরভাবে বলে, 'সমস্ত কর্ম্মদেহের মধ্যেই সূক্ষ্ম একটি কারণ-রূপ আত্মা থাকে, বুঝলে? যেটা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়না। কিন্তু চঞ্চলার ব্যাপারটা শুনে তাজ্জব লাগছে যে? ওটা আবার কি?'

'ওটা?' সুরেশ্বর মুচ্‌কে হাসে, 'ওটা বোধকরি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন। আপনাদের মতো লোকের জন্যে।'

'সে চীজটি কোথায়?'

'সে কলকাতায়। তাতে কি? সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন শুধু মাসীমার খোসামোদ ক'রে-ট'রে এ্যাকট্রেস হতে পারলেই, ...কিন্তু শুনছি মাসীর তেমন গা নেই। সে যাক্, আমি কিন্তু ঠিক বৌদির সঙ্গে আলাপ ক'রে আসবো—'

অভিমন্যু ব্যাল্‌কনির ওপর থেকে জনাকীর্ণ পথের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে, 'পাগলামী কোরোনা সুরেশ্বর!'

সুরেশ্বর এ দৃঢ়তায় টলেনা, ততোধিক দৃঢ়স্বরে বলে, 'পাগলামী আপনিই ক'রে চলেছেন অভিমন্যুদা। পৃথিবীকে আজো আপনি পুরনো চশমায় দেখছেন। পৃথিবী বদলাচ্ছে, সমাজ বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে জীবনের রীতিনীতি সংস্কার। পুরনো খুঁটি আগ্‌লে ব'সে থাকাটা পাগলামী ছাড়া আর কি? আপনি বারণ করলেও আমি ভয় খাবোনা, আমি ঠিক গিয়ে আলাপ ক'রে আসবো।'

জনম্ জনমকে সাথী

অভিমন্যু তীক্ষ্ণহাস্যে বলে, 'কেন বলো তো

এতো জোরালো সংকল্প ? আকর্ষণটা চঞ্চলার নয় তো ?'

সুরেশ্বর দমবার ছেলে নয়, সেও সমান তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'অসম্ভব কি ? সত্যি বলতে, আমি তো শুধু ওর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসার কারণ শুনে মুগ্ধ চমৎকৃত হয়ে গেছি। যে মেয়ে প্রেমাস্পদের উপযুক্ত হবার সাধনায় এতোবড়ো মূল্য দিতে প্রস্তুত, সে মেয়ে দুর্ল্লভ মেয়ে। হয়তো এটা ওর হাস্যকর ছেলেমানুষী, হয়তো—প্রেমাস্পদটি একটি হনুমান-বিশেষ, কিন্তু ওর নিষ্ঠার মূল্য কম নয়।'

'সুসংবাদ।'

ব'লে ঘরে ফিরে এসেই অভিমন্যু বলে, 'চঞ্চলা, চলো তাহ'লে ?'

'আপনি যাবেন ?' উৎফুল্ল আনন্দে বলে চঞ্চলা।

'তাই ভাবছি। সুরেশ্বর যাচ্ছো তো ?'

সুরেশ্বর অভিমন্যুর এই সহসা মতি পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য হলেও সেটা প্রকাশ করেনা, উদাসভাবে বলে, 'সবাই মিলে যাবার দরকার কি ?'

'বাঃ, বাড়ীটা চেনাও তো দরকার ?'

'কিজন্যে ?'

'বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে।'

'নাঃ।'

'কেন, হঠাৎ সংকল্পের পরিবর্ত্তন যে ?'

'সে তো সকলেরই হচ্ছে।'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'তা সত্যি, সেটা হঠাৎই হলো। কি জানো সুরেশ্বর, রাতের অন্ধকারে মানুষ কেমন দুর্ব্বল হয়ে যায়। সকালের আলোয়
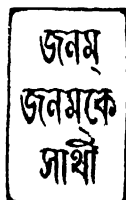
একটু সাহস অনুভব করছি। মনে হচ্ছে—এই লুকোচুরি, এই পালিয়ে বেড়ানো, এটা যেন হাস্যকর ছেলেমানুষী।'

সুরেশ্বর ব্যগ্রভাবে কাছে এসে বলে, 'আমিও তাই বলছি অভিমন্যুদা। দূরত্বের ব্যবধান ক্রমশঃই সহজ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। হয়তো একবার দেখা হলেই দেখবেন সব সহজ হয়ে গেছে। জীবন জিনিসটা কি এতোই সস্তা অভিমন্যুদা, যে ইচ্ছেমতো অপচয় করা চলে?'

শেষপর্য্যন্ত তিনজনেই।

পথে গাড়ী দাঁড় করিয়ে অভিমন্যু চঞ্চলাকে খুসিমত বাছতে দিয়ে দামী শাড়ী কিনে দিলো একটা। সুরেশ্বর বিনা দ্বিধায় কিনে বসলো একগাদা চকোলেট টফি, চুলের রিবন, আর পাউডার কেস্।

নেপথ্যে অভিমন্যু বলে, 'কি হে ভায়া, শেষ অবধি প্রেমেই প'ড়ে যাচ্ছো না তো? সন্দেহ হচ্ছে যে?'

সুরেশ্বর বেপরোয়া বলে, 'আমারও সন্দেহ হচ্ছে।'

'কিন্তু সেই হতভাগ্য হনুমান-বিশেষের উপায়?'

'কদলীফলের অভাব নেই দেশে।'

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে ওঠে সুরেশ্বর।

মঞ্জরীর দরজায় এসেই কিন্তু দুই বন্ধুরই সাহস অবলুপ্ত।

গাড়ীতে ব'সে থেকেই ওরা চঞ্চলকে নামিয়ে দেয়। দুই হাতে উপহারের বোঝা বুকের কাছে জড়ো

ক'রে ধ'রে রেখে চঞ্চলা বিপন্নভাবে অথচ সাগ্রহে বলে, 'নামবেন না আপনারা ?'

'নাঃ, কাজ আছে আজ।'

গাড়ী চলে যাবার পরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে চঞ্চলা। ওর হঠাৎ মনে হয় ও যেন একটা দিন স্বর্গে কাটিয়ে, ফের মাটির পৃথিবীর বুকচাপা অন্ধকারে নেমে এলো।

একদিনে মনের রং এমন বদ্‌লে যায় ? কলকাতার বান্ধবীর দাদা রসাতলে যাক্, সদ্যদেখা স্বর্গদূতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে চঞ্চলা। আর দুঃসাহসী মেয়েটা এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার ক'রে বসে।

টেলিফোন্ ডাইরেক্টরী দেখে দেখে সুরেশ্বরদের হোটেলের নম্বর সংগ্রহ ক'রে ফোন্ করতে বসে।...সুবিধে পেলেই বসে। সুরু হয় কথার খেলা। কারুকার্য্যহীন সহজ কথা, তবু আগ্রহটা সহজ নয়।

কাটে কয়েকটা দিন।

'ছোটমাসী!'

মঞ্জরী জানলার কাছে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে ব'সে কি যে ভাবছিলো কে জানে, চম্‌কে বললো, 'কি রে ?'

চঞ্চলার কণ্ঠে যেন কুণ্ঠিত আবেদনের সুর।

চঞ্চলার আগের চঞ্চল মূর্ত্তি এখানে এসে পর্য্যন্তই নেই, আবার সেদিনের ঘটনার পর থেকে আরো যেন স্থির নীবর হয়ে গেছে।

'সুরেশ্বরদা ফোন্ ক'রে জিজ্ঞেস করছেন, এখানে আসবেন?'

মঞ্জরী অবশ্য চঞ্চলার মুখে সেদিনের ঘটনা সবই শুনেছে, চঞ্চলার সদ্যপ্রাপ্ত 'দাদা'র গুণবর্ণনাও শুনেছে, উপহার সামগ্রী দেখেও তারিফ করেছে, তবু বলতে পারেনি, 'সে কি রে, ভদ্রলোককে দরজা থেকে বিদায় দিলি?' অথবা বলতে পারেনি, 'ভদ্রলোককে একদিন আসতে বললিনা কেন?' কি ক'রে বলবে? তার সঙ্গে যে আর-একটা অদ্ভুত অনাসৃষ্টি জড়িত। যেখানে সাধারণ ভদ্রতার প্রশ্ন অবান্তর। তাই আজ আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'ফোন্ ক'রে জানতে চাইছেন মানে?'

'বলছেন, এলে তুমি রাগ করবে কি না?'

'রাগ! রাগ করবো কেন?'

'তবে ব'লে দিইগে—' ব'লেই ঈষৎ থতমত খেয়ে চঞ্চলা বলে, 'সুরেশ্বরদা বলছিলেন একজায়গায় বেড়াতে যাবেন, তাই—ইয়ে—আমাকে নিয়ে যাবেন—'

মঞ্জরী গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'বেড়াতে নিয়ে যাবেন? কোথায়?'

'তা জানিনা।

'আচ্ছা, ওঁকে আসতে তো বলো। কথা ব'লে বুঝে দেখি।'

চঞ্চলা ছুটে যায়।

মঞ্জরী ওর দিকে তাকিয়ে একটু কৌতুকের হাসি হাসে। সে কৌতুকে ব্যথা মিশানো। ছেলেমানুষ! মন এখনো দানা বাঁধেনি। যাকে দেখে তাকেই ভালো লাগে। জানেনা পৃথিবী কি জায়গা! কিন্তু কে এই সুরেশ্বর, যে অভিমন্যুর এমন প্রিয়বন্ধু হয়ে উঠেছে? অভিমন্যুর যে-জীবনে মঞ্জরী ছিলো, সেখানে এ নামের বাষ্পও তো শোনোনি।

খানিকটা পরে চঞ্চলা এলো, খুসিতে টলমল মুখ, আবেগে ছলছল চোখ।

'বললেন, একখুনি আসছেন।'

মঞ্জরী প্রশ্ন করতে পারলোনা, 'একাই আসছেন তো?' মুখে আসছিলো প্রশ্নটা, তবুও না। ও জায়গাটা যেন একটা স্তূপীকৃত অন্ধকারের বোঝা। লজ্জার অন্ধকার, বেদনার অন্ধকার, অপমানের অন্ধকার। ওখানে হাত দিতে সাহস হয়না। থাক্ ওই ডেলা-পাকানো অন্ধকারখানা···হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে গেলেই হয়তো দাঁত খিঁচিয়ে কামড় দিতে আসবে মঞ্জরীকে।

উদ্যত প্রশ্ন থামিয়ে মঞ্জরী বরং মৃদুহাস্যে বলে, 'একবেলার আলাপেই যে তোর সেই সুরেশ্বরদাদার সঙ্গে দারুণ ভাব হয়ে গেছে দেখছি রে?'

চঞ্চলার মুখটা শুধু লাল হয়ে ওঠে। বলতে ভুলে যায়, কী বিপদের সময় উপকার করেছিলো ওরা। সেদিন চঞ্চলার খুসির আতিশয্যে মঞ্জরীর বিশদৃশ ব্যবহারের কটুত্ব আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার গুরুত্ব যেন হালকা হয়ে গিয়েছিলো।

ও চলে যায়। আর মঞ্জরী শাণিতবুদ্ধির তীক্ষ্ণধার দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে—এ শুধু সুরেশ্বরের চঞ্চলার প্রতি আকর্ষণ মাত্র, না এ আর কারো ছল?

কে জানে এর সবটাই পরিকল্পিত কি না।

নইলে এতো দেশ থাকতে অভিমন্যুর কি দরকার পড়েছিলো এদেশে আসতে? আবার সান্ধ্যভ্রমণের জায়গা নির্ব্বাচনেও সেই সন্দেহের অবকাশ। এ কি শুধুই দৈবের ঘটনা?

কিন্তু তাই যদি হয়—যদি পরিকল্পিতই হয়, কেন?

সুনীতির চর হয়ে যদি চঞ্চলাকে উদ্ধার করতে এসে থাকে অভিমন্যু, তবে তাকে হাতে পেয়ে আবার ফিরিয়ে দিলো কেন?

তাহ'লে?

রগের শিরা দুটো দপ্‌দপ্‌ ক'রে ওঠে, মুখের গড়ন কঠিন হয়ে আসে। তাহ'লে কি বনলতার জীবনের অভিজ্ঞতাই মঞ্জরীর কাজে লাগতে সুরু করেছে এইবার?

যে ধারণায় প'ড়ে মঞ্জরী কলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছে, সর্ব্বনাশের কবলে প'ড়ে নিজেকে ধ্বংস করেছে, মঞ্জরীর সেই ধারণাটাই সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত?

অর্থই সব?

অর্থই আবরণ?

অর্থের আবরণেই সমস্ত কলঙ্ক চাপা প'ড়ে যায়? আর বনলতার অর্জ্জিত সেই সত্য? "জীবনে কোনোখানে কোথাও খানিকটা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারলেই অনেক কলঙ্ক সত্ত্বেও লোকে তোমায় সম্ভ্রম করতে সুরু করবে।"...সেও এবার প্রমাণিত হবে নাকি?

সহায়সম্বলহীনা মঞ্জরীকে অভিমন্যু অপমান করতে পেরেছিলো, পেরেছিলো অগ্রাহ্য করতে, আজ পারছে না। আজ যশ অর্থ আর প্রতিষ্ঠার সিংহাসনারূঢ়া মঞ্জরীকে সে বুঝি নতুন ক'রে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে চায়। তাই এই ছল, তাই এই দূত প্রেরণ। দূতের পিছনে নিজেও আছে নিশ্চয়ই।

সন্দেহ নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

জনম্ জনমকে

মনে পড়লো বনলতার সেই তীক্ষ্ণ শ্লেষ, "অনেক টাকা নিয়ে কি করবি? ত্যাগ-ক'রে-আসা বরকে ফের টাকা দিয়ে কিনবি?"

চেষ্টা ক'রে কিনতে হচ্ছেনা, নিজেই সেই পতঙ্গ আপনাকে বিকিয়ে দিতে এসেছে।

কিন্তু মঞ্জরীর তো নিজেকে বিকিয়ে দেবার বাসনা নেই, সে উপায়ও নেই। অতএব মঞ্জরীকে শক্ত হতে হবে।

অভিমন্যু যদি আসে মুগ্ধমন্ত্রে তোষামোদ করতে, মুখ ফিরিয়ে থাকতে হবে মঞ্জরীকে। অভিমন্যু যদি আসে মঞ্জরীর টাকার উপর লুব্ধদৃষ্টি হানতে, তাহ'লে মঞ্জরী দু'হাতে সে-টাকা ছড়িয়ে দেবে তার মুখের উপর।

সেই হবে উচিত উত্তর।

ভাবতে ভাবতে এক জায়গায় থম্‌কে যায়, অভিমন্যু কি তেমন? ভাবতে গিয়ে আর-একটা মনস্তত্ত্ব কাজ করে। নিজের মধ্যে যখন জমে ওঠে অপরাধবোধের বোঝা, তখন সে বোঝা হালকা করতে প্রাণপণে অপরের পাল্লায় অপরাধের বোঝা চাপিয়ে চলে। হয়তো সে বোঝা আপন বিকৃতদৃষ্টির বিকারে গড়া কল্পিত অপরাধের। এ নইলে মানুষ বাঁচতোই বা কি ক'রে? অপরাধভারে ভারাক্রান্ত সেই মনকে নিয়ে সংসারে চলতো কি ক'রে?

তাই যে-দোষ করেনি অভিমন্যু, যে-দোষ করা তার পক্ষে সম্ভব কি না ঠিক নেই, মনে মনে অভিমন্যুর সেই দোষের উচিত শাস্তি তৈরী করতে থাকে মঞ্জরী।

অভিমন্যু 'তেমন' নয়, তাই বা বলা যায় কিসে? চিরদিন তো সে আরামপ্রিয় আয়েসী, আত্মমর্য্যাদাবোধহীন। নইলে দাদারা যখন নতুন নতুন প্রাসাদ তৈরী ক'রে সহরের বুকে জাঁকিয়ে বসলো, অভিমন্যু কিনা তখন তাঁদের প্রসাদস্বরূপ বাবার আমলের ভাঙা বাড়ীখানা নিয়ে কৃতার্থ হয়ে প'ড়ে থাকলো? পূর্ণিমাদেবী অক্ষ

জনম্
জনমকে

ছেলেদের-দেওয়া হাতখরচের টাকা অভিমন্যুর সংসারে খরচ করেছেন, অভিমন্যু অম্লানবদনে মেনে নিয়েছে সে ব্যবস্থা। তবে ?

ভাবতে ভাবতে ক্রমশঃই মনে হতে থাকে—অভিমন্যু একের নম্বরের নীচ স্বার্থপর আর লোভী। আরাম আয়েসই ওর জীবনের কাম্য। তাই কোনোদিনই কৃতিত্বের শিখরচূড়ায় উঠবার তাগিদে জীবনযুদ্ধে নামলো না। শিস্ দিয়ে গান গেয়ে জীবন কাটাতে পাওয়াই তার চরম লক্ষ্য।

অতএব এখন সে অনায়াসেই মঞ্জরীর স্তাবক হতে পারে।

এই চিন্তার দুরন্ত তাড়নায় দেহের রক্ত যখন পা থেকে মাথা অবধি ছুটোছুটি করেছে, তখন এলো সুরেশ্বর।

নিখুঁৎ পোষাকে ভূষিত দীর্ঘদেহী সুকান্তি যুবা।

এসেই হাত জোড় ক'রে সহাস্যে ব'লে ওঠে, 'আগে থেকে অভয় নিয়ে এসেছি, আর রাগ করতে পারবেন না।'

মঞ্জরী প্রতিনমস্কার ক'রে গম্ভীরভাবে বলে, 'খামোকা রাগই বা করতে যাবো কেন ?'

'কেন নয় ? আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়ে দিতে এলাম। তবে ভয় নেই, বেশীক্ষণ জ্বালাতন করবো না, অনুমতি চাইতে এসেছি, চঞ্চলাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবার।'

মঞ্জরী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, 'প্রার্থনাটা কার ?'

জনম্ জনমকে সাথী

'কার আবার ? আমারই। অপরের বেনামীতে কোনো কাজ করা আমার ধাতে নেই।'

মঞ্জরী আরো তীক্ষ্ণস্বরে বলে, 'আমি অভিনেত্রী, আমার রীতিনীতি আলাদা, কিন্তু আপনি তো

বাঙালীর ছেলে, আপনার এ আবেদনটা সঙ্গত কি না নিজেই বলুন।'

মনে করেছিলো এ অপমানে জোঁকের মুখে নুন পড়বে। এ অপমানে মুখ কালো ক'রে ফিরে যাবে অভিমন্যুর সোহাগের বন্ধু। কিন্তু মঞ্জরীকে অবাক ক'রে দিয়ে লোকটা কি না হেসে উঠলো। হাসির শব্দে চম্‌কে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো মঞ্জরী, দেখে লজ্জায় ম'রে গেলো।

কী সুন্দর, কী পবিত্র, কী সরল হাসি।

এ হাসি যেন কোন স্বর্গের জিনিস! এ হাসি যে হাসতে পারে, তার মধ্যে বোধকরি মালিন্যের লেশও থাকতে পারেনা।

সেই হাসি হেসে সুরেশ্বর ব'লে উঠলো, 'বলেছেন ঠিকই, সঙ্গত নয়। কিন্তু এ কেস্‌টা আলাদা। চঞ্চলাকে আমি বিয়ে করবো। কাজেই আমার সঙ্গে একে—'

'চমৎকার।'

মঞ্জরী তিক্ত বিদ্রূপের হাসি হেসে ব'লে ওঠে, 'চমৎকার। কালনেমির লঙ্কাভাগের নমুনা।'

'ঠাট্টা ক'রে আমায় কাবু করতে পারবেন না।' আর-একবার হাসে সুরেশ্বর—'এ সংকল্প স্থির ক'রে ফেলেছি। পাত্র হিসেবে আমি নেহাত খারাপ নই, এক সময় লেখাপড়া কিছু করেছি, বাবার অনেক পয়সা আছে, জাতে ব্রাহ্মণ, চেহারাও দেখছেন—নিতান্ত নিন্দের নয়, তাছাড়া—আপনার বোনঝিটিই বা কি এতো রূপসী?'

মঞ্জরী ওর কথার ধরণে রাগতে ভুলে যায়। প্রায় হেসে ফেলে বলে, 'কিন্তু আপনার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে কে?'

'আপনারাই। এই যে স্বয়ং ক'নের মা'র

জনম্ জনমকে সাথী

হুকুমনামা জোগাড় ক'রে ফেলেছি, এখন ক'নের মাসীর হুকুম পেলেই হয়।'

'মায়ের হুকুমনামা ?'

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মঞ্জরী।

'হ্যাঁ, এই যে দেখুন না, ইতিমধ্যে অভিমন্যুদাকে অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে একখানি পত্রাঘাত করিয়ে এই উত্তরটি আদায় করতে সমর্থ হয়েছি।'

আশ্চর্য্য এই ছেলেটা।

মঞ্জরীর সঙ্গে যেন এইমাত্র পরিচয় হয়নি ওর, যেন যুগযুগান্তের আলাপ।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বার ক'রে মঞ্জরীর দিকে এগিয়ে দেয় সে।

সুনীতির হাতের লেখা। অভিমন্যুকে সম্বোধন ক'রে।

বুকটা থরথর ক'রে ওঠে, তবু হাত এগোয় না। তবু কঠিন থাকতে হয়।

'অপরের চিঠি পড়ার অভ্যাস আমার নেই।'

'আহা, 'অভ্যাস:আছে' এ অপবাদ অপনাকে দিচ্ছে কে ? ধরুন আমার অনুরোধ। নিন, প'ড়ে দেখুন।'

অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে লোভ, দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠে কৌতূহল। বাসনার আবেগে থরথর কম্পন! মরুভূমির যাত্রীর কাছে পাত্রভরা জল এনেছে সুরেশ্বর!

জনম্ জনমকে সাথী

কতোদিন দিদির হাতের লেখা দেখেনি মঞ্জরী, কতোদিন দেখতে পায়নি অভিমন্যুর নাম।

মন্ত্রাহতের মতো হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলো, স্বপ্নাহতের মতো চোখ বুলোলো।

ছোট্ট চিঠি।

সুনীতি লিখেছেন, 'ভাই অভিমন্যু, তোমার চিঠিতে সব অবগত হলাম। চঞ্চলার সংবাদ আমি কানাঘুসায় শুনেছিলাম, কিন্তু বিচলিত হইনি। কারণ আমি এখন আর কোনো কিছুই নিজের কর্ত্তব্য ব'লে চিন্তা করিনা। জানি, গুরুদেবের ইচ্ছা ছাড়া পথ নেই।

তুমি যে পাত্রটিকে সুপাত্র বলেছো, তার সম্বন্ধে আমার আর বলবার কিছু নেই। পথভ্রষ্ট অবোধ মেয়েটাকে তিনি যদি দয়া ক'রে পায়ে স্থান দেন, সেও গুরুদেবের কৃপা বলেই জানবো। আশীর্ব্বাদ নাও।

ইতি—

তোমাদের দিদি'

না, মঞ্জরীর নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই।

গুরুকৃপালাভে ধন্য ব্যক্তিদের পক্ষে মমতাশূন্য হওয়া নিন্দনীয় নয়। হয়তো বা প্রশংসনীয়ই।

চিঠিখানা মালিকের হাতে ফেরত দিয়ে মঞ্জরী কেমন যেন ক্লান্তস্বরে বলে, 'আকস্মিক এ খেয়ালটা কখন হলো আপনার?'

'কোন্‌টা? এই বিয়েটা? খেয়াল নয়, খেয়াল নয়, সংকল্প। যেদিন ওকে দেখলাম সেইদিনই।'

'আশ্চর্য্য! ওর কি বিয়ের বয়েস হয়েছে?'

'হয়েছে কি না, সে উত্তর তো আপনি নিজে সব প্রথম দিয়েছেন।'

সুরেশ্বর হেসে ওঠে।

মঞ্জরীর মনে প'ড়ে যায় সবপ্রথমেই সে চঞ্চলাকে সুরেশ্বরের সঙ্গে বেড়াতে পাঠাবার প্রস্তাবে সঙ্গতি অসঙ্গতির প্রশ্ন তুলেছিলো।

জনম্ জনমকে সাথী

'আমার কাছে আপনার প্রস্তাবটা ঝড়ের মতোই আকস্মিক। যাক্, ক'নের প্রকৃত অভিভাবকের সম্মতি যখন পেয়েই গেছেন, আমার বলবার কি আছে ?'

'উহুঁ ? ও ভাষা নয়, আপনার প্রসন্ন সম্মতি চাই।'

মঞ্জরী সহসা আত্মস্থ হয়ে উঠলো, আর সেইজন্যই রূঢ় হয়ে উঠলো। বললো, 'আপনার সম্বন্ধে আমার এমন বেশী জ্ঞান নেই যাতে ওটা দেওয়া যায়। বরং যে-কোনো একটা মেয়েকে একবার দেখেই তার প্রেমে প'ড়ে যাওয়ার অভ্যাসকে আমি ডিস্‌কোয়ালিফিকেশানই মনে করি।'

'সর্ব্বনাশ। এটা আমার অভ্যেস ব'লে মনে করেছেন না কি ? তা নয়, তা::নয়। শুনুন—এযাবৎ মনের মতন মেয়ে একটিও পাচ্ছিলাম না, হঠাৎ ওকে দেখেই মনে হলো, এই সেই মেয়ে! একেই বিয়ে ক'রে ফেলা যাক্। আমার মতে, বিয়ে করতে সেই মেয়েই ঠিক, যার মধ্যে বুদ্ধির ভাগ কম, আর আবেগের ভাগ বেশী। যে মেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধির ধারালো ছুরি দিয়ে রাতদিন শুধু লেনদেনের চুলচেরা হিসেব কষতে থাকে, যার কাছে হৃদয়ের চাইতে মস্তিষ্ক দামী, সে মেয়ে আমার নমস্য, তাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারিনা।'

'বয়েসে চঞ্চলা আপনার অর্দ্ধেক।'

'কী মুস্কিল। আমার ঠিকুজি কোষ্ঠি আঁপনি দেখলেন কখন ?'

রেগে গেলো মঞ্জরী, কিছুতেই সুরেশ্বরকে রাগাতে না পেরে। ক্রুদ্ধস্বর গোপন ক'রে অবহেলাভরে বললো, 'কতো বয়েস আপনার ?'

'সাতাস।'

মঞ্জরী মনে মনে হিসেব করলো সাতাশ—চঞ্চলার

ষোলো, এমন বেশী তফাৎ নয়। তখন কৌতুকবোধ করলো। বললো, 'দেখে তো মনে হয় না, কে জানে বয়েস চুরি করেছেন কি না।'

'রামোঃ! ওটা মেয়েদের একচেটে।'

'সব মেয়ের নয়।'

'সেটা ব্যতিক্রম। সত্যবাদী মহিলাদের আবার আরো কষ্ট। আমি একটি চল্লিশ বছরের মহিলাকে বয়েসের হিসেব দিতে বলতে শুনেছি—উনচল্লিশ বছর সাড়ে-দশমাস।'

মঞ্জরী হেসে ফেললো।

পরিবেশ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা সুরেশ্বরের অদ্ভুত। মঞ্জরী ভুলেই গেলো ও কে, ও কেন এসেছে। তর্কের সুরে সকৌতুকে বললো, 'আপনি দেখছি বড্ডো বাজে কথা বলেন, এটা নিশ্চয় বানানো কথা।'

'বিশ্বাস না করেন নাচার। এরকম অনেক 'সত্য গল্প' আমার স্টকে আছে। আর একদিন এসে হবে. আজ যদি অনুমতি করেন চঞ্চলাকে নিয়ে যাবার—'

সুরেশ্বরের হাতে সুনীতির লেখা ছাড়পত্র। মঞ্জরী বাধা দিতে যাবে কোন্ ধৃষ্টতায়? তাছাড়া—হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলো—অভিমন্যুর প্রেরিত চর ভেবে সুরেশ্বরের প্রতি যে বিরুদ্ধ মনোভাবটা ছিলো সেটা কখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চঞ্চলাকে ঝোঁকের মাথায় এনে ফেলে পর্য্যন্ত মনে শান্তি ছিলোনা একতিল, ভেবে পাচ্ছিলোনা ওকে নিয়ে অবশেষে কি করবে। চঞ্চলার প্রার্থিত অভিনেত্রী-জীবনের পথে এগিয়ে দেবার কথা তো ভাবতেই পারেনা মঞ্জরী। তবে এই ভালো! এই হোক্! এ যদি সবটাই অভিমন্যুর পরিকল্পিত ব্যাপার হয়, তাও হোক্। অভিমন্যুই জিতে যাক্। তবু যেখানে

জনম্ জনমকে সাথী

অভিমন্যু আছে সেখানে নিশ্চিন্ততার শান্তি আছে। চঞ্চলার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারলে মঞ্জরী নিজেকে নিয়ে যা খুশি করবে। রসাতলেই যখন যেতে বসেছে, নিরঙ্কুশগতিতেই যাবে। তারপর? তারপর বনলতার মতো প্রচুর টাকা নিয়ে পুরনো পরিবেশের আশে-পাশে গিয়ে দু'হাতে হরির লুঠ দেবে সেই টাকা। দেখবে তার পুরনো আত্মীয় বন্ধুরা তাকে কোথায় বসতে দেবে ভেবে দিশেহারা হয় কি না।

লজ্জা আর আনন্দের আবীর-ছড়ানো মুখ নিয়ে, আর নিজেকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে নিয়ে চঞ্চলা চলে গেলো—সুরেশ্বরের সঙ্গে। কেমন যেন দিশেহারার মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো মঞ্জরী।

সামান্য ক'টা দিনের মধ্যে কতো অভাবিত ঘটনাই ঘটে গেলো! অভিমন্যুর দেখা পাওয়া গেলো, চঞ্চলা পথে হারিয়ে গেলো, আবার সেই হারানোর সূত্র ধ'রে চঞ্চলার জীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার এক নতুন অধ্যায় যোজনা হলো, অজানা অচেনা এক ব্যক্তি যেন চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল চঞ্চলাকে—মঞ্জরী প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গেলো!

এ কী অঘটন!

কিন্তু আরো কত অভাবিত ঘটনা তার জন্যে অপেক্ষা করছে, সে কথা কি মঞ্জরী ভাবতেই পারছে?

সত্যকার মানুষের সত্যকার জীবনকাহিনী যে রংচড়া উপন্যাসের

জনম্ জনমকে সাথী

চাইতেও চড়ারঙের হতে পারে, একথা বিশ্বাস করে ক'জন? উপন্যাসের কাহিনীতে অভাবনীয়ের সমাবেশ দেখলেই মুচ্‌কি হেসে বলে,—'কষ্টকল্পনা', বলে—'যথেচ্ছ ঘটনা বিন্যাস।'

চঞ্চলা ফিরে এলো খুসিতে টলমল।

'বেড়াতে যাওয়া-টাওয়া নয় ছোটমাসী, মার্কেটিং করতে যাওয়া হয়েছিলো। তত্ত্বর জিনিসগুলো যাতে আমার পছন্দসই হয়—'

ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলে লজ্জায় চুপ ক'রে গেলো চঞ্চলা।

'ওর বুঝি কেউ কোথাও নেই?'

মঞ্জরীর কণ্ঠে কুটিল হিংসা। চঞ্চলা অবশ্য এতো ধরতে পারেনা, তেমনি লজ্জা-মাখানো স্বরে বলে, 'থাকবেনা কেন? তাদের তো খবর দেওয়া হয়েছে। তারা না কি আমাদের নিতে আসবে। কলকাতায়—মানে, ব্যারাকপুরে ওদের বাড়ীতে গিয়েই সব হবে। তারা না কি বলে—ও বিয়ে করলেই তারা কৃতার্থ হবে, বামুনের মেয়ে হোক্ চাই না হোক্। তা আমি তো তবু—'

'তুমি তো বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে—' বিষ হিংসার তিক্তস্বর মঞ্জরীর কণ্ঠে, 'এ জানতে পেলে তারা ঘরে নেবে?'

ভয়ে আশঙ্কায় পাংশু হয়ে গেলো চঞ্চলার খুসিটল্‌টলে মুখটা, তেমনি ভয়ে-ভয়েই বললো, 'আমি তো শুধু তোমার সঙ্গে চলে এসেছি—'

মঞ্জরী এতো নীচ হয়ে যাচ্ছে কেন? চঞ্চলার—তার নিতান্ত স্নেহপাত্রী বেচারা চঞ্চলার—খুসি টল্‌টলে মুখ দেখে ওর বুকের ভিতর এমন জ্বালা ধরছে কেন? সেই জ্বালার জ্বালাতেই না ওকে আবার বলতে হচ্ছে, 'তাতে কি? আমি তো ভালো মাসী নই? আমি তো খারাপ। মদ খাই, সিনেমা করি—আমার সঙ্গে চলে আসা মানেই খারাপ হয়ে যাওয়া—নষ্ট হয়ে যাওয়া—'

চঞ্চলা এবার মুখ তুলে সবেগে বলে, 'কক্‌খনো নয়! ও বলে, মানুষ কক্‌খনো নষ্ট হয়না। তোমাকে ও কিচ্ছু ঘেন্না করেনা, বলে—'

জনম্ জনমকে সাথী

'থাক্, আমাকে ও কি বলে তা শোনবার আমার দরকার নেই—' ব'লে পাশের ঘরে চলে গেলো মঞ্জরী। আর চলে গিয়েই ওর নিজের কাছে নিজের মনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ছি ছি, চঞ্চলাকে কি সে ঈর্ষা করছে? চঞ্চলার জীবন সার্থক হয়ে উঠছে, সুন্দর হয়ে উঠছে, এতে সে খুশী হতে পারছেনা? এতো নীচ হয়ে গেলো মঞ্জরী? এ কী হলো!

অনেকক্ষণ চুপিচুপি কান্নার পর মঞ্জরী আবার সোজা হয়ে বসলো। চুলচেরা বিশ্লেষণে আপন মনকে যাচাই ক'রে দেখে দেখে শান্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবলো—হিংসে নয়, হিংসে নয়, এ জ্বালা 'মন কেমন'-এর শূন্যতার।

চঞ্চলা তো কেবলমাত্র তার একটি স্নেহপাত্রীই নয়, চঞ্চলা যে মঞ্জরীর ফেলে-আসা জীবনের—সেই পবিত্র সুন্দর সত্যকার জীবনের—এককণা চিহ্ন, আজকের এই মূল-উৎপাটিত গ্লানিকর জীবনের মাঝখানে এক টুক্‌রো মাটির শিকড়। সেই শিকড়টুকুও ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওরা, তাই না এই হাহাকার!

বিরহের আশঙ্কা তো প্রিয়পাত্রকেই আঘাত হানতে চায়।

মনে পড়লো চঞ্চলার পাংশু হয়ে যাওয়া মুখখানা, বুকটা টন্‌টন্ ক'রে উঠলো। উঠে গিয়ে সহজ ভঙ্গিতে বললো, 'উঃ, কী মাথাটাই ধরেছে। কই রে চঞ্চল, কি মার্কেটিং করলি শুনি?'

জনম্ জনমকে সাথী

মঞ্জরী এখানে একটি কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এসেছে, আর কারো তার উপর হাত বাড়াবার উপায় নেই, তাই কলকাতার জীবনের চাইতে এখানে

অবসর বেশী, কিন্তু সে অবসর পঙ্কিল হয়ে ওঠে অনুরাগী ভক্তবৃন্দের অনুরাগ-প্রাবল্যে।

ঝড়ে-ওড়া দিনগুলোর মাঝখানে হঠাৎ একদিন খবরটা ধাক্কা দিলো। চঞ্চলাকে আজ নিয়ে যাবে ওরা। সুরেশ্বরের বাড়ীর সরকার এসেছে না কি, এসেছে বুড়ো ঝি। খবরটা সুরেশ্বরই আনলো। আরো দু'তিন দিন এসেছিলো সুরেশ্বর, দেখা হয়নি মঞ্জরীর সঙ্গে, আজ আবার এলো সকালবেলা। বললো, 'আপনার সঙ্গে আরো অনেক আলাপ করার ইচ্ছে ছিলো, কিছুতেই সুবিধে হলোনা, আপনি দুর্লভ ব্যক্তি। কিন্তু মনে করবেন না, এইখানেই ইতি। আমার পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তবে এ-যাত্রায় আপনার কাছে আমার ভূমিকা দুর্বৃত্তের। কন্যাহরণের পালার ভিলেন।'

মঞ্জরী হাসলো। সমাদর ক'রে বসালোও। বললো, 'জীবনে দুর্বৃত্তের ভূমিকাই অধিকাংশের ভাগ্যে জোটে।'

'সেটাই জীবনের পরীক্ষা।'

'তা হবে। বসুন, চা দিতে বলি। ওঃ, না—খাবেন তো আমার বাড়ীতে?'

সুরেশ্বর গম্ভীরমুখের ভূমিকা ক'রে বললো, 'শুধু চা হ'লে খাবোনা, তার সঙ্গে উত্তম ফলারের আয়োজন থাকলে খেতে পারি। অবশ্য শুধু উত্তম। উত্তম-মধ্যম নয়—' বলেই সে কী হাসি!

চোখ জুড়িয়ে যায় মঞ্জরীর, আবার আনন্দে চোখে জলও এসে যায় বুঝি—কী চমৎকার ছেলে! কী নির্মল হাসি! ছোট্ট চঞ্চলা, বোকা চঞ্চলা—সুখী হোক্, সুখী হোক্। ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলো অতিথিসৎকারের চেষ্টায়। চঞ্চলা লজ্জায় পাশের ঘরে ব'সে আছে।

খেতে খেতে সুরেশ্বর প্রশ্ন করলো, 'এখানের

মেয়াদ আপনার আর ক'দিনের ?'

'চিরদিনেরও হতে পারে—' মঞ্জরী উত্তর দেয়।

'অসম্ভব! বাংলার মেয়ে বাংলা ছেড়ে এখানে প'ড়ে থাকবেন কি দুঃখে ?'

'আমার কাছে বাংলা বেহার বোম্বাই মধ্যপ্রদেশ সবই সমান। পৃথিবীর যে-কোনো এক কোণে ঠাঁই পেলেই হলো। কিন্তু আমার কথা থাক্, আপনার কথাই শুনি। ব্যারাকপুরে বাড়ী আপনাদের ?'

'হ্যাঁ। ওইখানেই বীরভদ্র এক বাড়ী গেড়ে রেখেছেন বাবা, খোলা-মেলা ব'লে। কিন্তু যার জন্যে সক্কালবেলাই এলাম সেটা তো বলা হলোনা! আমাদের বাড়ী থেকে পিসিমা সরকারমশাইকে আর পুরনো ঝিকে পাঠিয়েছেন ভাবী বধূকে নিয়ে যেতে। আমার মতিগতি তো তাঁরা জানেন, হঠাৎ বিয়ের সংকল্প ক'রে ফেলেছি—এতেই ভীষণ খুশী, আবার পাছে মত বদলায় তাই তাড়াহুড়ো। চঞ্চলাকে নিয়ে যেতে হয় তাহ'লে ?'

'এখনই ?' চম্‌কে ওঠে মঞ্জরী।

সুরেশ্বর কুণ্ঠিত হলো। লজ্জিত হয়ে বললো, 'কিন্তু আমার তো সারাদিনে আর সময় হয়ে উঠবেনা—'

'গাড়ী তো রাত্রে ?'

'তা অবশ্য।'

'আমি যদি স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি আপত্তি আছে ?'

'আপত্তি ? কী আশ্চর্য্য ? কিন্তু আপনার কি সময় হবে ?'

জনম্ জনমকে সাথী

'সেটা আমার বিবেচ্য। বিশ্বাস রাখতে পারবেন তো আমার উপর ?'

'বিশ্বাস মানে ?'

'ধরুন যদি শেষ মুহূর্ত্তে ওকে লুকিয়ে ফেলি,

আপনাকে না দিই।'

সুরেশ্বর ওর মুখের দিকে স্বচ্ছদৃষ্টি তুলে নিশ্চিন্তভাবে বলে, 'সে আপনি পারবেন না।'

'পারবো না?'

'না।'

সারাদিন ধ'রে মঞ্জরীও কেনাকাটা করলো প্রচুর। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ উজাড় ক'রে দিতে চায় বুঝি উপহার-সামগ্রীর মাধ্যমে। বোঝাই হয়ে উঠলো প্রকাণ্ড তিনটে নতুন স্যুটকেস।

কিন্তু স্টেশনে অভিমন্যুও থাকতে পারে—পারে কেন থাকবেই, এ ধারণা কি ছিলোনা মঞ্জরীর? অমন চম্‌কে উঠলো কেন? তাহ'লে অভিমন্যুকে দেখে?

লোক···লোক···লোকে লোকারণ্য।

'ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে'র ভিড় নিত্যই রথযাত্রার ভিড়। বড়ো-বড়ো স্টেশনগুলো যেন সমগ্র পৃথিবীর এক-একটি ছোট ছোট নমুনা।

সেখানেও যেমন জন্ম-মৃত্যুর ট্রেনে চেপে ইহলোক আর পরলোকে বিরতিহীন যাওয়া আসা, এখানেও তাই। সেখানেও মাঝের সময়টায় কুতো না ঠেলাঠেলি ছুটোছুটি চেঁচামেচি, নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠে পড়তে পারলেই ব্যস, সব ঠাণ্ডা,—এখানেও অনেকটা তেমনি।

ফোর বার্থের একটা কামরা রিজার্ভ করা ছিলো, ভিড় ঠেলে কোনোরকমে একবার নামের স্লিপ্‌টা দেখে নিয়ে উঠে প'ড়ে ব্যস, নিশ্চিন্ত।

জনম্ জনমকে সাথী
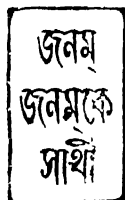
চঞ্চলা কেঁদে ভাসাচ্ছে। ছাড়বেনা মঞ্জরীকে।

মঞ্জরী ওকে কাছে টেনে নিয়ে ব'সে আছে চুপচাপ। কথায় সান্ত্বনা ওর আসেনা। তাছাড়া জানে এ কাজ সাময়িক, ট্রেন ছাড়ার পরেই আবার মুখে হাসি ফুটবে। চঞ্চলার মতো হাল্‌কা মেয়েরা, যে মেয়েরা জীবনে সুখী হতে জানে, তারাই এইরকম সহজে কেঁদে ভাসাতে পারে, সহজেই হেসে কুটিকুটি হতে পারে।

অভিমন্যুর সঙ্গে মুহূর্তের জন্য একবার চোখোচোখি হয়েছিলো, ট্যাক্সি থেকে নেমেই। চম্‌কে উঠেছিলো মঞ্জরী। কিন্তু চম্‌কাবার কি সত্যিই কোনো কারণ ছিলো?

এ ঘটনাটা কি অপ্রত্যাশিত?

সকাল থেকে সারাদিন ধ'রে এই মধুর আশাটুকুই কি মনের মধ্যে লালন করছিলো না মঞ্জরী?

চঞ্চলাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবের মধ্যেও কি এই উন্মাদনাকর চিন্তাটা পাক খেয়ে মরছিলো না মাথার মধ্যে? এই চিন্তা নিয়েই তো অদ্ভুত একটা বিহ্বলতার মধ্যে কেটেছে সারাটা দিন।

এখানে পালিয়ে যাবার প্রশ্ন নেই।

অভিমন্যু আর সুরেশ্বর প্লাটফর্মে পায়চারি করছে। গাড়ী যতোক্ষণ না ছাড়ে, চঞ্চলা যতো পারে বিদায় নিক্ মাসীর কাছে।

অভিমন্যু কি ভাবছে বোঝার উপায় নেই, পুরুষ-মানুষরা বড়ো বেশী চাপা। ওদের চোখে-মুখে হৃদয়ের ব্যাকুলতা চট্ ক'রে ধরা পড়েনা।

মঞ্জরী ভাবছিলো, গাড়ী ন'ড়ে ওঠার পর তো

আর প্লাটফর্মে ঘুরবে না ওরা? কিন্তু মঞ্জরী যদি নামতে ভুলে যায়? ওরা কি সে ভুলের সংশোধন করতে ইতস্ততঃ করবে না? ওরা কি বলবে, 'যাও, এবার নেমে যাও তুমি, আর থাকবার অধিকার তোমার নেই। তোমার টিকিট নেই। সহজ জীবনের চলার পথের টিকিট তুমি হারিয়ে ফেলেছো।'

ওয়ার্নিং বেল পড়লো।

চাঞ্চল্য দেখা দিলো প্লাটফর্মে।

মঞ্জরী চঞ্চলার হাতটা নিজের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সস্নেহকৌতুকে বললো, 'অমন সুন্দর বর পাচ্ছিস্, বড়োলোক শ্বশুরবাড়ী পাচ্ছিস্, কেঁদে আকুল হচ্ছিস্ যে?'

'তুমিও চলো ছোটমাসী।'

'আমি? আমি কোথায় যাবো রে? তোর ঝি হয়ে?' হেসে ওঠে মঞ্জরী। ওর মনে হয়, ও যেন আগের মঞ্জরীই আছে। সাধারণ গৃহস্থবধূর মতোই নিকটআত্মীয়দের স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে বিচ্ছেদব্যাকুল স্নেহাতুর হৃদয় নিয়ে। হাসিঅশ্রুর মেঘরৌদ্রে বিচ্ছেদ ক্ষণ মধুর ক'রে তুলে বাড়ী ফিরবে। বাড়ী ফিরে যেন আলমারি খুলে মদের বোতল বার করবেনা, মাতাল হয়ে মাটিতে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদবেনা, কালই আবার চোখে সুর্মা টেনে ঠোঁটে রং মেখে শালীনতার মাথায় কুঠারহানা পোষাক প'রে স্টুডিওয় গিয়ে হাজির হবেনা।

ও যেন চিত্রতারকাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারকা নয়, ও শুধু মঞ্জরী।

জনম্ জনমকে সাথী

কিন্তু এ সুখস্বপ্ন কতোটুকুর জন্যেই বা।
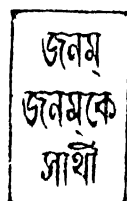
চঞ্চলা নীচু হয়ে প্রণাম করলো। নেমে যাবার সঙ্কেত। তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হলো মঞ্জরীকে। আর তারপর—গাড়ী নড়ে ওঠার পর ধীরেসুস্থে উঠলো ওরা।

অভিমন্যু আর সুরেশ্বর।

মঞ্জরীর সঙ্গে কি মুহূর্তের জন্য চোখোচোখি হয়নি অভিমন্যুর? হয়েছিলো। বোধহয় হয়েছিলো।···কিন্তু অভিমন্যুর সে চোখে কি কোনো ভাষা ছিলো? না সে শুধু পাথরের চোখ?

পাথরের চোখে প্রাণের বাণী ধরা পড়েনা।

কিন্তু পাথরের চোখ কি এমন বিষণ্ণ-কোমল হয়?

বৃহৎ অজগরের দেহখানা যেন খোলস ছেড়ে শন্‌শন্ ক'রে এগিয়ে গেলো, গতি তার দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে লহমায় লহমায়। মঞ্জরী মাথা নীচু ক'রে জনতার সঙ্গে এগিয়ে চলে শ্লথগতিতে। আর কিছু ভাবছেনা, শুধু ভাবতে ভাবতে চলেছে, কতোখানি সাহস থাকলে ট্রেনের চাকার তলায় পড়া যায়। কতো লোকই তো পড়ে এমন।

মঞ্জরীর সাহস বড়ো কম।

সাহস হলোনা বিনা টিকিটে জোর ক'রে গাড়ীতে ব'সে থাকবার, সাহস হলোনা গাড়ীর চাকার তলায় ঝাঁপিয়ে পড়বার। শুধু সাহস ক'রে একখানা ট্যাক্সিতে চ'ড়ে বসতে পারলো, যার চালকটাকে দেখলেই ভয় করা উচিত।

তা ভয়ই কি করেছিলো ওর?

নইলে বাড়ী ফিরেই পাগলের মতো অমন উর্দ্ধশ্বাসে

দৌড় মারলো কেন সিঁড়ি ধ'রে ? ভয়ই যদি হলো তো ছুটে গিয়েই ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে অমন হাসতে লাগলো কেন ? তীব্র হাসি, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে-আসা হাসি।

এ হাসিকে ভাষায় রূপান্তরিত করলে বোধহয় এই দাঁড়ায়, 'আর কেন ? আর কিসের আশা ? সবই তো শেষ হয়ে গেলো ?'

অথচ কিসের আশা ?

শুধু আর-একবার দেখা হওয়ার আশা ? হয়তো তাই—শুধু সেই আশাটুকুর মধ্যেই অচেতন চেতনায় তিল তিল ক'রে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো আরো অনেকখানি আশা। অজ্ঞাতসারে বুঝি গ'ড়ে উঠেছিলো অবুঝ এক আশ্বাস।

একবার দেখা হলেই বুঝি আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। খুলে পড়বে মঞ্জরীর এই কুৎসিত ছদ্মবেশ, বাতাসে উড়ে যাবে ভুলবোঝার বোঝা।

কিছুই হলোনা।

কিছুই হলোনা।

অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা হলো, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। বাতাসে মিলিয়ে গেলো সেই পরম ক্ষণ। ধূলোয় উড়ে গেলো স্বপ্নপ্রাসাদের গাঁথনি। পৃথিবী যেমন চলছিলো তেমনিই চলতে থাকলো, মঞ্জরী যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো।

শেষ হবার আর বাকী কি থাকলো তবে ?

হাসতে হাসতে কাঁদতে সুরু করলো মঞ্জরী। আথালি-পাথালি কান্না। খাটের বাজুতে মাথা ঠুকে ঠুকে কান্না।

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো

মঞ্জরী। খাট থেকে নেমে দেয়ালের গা-আলমারিটা টেনে খুলে ফেললো।

বোম্বাইয়ের বাজারে মদ নিষিদ্ধ হয়ে গেলেও, যাদের দরকার তাদের ঘরে ঠিকই মজুত আছে।

দরকার ?

দরকার বৈ কি। নিজেকে বিস্মৃত হয়ে থাকবারও তো দরকার থাকে মানুষের ? ক'দিন আগে ভেবেছে, 'আর নয়'। আজ ভাবলো 'এখনি চাই।'

যাক্ যাক্, সবই যাক্! কিছুই যদি রইলোনা, কিছুই বা রাখবার চেষ্টা কেন ? তরল খানিকটা আগুন ঢেলে যদি দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে-থাকা আগুনের জ্বালা শান্ত হয়, মন্দ কি ? বিষে বিষক্ষয় হোক্!

এ কি হলো!

এ যে একেবারে খালি! দু'টো বোতল একে একে উপুড় ক'রে ঝাঁকুনি দিয়ে দেখলো, একফোঁটা নেই। সবটা কখন্ ফুরোলো ? না না, মঞ্জরী শেষ করেনি।

নির্ঘাৎ ওই হতভাগা চাকরটার কাজ। চুরি করেছে, চুরি ক'রে চড়াদামে বেচেছে!

পর পর দুটো বোতল ছুঁড়ে ছুঁড়ে আছড়ে মারলো। ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়লো কাঁচের টুক্‌রো।

জনম্
জনমকে
সাথী

শব্দে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো উর্দ্দিপরা ভৃত্য কেশবন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এ-ঘরে এমন দৃশ্য দেখেনি এর আগে।

'নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও, ডাকু বদমাস্ চোট্টা!'

ছড়ানো কাঁচের টুক্‌রোর উপরই শুয়ে পড়লো মঞ্জরী, মদ না খেয়েও বেহেড্‌ মাতালের মতো।

* *　　　* *　　　* *

ক্লান্তমুখে স্নিগ্ধহাসি হেসে অভিমন্যু বললো, 'এবারে হে বন্ধু, বিদায়!'

সুরেশ্বর শশব্যস্তে বললো, 'তার মানে? এখুনি বিদায় কি? শুভকাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত এখান থেকে একটি দিনের জন্যে বেরোন দিকি?'

'শুভকাজ?' অভিমন্যু হাসলো। 'সে তো তোমার সেই পঞ্জিকার করুণার উপর নির্ভর! তোমার পিসিমার কাছে যে শুনলাম, তার এখনো দিন-পনেরো দেরী।'

'সে ক'টা দিন আমাদের সংস্পর্শে থাকা কি এতোই কষ্টকর?'

'কী পাগল! আমি যে এখানে থাকছিই না! মানে, এদেশে।'

'এদেশে থাকছেন না, কোথায় যাচ্ছেন?'

'আরে ভাই, অনেকদিন থেকেই বাসনা ছিলো, পৃথিবীর ও-পিঠটা কেমন একবার দেখে আসি। সাধই ছিলো, সাধ্য তো ছিলোনা? তাই চেষ্টায় ছিলাম য়াতে ওদের পয়সাতেই ওদের দেশ ঘুরি। সাতঘাটের জল একঘাটে ক'রে অনেক রকম দরখাস্ত ঝেড়ে বসেছিলাম নিশ্চিন্ত হয়ে, হবেনা জেনেই। হঠাৎ দেখছি জবাব এসে গেছে নিয়োগপত্র সমেত। অতএব আগামী সপ্তাহেই রওনা।'

হাসি-হাসিমুখে অভিমন্যু যেন ফাঁসির বার্ত্তা শোনায় সুরেশ্বরকে।

'নিয়োগপত্র? তার মানে, আপনি ভারত ছেড়ে একেবারে অ্যামেরিকায় যাচ্ছেন চাকরি করতে?'

'আরে দূর, অতো-বড়ো ব্যাপার কিছু না। বছর-তিনেকের মেয়াদ, সামান্য একটা লেক্‌চারারের পোষ্ট, প্রায় স্টুডেন্টস্ স্কলার-শিপেরই সমগোত্র, প্যাসেজ খরচা দেবে, আর থাকা-খাওয়ার জন্যে মোটামুটি একটা সংখ্যা। তাও আমাদের পুরনো কলেজের প্রিন্সিপ্যালের চেষ্টাতেই হলো—আমার আর কি ক্যাপাসিটি আছে?'

সুরেশ্বরের বোধকরি এই আচম্‌কা খবরটা কিছুতেই ধাতস্থ হতে চায়না, বলে, 'কবে কখন্ আপনার সেই নিয়োগপত্র এলো শুনি? আমি তো আজ মাস-চারেক আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'

'প্রিন্সিপ্যালের বাড়ীতে এসে প'ড়ে ছিলো দিন-পাঁচেক। কাল তোমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিলাম না? সোদপুরে ওঁর বাড়ীতেই গিয়েছিলাম। ছট্‌ফট্ করছিলেন ভদ্রলোক, খুব ধমক দিলেন বেহুঁশ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে। বললেন, "অবিলম্বে পাসপোর্ট করিয়ে নাও"।'

সুরেশ্বর তবু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে, 'কই, দেখি আপনার সেসব কাগজপত্র?'

'না দেখালে বিশ্বাস করবেনা?'

'উঁহু!'

জনম্ জনমকে সাথী

'আচ্ছা দেখাবো। জানি তুমি আর চঞ্চলা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু আমিও জানতাম না এটা এতো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আদৌ হবে কি না তাইই জানতাম না।'

সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলে, 'আমরা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হবো? তা ভালো! আমার আশা ছিলো, কন্যা সম্প্রদান আপনিই করবেন।'

'এই ত্যাখো। বন্ধু আছো এই তো বেশ। জামাই হচ্ছো তাও মন্দ না, কিন্তু অতো পাকাপাকি শ্বশুর হতে চাইনা।'

'তাহ'লে নিশ্চিত থাকছেন না সে সময়?'

'তা একরকম নিশ্চিতই।'

'তাহ'লে যে ক'টা দিন ভারতবর্ষের মাটিতে আছেন, আমাদের কাছেই থাকুন।'

'নিতান্তই থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ। রওনা দেবেন কোন্ পথে? জলে না অন্তরীক্ষ্যে?'

'অন্তরীক্ষ্যের খবরটাই তো বরাদ্দ করেছে শুনছি।'

সুরেশ্বর মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে বলে, 'অভিমন্যুদা, একটা কথা বলবো?'

'অতো ইতস্ততঃ কিসের?' হাসলো অভিমন্যু।

'বলছিলাম—' কুণ্ঠা ছেড়ে সুরেশ্বর বলে, 'হার মেনে পালিয়ে যাচ্ছেন তাহ'লে?'

ঈষৎ কেঁপে ওঠে অভিমন্যু, তারপর ম্লানহাসি হেসে বলে, 'পৃথিবীতে এসে ক'জন আর জয়গৌরব অর্জ্জন ক'রে যেতে পারে বলো? কেউ হার মেনে পালায়, কেউ মার খেয়ে পালায়।'

'কথা এড়াবেন না অভিমন্যুদা। আমি অতো কথার আর্ট বুঝিনা। আমি স্পষ্ট প্রশ্নের মানুষ। বৌদিকে যদি না দেখতাম, এ প্রশ্ন করবার কোনো দরকারই হতোনা আমার। কিন্তু তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এবং সেই থেকেই এ প্রশ্ন আমার মনে

জেগে আছে। আজ আপনার দেশছাড়ার সংকল্পে অবাক হয়ে ভাবছি, তাঁকে তাহ'লে সম্পূর্ণ ত্যাগই ক'রে যাচ্ছেন?'

অভিমন্যু শান্তগলায় বললো, 'ত্যাগ আর গ্রহণের প্রশ্ন তো অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে সুরেশ্বর।'

'না হয়নি।' জোর দিয়ে ব'লে ওঠে সুরেশ্বর, 'মানুষ কি এতোই সস্তা জিনিস অভিমন্যুদা, যে সহজেই ছড়িয়ে ফেলে দেওয়া যায়? আমি তো দেখলাম, তাঁকে ফেলে দিলে লোকসান হয়না এমন মেয়েও তিনি নন। তার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা না ক'রে বিনা দ্বিধায় এমন ক'রে চলে যেতে আপনার বাধবে না?'

অভিমন্যু হতাশভাবে বলে, 'এখন আর আমার করবার কি আছে বলো সুরেশ্বর? সে চলেছে, তার পথে, দুরন্ত তার গতি। সে পথ থেকে টেনে আনি এ ক্ষমতা আমার নেই। তাই বেছে নিলাম নিজের বাঁচবার পথ।'

'তাকেও বাঁচাও? ধ্বংসের পথ থেকে জোর ক'রে টেনে এনে বাঁচাও।'

'সে কি আর হয় রে পাগ্‌লা।'

সুরেশ্বর গম্ভীরভাবে বলে, 'স্নেহ' 'প্রেম' 'মমতা' 'ক্ষমা' এসব শব্দগুলো কি তাহ'লে অর্থহীন শব্দ মাত্র অভিমন্যুদা? না— সমাজ-ব্যবস্থার থার্মোমিটারের পারা? ব্যবস্থার তাপমাত্রা অনুসারে ওঠে নামে? আমাদের সমাজে তো পুরুষের সহস্র ভুলও ক্ষমার্হ, মেয়েরা মুহূর্তের অসতর্কতায় বাতিল। চিরকাল এই ব্যবস্থাই চলতে থাকবে তাহ'লে? এ ব্যবস্থা যে পুরুষজাতির কতো-বড়ো লজ্জার স্মারক এ কি আমরা কোনোদিন ভেবে দেখবো না? মেয়েদের অপরাধের

জনম্ জনমকে সাথী

কড়া শাস্তি বিধান দিয়ে যারা পুরুষের অপরাধ ক্ষমা করার নির্দ্দেশ দিয়েছে, কোন্ সেই শাস্ত্রকারেরা ? আমার তো মনে হয় অভিমন্যুদা, নির্ঘাৎ তারা মহিলা। নইলে কখনো এমন ক'রে পুরুষের গালে অপমানের চুনকালি মাখাতে পারতো না। অথচ এখনো সেই চুনকালি মেখেই ব'সে থাকবো আমরা ?'

অভিমন্যু ধীরে ধীরে বলে, 'হয়তো আর থাকবো না সুরেশ্বর। হয়তো ব্যবস্থার সাম্য আসবে। এক-একটা যুগের প্রয়োজনে এক-এক রকম আইন সৃষ্টি হয়, আর পরবর্ত্তীকালের পরিবেশে যতোক্ষণ না সে আইন নিতান্ত অচল হয়ে ওঠে, ততোক্ষণ চলতেই থাকে। বিকৃত বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি নিয়েও টিকে থাকবার চেষ্টায় মাটি কামড়ে থাকে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আজ সেই মূর্ত্তি, বিকৃত বিকলাঙ্গ। আজ একে কেউ অস্বীকার ক'রে ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে, কেউ টিট্‌কিরি দিয়ে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে, আর কেউ পূর্ব্বপুরুষের ঐতিহ্যের ধারক ভেবে সযত্নে আগ্‌লে ব'সে আছে। কিন্তু এ দিন আর বেশীদিন নয়। যুগের প্রয়োজনে আবার নতুন আইন সৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে।'

'তবে আপনি কেন সেই নতুন যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলবেন না অভিমন্যুদা ?'

অভিমন্যু একবার জানলার বাইরে তাকালো।

বাইরে অপরাহ্ণ-বেলা স্তিমিত হয়ে আসছে সন্ধ্যার কাছে আশ্রয় নেবে ব'লে। সামনে একটা অজানা গাছের পাতা কাঁপছে হাল্‌কা হাওয়ায়।

সেইদিকে তাকিয়ে অভিমন্যু বলে, 'সেইখানেই তো হার মানলাম সুরেশ্বর। আমার নিজের মনকে যাচাই ক'রে ভেবে দেখেছিলাম, সেখানে মেনে নেওয়া শক্ত

জনম্
জনমকে
সাথী

ছিলোনা, কিন্তু আমার মা? আমার সমগ্র পরিবার? তাদেরই বা আমি দুঃখ দিই কেমন ক'রে? মমতার জালে যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আমরা সুরেশ্বর।'

সুরেশ্বর অনমিত স্বরে বলে, 'কেউ যদি অন্যায় দুঃখ পায় অভিমন্যুদা, তার হাত থেকে কে তাকে বাঁচাবে? আজো যারা জীবনকে পুরনো দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাইবে, দুঃখ তো তারা পাবেই। একসময় আমাদের সমাজে মেয়েদের গান গাওয়াও নিতান্ত গর্হিত নিন্দনীয় ব্যাপার ছিলো। আজ সেকথা হাস্যকর। নৃত্য অভিনয় এসবও তেমনি করেই জায়গা দখল করবে, করছে।'

অভিমন্যু মৃদুস্বরে বলে, 'জানি। সমাজ ক্রমশঃ এদের পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, তবু তার মাঝখানে এই সংঘর্ষে কিছু প্রাণ, কিছু সুখ, বলি যাবেই।'

'এ হচ্ছে নিশ্চেষ্টবাদ।'

'হবে তাই।'

'উড়িয়ে দিলে চলবেনা। আপনি তো আত্মীয়সমাজ ছেড়ে পৃথিবীর ও-পিঠের উদ্দেশে যাত্রা করছেন অভিমন্যুদা, তবে কেন—'

অভিমন্যু হেসে ফেলে বলে, 'কেবলমাত্র আমার দিকটাই দেখছো কেন? আরো একটা দিকও তো আছে? সে দিকেও ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন আছে।'

'ওইখানেই তো আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছেনা অভিমন্যুদা। আমি যদি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, বাধা দেবেন না আপনি? চঞ্চলা যদি বিষ খেতে চায়, দেবেন খেতে? তবে? যে আপনার সবথেকে স্নেহের, আর যার ওপর কর্ত্তব্যের দায় সবচেয়ে বেশী, তাকেই ঠেলে দেবেন যথেচ্ছাচারের পথে?'

'এখানে যে সাবালিকা-নাবালিকার প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে হে।'

'এ সমস্তই আপনার লোক-ঠকানো এড়িয়ে-যাওয়া কথা' ব'লে রাগ ক'রে উঠে যায় সুরেশ্বর।

কিন্তু সে রাগ রাখতে পারেনা।

আবার তর্ক তোলে রাত্রে ঘুমের আগে।

হাসিখুসি হাল্কা মানুষটা, কিন্তু কথা বলে যখন, চিন্তাশীলের মতোই মনে হয়। অভিমন্যুর প্রতিবাদ কম, কণ্ঠ মৃদু। সুরেশ্বর একাই বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকে—'মানুষ জিনিসটা কি এতোই সস্তা অভিমন্যুদা, যে একটু ময়লা ধরলেই রিজেক্ট করা চলে? ...আজকের যুগেও কি আমাদের জীবনবোধ, আমাদের সত্যবোধ, অতীতের অন্ধকারে পথ হাত্ড়ে মরবে? ...মানুষ যে একটা মূল্যবান জিনিস, এই ছোট্ট কথাটুকু বুঝতে শিখলেই পৃথিবীর অনেক সমস্যা সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।' বলে, 'যে যুগ আমাদের দরজায় এসে পৌঁছেছে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় কোথা? যে সভ্যতাকে আমরা আমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, তার দায় পোহাতে পারবো না বললে চলবে কেন?'

অভিমন্যু বলে, 'ছাখো সুরেশ্বর, মানুষ জিনিসটা সমাজের অংশ মানি, কিন্তু কেবলমাত্র সমাজের এক-একটি টুক্রো নয়। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিজীবন ব'লে সম্পূর্ণ একটা জিনিস আছে, সেই ব্যক্তিজীবনকে নিয়েই আমাদের আসল কারবার। সেখানেই প্রকৃত মূল্য নিরূপণ।'

সুরেশ্বর রেগে বলে, 'আপনি তো হিন্দুশাস্ত্র খুব মানেন, এ-কথা মানেন না, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের?'

জনম্
জনমকে
সাথী

'স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা জন্মজন্মান্তরের এ আমি মানিনা।'

'মানেন না?' চক্ষু কপালে তোলে সুরেশ্বর।

'না। তার কারণ হিন্দুশাস্ত্রে বহুবিবাহ প্রথারও সমর্থন আছে। ও আমি মানিনা। তবে এইটে আমি মানি সুরেশ্বর, জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক' যদি সত্যিই কিছু থাকে, তো সে হচ্ছে প্রথম প্রেম আর প্রথম প্রেমাস্পদের সম্পর্ক।' ব'লে মৃদুহেসে আবার বলে, 'অন্য জীবনেও যার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মনে হয় 'এই সেই।' যেমন চঞ্চলাকে দেখে তোমার।'

আর একটু হেসে থামলো অভিমন্যু।

'আপনাদেরও তো শুনেছি 'লাভ ম্যারেজ' হয়েছিলো। অবশ্যই প্রথম দেখায় মনে হয়েছিলো 'এই সেই।' তাহ'লে? সে 'লাভ'—লোকসানের খাতায় গেলো কেন? সে প্রেম ভেঙে পড়লো কি ক'রে?'

অভিমন্যু সেকেণ্ড-কয়েক চুপ ক'রে থেকে বলে, 'কোনো 'লাভ'ই কখনো লোকসানের খাতায় যায় না সুরেশ্বর। সত্যিকার ভালোবাসা কখনো ভেঙেও পড়েনা। শুধু প্রতিকূল পরিবেশে প'ড়ে হয়তো তার বাইরের চেহারাটা বদ্‌লে যায়। কিন্তু সে কি শেষ হয়ে যায়? আমি কি কখনো আর-কাউকে ভালোবাসতে পারবো?'

শেষের এই প্রশ্নটা স্তিমিত অন্যমনস্ক। প্রশ্নটা যেন সুরেশ্বরকে নয়, আপন আত্মাকে।

তবু সুরেশ্বর উত্তর দেয় রেগে রেগে, 'পারবেন না—এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারেন না অভিমন্যুদা। সেও পরিবেশের ওপর নির্ভর।'

জনম্ জনমকে সাথী

'হয়তো তাই। তবুও ভালোবাসার মধ্যে লোকসান ব'লে কিছু নেই। ধরো এই যে তোমার-

আমার ভালোবাসা। তুমি আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এতো ভালোবাসতে সুরু করলে। কিন্তু আজ যদি তোমার সঙ্গে আমার মতান্তর ঘটে, তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রে বসো, এ দিনগুলো তো ফিরিয়ে নিতে পারবে না? এ-দিনগুলো তো রইলো? এ তো অমূল্য। বাকী জীবনটা যদি তোমার সঙ্গে আর দেখা না হয়, কষ্ট হবে—যন্ত্রণা হবে, কিন্তু এ-জীবনটা হারিয়ে যাবেনা।'

অভিমন্যু তেমন সরবে টেবিল ঠুকে তর্ক করেনা বলেই হয়তো ওকে তর্কে হারানো যায়না। ওর কাছে 'বিশ্বাস'টাই একমাত্র সত্য।

সুরেশ্বরও অবশ্য হার মানেনা, কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছু হয়না।

অভিমন্যু স্বীকার করে—হ্যাঁ, সে ভুল করেছে, অন্যায় ক'রে ফেলেছে, মঞ্জরীর কল্যাণ-অকল্যাণের দায়িত্ব এড়ানো তার উচিত হয়নি, সে ভুলের খেসারতও দিয়েছে অনেক, কিন্তু সে ভুল শোধরাবার উপায় আর এখন নেই। বাকী জীবনের জন্যে নতুন ক'রে ছক্ কেটেছে অভিমন্যু। সে জীবনের পথ কর্ম্ম-তপস্যার।

কিন্তু মঞ্জরী যদি কোনোদিন নিজের ভুল বুঝে ফিরে আসতে চায়? আসার সে দরজা খোলাই রইলো, খোলাই থাকবে চিরদিন।

কেন? তাহ'লে অভিমন্যু তার খোলা দরজা আর খোলা মন নিয়ে নিজেই কেন এগিয়ে যাক্‌না? দেখিয়ে দিক মঞ্জরীকে সেই তপস্যার পথ।

'সে হয়না।' অভিমন্যু বলে।

সুরেশ্বর বলে, 'ভুল শোধরাবার পথ কখনো বন্ধ হয়না।'

অভিমন্যু হাসে।

জনম্ জনমকে সাথী
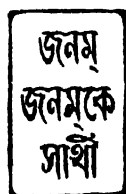
শোধরাবার পদ্ধতিতে সকলের সঙ্গে সকলের মিল থাকেনা।

অতএব একদিকে চলে বিয়ের তোড়জোড়, অপরদিকে প্রবাস-যাত্রার। অবশ্য অভিমন্যু তার নিজের বাড়ীতেই অবস্থান করে—যেখানে আশ্রয়স্থল কেবলমাত্র ভৃত্য শ্রীপদ।

* * * * * *

তিন মাসের মাইনে আর বাড়তি একশো টাকা মালতির হাতে গুঁজে দিয়ে বনলতা বললো—'তুই যদি বাড়ী চলে যেতে চাস্ তো কিছুদিন ঘুরে আয় মালতি। নয় তো যে ক'দিন অন্য কাজ খুঁজে না পাস্, চালাস্ এই দিয়ে।'

মালতি করুণ মুখ করুণতর ক'রে চোখ মুছলো।

'তুমি যে আমাকে সুদ্ধু জন্মের শোধ বিদেয় ক'রে দেবে, সঙ্গে নেবেনা, এ আমি ভাবতেই পারিনি দিদি! আমি কি অপরাধ করলাম?'

'তোর আবার অপরাধ কিসের!'—বনলতা বললো, 'তোকে বিদেয় না করলে "বনলতা রাক্ষুসী"কে যে কিছুতেই বিদেয় করতে পারবোনা রে! তুই তাকে ভুলতে দিবিনা, জীইয়ে রাখবি। তাহ'লে মথুরা বৃন্দাবন দ্বারকা রামেশ্বর যেখানেই যাবো, 'বনলতা' আমার সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করবে, আর দাঁত খিঁচোবে!'

মালতি চোখ মুছে মুছে লাল ক'রে ফেলে বলে, 'জানিনে দিদি, কিসে যে কি হলো হঠাৎ, কেউ কিছু তুক্‌তাক্ করলো কি না তাই বা বিশ্বাস কি! তোমার

কথাবার্ত্তাও যেন বুঝতে পারিনে আজকাল। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ কেন যে এই যৌবনে যোগিনী বেশ। এসব কি আর মানুষে এখন করে? তীর্থধর্ম্মের বয়েস কতো প'ড়ে আছে। সেই নতুন দিদিমণি—মঞ্জরীদিদি গো—তোমার আশ্রয়ে উঠে তোমার রাজ্যপাট দেখে হিংসেয় হিংসেয় ছু'দিনে কি বোলবোলাওটাই না ক'রে নিলো, আর তুমি কি না ইচ্ছে ক'রে সেই রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে, হাত শুধু ক'রে থান প'রে তীর্থবাসী হ'তে চললে? দেখে প্রাণে যে আর প্রাণ থাকছে না দিদি।'

বনলতা তাড়াতাড়ি বললো, 'দোহাই তোর, আর যা করিস্, প্যান্ প্যান্ ক'রে কাঁদিস্নে। চুপ কর্। আর এই হারছড়াটা নে, তোর মেয়েকে দিস্।'

থিয়েটারের ম্যানেজার মাথায় হাত দিয়ে ছুটে এলেন—'কী সর্ব্বনাশ। এ কী শুনছি। তুমি কি আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতে চাও বনলতা? তুমি চলে গেলে, থিয়েটার চালাবো কাকে নিয়ে?'

বনলতা হাসলো।

বললো, 'রাজা নইলে রাজ্য চলে, আর আমি নইলে আপনার থিয়েটার চলবে না? এক রাজা যাবে, অন্য রাজা হবে—'

'হবে। রাজা খুঁজে বার করতে আমার টাকের চুল ক'টা সব উঠে যাবে। আর ক'টা দিন পরেই যে আমাদের—"নব গৌরাঙ্গ"র চারশো নাইটের ফাংশান। অন্ততঃ এ ক'টা দিনও—'

বনলতা হাত জোড় ক'রে বললো, 'মাপ করবেন ম্যানেজার সাহেব, হয়তো বা আপনাদের ওই চারশো

জনম্ জনমকে সাথী
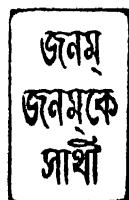
নাইটের হাত এড়াতেই পালাচ্ছি। আমরা অভিনেত্রীর জাত, আমাদের রক্তে নিত্যি নতুনের নেশা। রাত্রির পর রাত্রি, একই পালা, একই বঁধুর জন্যে বাসর সাজানো, এ আর সহ্য হচ্ছে না। হাঁপিয়ে উঠছি।'

ম্যানেজার আশ্বাসের সুরে বলেন, 'আহা, আর কি নতুন বই আসবেনা? এখনো লোকে এ-বই দেখতে এসে টিকিট পাচ্ছে না, ফিরে যাচ্ছে, তুলেই বা দিই কি ক'রে?'

'কি মুস্কিল। তুলে দেবেন কেন? কিন্তু আপনার নতুন বই আসতে ততোদিনে আমি আমার মরণ-বঁধুর বাসর সাজাতে বসবো কি না তাই বা কে জানে।'

ম্যানেজার এবার আশ্বাস ছেড়ে অবিশ্বাসের সুর ধরেন, 'শুধু এইজন্যে তুমি থিয়েটার-করা ছেড়ে দিচ্ছো বনলতা?'

'ছেড়ে দিচ্ছি কে বললে?' বনলতা মুচ্‌কি হেসে বলে, 'এও তো থিয়েটারই করতে চলেছি। এতোদিন আপনার স্টেজে বোষ্টুমীর পার্ট প্লে করছিলাম, এইবার আর-এক ম্যানেজারের স্টেজে বৈরাগিণীর পার্ট নিতে যাচ্ছি। এতোদিন আপনার গ্যালারির দর্শককে চোখ ঠেরেছি, এইবার নিজের মনকে চোখ ঠার্‌বো, এই তফাৎ।'

তথাপি ম্যানেজার অনেক হাত জোড় করলো, বনলতা আবার ডবল হাত জোড় করলো। শেষপর্য্যন্ত ভদ্রলোক মনে মনে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে ফিরে গেলেন। আর বনলতা কাগজ কলম জোগাড় ক'রে একটা চিঠি লিখতে বসলো।

জনম্ জনমকে সাথী

লিখলো মঞ্জরীকে।

লিখলো—"কেন জানিনা যাবার বেলায় তোকে একবার দেখার বড়ো ইচ্ছে হচ্ছিলো। শুনে হাস্‌বিনা

তো—আমি এখন "তুলসীর মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন।" মুখ্যু মানুষ ঠিক ক'রে বোঝাতে পারবো না, তবু অনেক ভেবে ভেবে দেখে কি বুঝেছি জানিস্? মানুষের অন্তরাত্মা চিরদিন কখনো ধূলোমাটি নিয়ে ভুলে থাকতে পারেনা, সে অনবরত যা ভালো, যা সৎ, যা পবিত্র, তার জন্যেই মাথা কুটে মরছে।···থিয়েটার ক'রে ক'রে কথাগুলোও থিয়েটারী হয়ে গেছে, না রে? যাক্, তোর কাছে লজ্জা নেই। মনে হয়, হয়তো আনন্দকুমার, নিশীথ রায়দের মধ্যেও চলেছে এই মাথা কোটাকুটি, শুধু বুঝতে পারেনা ব'লে উল্টো রাস্তা ধরেই ছুটছে। তাই বলি, কেউ কারো বিচার করতেই বসি কেন? সে বিচারকের আসনটা আমাদের দিলো কে? বিচার ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাসের পথ ধরলে একদিন হয়তো সবই সহজ হয়ে যাবে।'

ভেবেছিলো আরো লিখবে। লিখবে, "ত্যাগ আর পবিত্রতা, এর কাছে হার না মেনে উপায় নেই কারো। আমি যদি এদের চাকরি ছেড়ে' দিয়ে অন্য কোম্পানীর ঘরে চাকরি নিতে যেতাম, ম্যানেজার নির্ঘাৎ আমাকে গুণ্ডা দিয়ে খুন করতো, এখানে শুধু মনে মনে ব্যাজার হয়েই থামলো! এই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি"—কিন্তু এতো কথা আর লিখলোনা। লেখার অভ্যাস নেই, ওইটুকুতেই আঙুল ব্যথা করছে।

বম্বে থেকে কলকাতা!

সরীসৃপের মতো বুকে-হাঁটা, সকল-মাটি মাড়ানো রথে যতোই সময় লাগুক, আকাশ-রথে উড়ে আসতে ক'ঘণ্টাই বা? উড়ে এসে বনলতাকে ধরা যাবে না? বলা যাবে না তাকে—এ দীক্ষা তুমি মঞ্জরীকে দাও না?

চিঠিখানা হাতে নিয়ে নন্দপ্রকাশজীর কাছে

আবেদন করতে গেলো মঞ্জরী। চিঠিটা খাম থেকে টেনে বার করলোনা, শুধু বললো, 'এক বিশেষ বন্ধুর মারাত্মক অসুখ, না গেলে চলবে না। আজ হ'লে আজই।'

'প্লেনে?'

'অবশ্যই।'

বিরক্ত নন্দপ্রকাশ সবিদ্রূপে জানালেন, প্যাসেজ জোগাড় করা অতো সোজা নয়। মঞ্জরী বিনীত ভঙ্গিতে বললো, নিতান্ত না পাওয়া যায়, অগত্যা কাল। তিনিই করুন না সাহায্য, যাতে সোজা হয়।

সোজা হবার মন্ত্র টাকা।

সকল ইচ্ছা পূরণেরও মন্ত্র।

যেখানে-সেখানে সে মন্ত্র আওড়াতে পারলেই সব পথ সুগম।

পরদিন ভোরেই আকাশে উড়লো মঞ্জরী।

বনলতার সঙ্গে একবার দেখা করবার তরেও বড়ো ইচ্ছে।

কিন্তু নাঃ। সব ইচ্ছে আবার টাকাতেও পূরণ হয়না।

এসে দেখলো বনলতার ফ্ল্যাটে তালা ঝুলছে। গত-কাল ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বাসা উঠিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে সে। বাড়ীর পুরনো দরোয়ানটা আছে, সেলাম ক'রে জানালো—না, ঠিকানা কিছু রেখে যায়নি বনলতা।

জনম্ জনমকে সাথী

স্তব্ধ হয়ে এই তালা-বন্ধ দরজাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মঞ্জরী। দরজাটা যেন মঞ্জরীর ভাগ্যের প্রতীক। তার পৃথিবীর চেহারাটাও ঠিক এমনি।

কতোদিনের জন্মেই বা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছলো মঞ্জরী? সময়ের সমুদ্রে ছোট একটু বুদ্বুদ! তবু কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে চারদিক চেয়ে চেয়ে মঞ্জরীর মনে হয় যেন কতো যুগ-যুগান্তর পরে আবার এই স্বর্গে এসে পৌছেছে, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখছে।

কলেজ ষ্ট্রীট, কালীতলা, মেডিক্যাল কলেজ, পাশের দিকে ওই বইয়ের দোকানগুলো……বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের ওই বাস-স্টপেজটা…সরবতের দোকান…ষ্টেশনারি দোকান—সব ঠিক আছে, সব তেমনি আছে। আশ্চর্য্য। সকলে যেন পরিচিত আত্মীয়ের মতো সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে—'এই যে, এসো? কোথায় ছিলে এতোদিন?'

সত্যি, কোথায় ছিলো এতোদিন মঞ্জরী?

সেটা কি একটা দেশ? না সবটাই স্টুডিও?

মঞ্জরীর কাছে সমস্ত দেশটাই প্রাণহীন মমতাহীন, শুধু অখণ্ড একটা স্টুডিওর মূর্ত্তিতে ধরা দিয়েছে। তার বেশী আর কিছু নয়। এখানে সর্ব্বত্র প্রাণের স্পর্শ। এর সবখানে মঞ্জরীর সমস্ত সত্তা অনু-পরমাণু হয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে আছে। এখানে আশা জাগে, হয়তো আবার বাঁচা যায়।…হয়তো আজ মঞ্জরীর জন্মে জায়গা আছে এখানে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা অনেকক্ষণ একটানা চালিয়ে চলেছে, কোনো প্রতিবাদ আসেনি পিছন থেকে, না এসেছে কোনো নির্দ্দেশ। এবার সে নিজেই প্রশ্ন করে গন্তব্যস্থলটা কোথায়?

আর সেই অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে ঠিকানাটা ব'লে বসে মঞ্জরী, এক মিনিট আগেও কি ভেবেছিলো সেখানে যেতে চাইবে সে?

হাতের ঢিল আর মুখের কথা। ফেরে না।
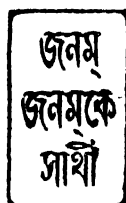
কিন্তু বিশেষ সেই মোড়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছোতেই নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, মুখের কথাটা ফিরিয়ে নেবার জন্যে প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে মঞ্জরী—'ঘুম্‌কে ঘুম্‌কে, ইধার নেহি।'

'তব্ কাঁহা ?'

গাড়ীর গতি মন্থর ক'রে চালক বিরক্তস্বরে প্রশ্ন করে—তাকে ভালো ক'রে ব'লে দেওয়া হোক্ অতঃপর কোথায় যেতে হবে।

এইটুকু অবসর।

গাড়ীর এই মন্থরতার অবসরে জানলা দিয়ে মাথাটা বার ক'রে চুপিচুপি একবার দেখে নেওয়া যায়না সেই পুরনো তিনতলা বাড়ীখানার দোতলার জানলাগুলো খোলা আছে কি না। ঘরের মালিক তো ফিরে এসেছে।

'ছোট বৌদি না ?'

চম্‌কে মাথাটা একবারের জন্যে ভিতরে টেনে নিয়েই সাহস ক'রে আবার মুখ বাড়ালো মঞ্জরী—'কে, শ্রীপদ ?'

শ্রীপদ অসতর্কে একবার উচ্ছ্বসিত উচ্চারণে নামটা ব'লে ফেলেছিলো, এবার আত্মস্থস্বরে বলে, 'আপনি এখানে যে ?'

এখানে অতো মান-সম্মানের প্রশ্ন নেই, কণ্ঠে যদি ব্যাকুল আগ্রহের সুর লাগে তো লাগুক। 'এসেছিলাম এদিকে। শোনো—শোনো, তারপর—তোমাদের খবর সব ভালো তো ?'

শ্রীপদ একটু কঠিন হাসি হেসে বলে, 'আজ্ঞে, তা একরকম সব ভালো বৈকি। মা তো সেই-ইস্তক মেজদাদাবাবুর বাড়ীতেই আছেন, ছোড়দাদাবাবু এতোদিন ধ'রে ভারতবর্ষ পয়লট্ট ক'রে এইবার চললো আমেরিকায়। এতোবড়ো বাড়ীখানার একছত্র রাজা এই শ্রীপদ।'

জনম্ জনমকে সাথী

দাঁড়িয়ে ছুটো কথা কইবার প্রবল ইচ্ছাকে দমন ক'রে সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করে শ্রীপদ। হলোই বা সে চাকর, তবু হ্যাংলা হতে পারেনা।

মঞ্জরী আর-একবার ব্যগ্রভাবে বলে, 'তোমার দেশের বাড়ীর সব খবর ভালো তো?'

যেন সেই চিন্তাতেই মরছিলো মঞ্জরী।

শ্রীপদ তূষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রে বলে, 'হুঁ।'

'এইটে ধরো তো—তোমার ছেলেকে মিষ্টি কিনে দিও।'

ছু'খানা দশটাকার নোট বাড়িয়ে দেয় মঞ্জরী।

শ্রীপদ চম্‌কে উঠে জিভ কাটে। কিছুতেই না, ওসব কি! ছেলের কাছে সে যাচ্ছে কোথায় এখন?

কিন্তু আপত্তির জোয়ারের মাঝখানে এক ফাঁকে সেই মনোরম চিত্রপট ছু'খানি ঢুকেও যায় শ্রীপদর হাফসার্টের পকেটে।

'আমেরিকায় কেন শ্রীপদ?'

'আজ্ঞে, শুনছি নাকি চাকরি করতে। এতো-বড়ো ভারতভূমিতে আর চাকরি জুটলোনা তাঁর। তা তো নয়, এ হলো দেশত্যাগ!'

'কবে যাবেন?'

'কাল।'

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো, দ্রুতপদে আসতে-আসতেও সে দৃশ্য মিলিয়ে গেলো। অনেকটা দূরে এগিয়ে যাচ্ছে তখন গাড়ীটা।

শ্রীপদ কিন্তু তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।
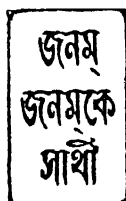
অভিমন্যু বিস্মিত প্রশ্ন করে, 'কার গাড়ী থামিয়ে কথা বলছিলি রে শ্রীপদ ?'

বুকের কাছাকাছি নতুন নোট দুটো খড়খড় করছে।

বুকের ভিতরে হাতুড়ীর ঘা।

তবু অম্লান বদনে উত্তর দেয় শ্রীপদ, 'আমি থামাবো কেন ? ও একজন জিজ্ঞেসা করছিলো, মুক্তরামবাবুর লেনটা কোনদিকে ?'

'তাই ? ও।'

কিন্তু তাছাড়া আর কি হবে। প্রত্যাশায় মানুষ এমন বোকা হয়ে যায়।

চেনা দরোয়ান, প্রচুর বকশিসের লোভ।

বনলতার ঘরটা খুলে দিলো সে মঞ্জরীকে।

আর খোলার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিতর থেকে কে ধাক্কা মারলো। কী ভয়াবহ শূন্যতা। কোথাও কিছু নেই। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র বিলিয়ে দিয়ে ঘর খালি ক'রে দিয়ে চলে গেছে বনলতা। মঞ্জরীর মনের উপযুক্ত ঘর বটে।

না, একটা জিনিস আছে। যেটা বোধকরি বনলতার নয়, বাড়ীর মালিকেরই খাট একখানা। এই সব—এই অনেক। ঘরে খিল বন্ধ ক'রে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদা তো যাবে। মাতালের এলোমেলো কান্না নয়। বেদনার পাত্র উপছে-ওঠা অশ্রুজলহীন গভীর কান্না।

জনম্ জনমকে সাথী

অনেকক্ষণ পরে উঠে বসলো মঞ্জরী।

একমনে মন্ত্র জপ করতে লাগলো, 'হে ঈশ্বর, সাহস দাও। সাহস দাও। দাও সহজ হয়ে সামনে এগিয়ে যাবার সাহস, অপমান সহ্য করবার সাহস,

প্রত্যাখ্যান সইবার সাহস, মৃত্যুর গহ্বর হ'তে মাথা তুলে ফের জীবনকে আহরণ ক'রে নেবার সাহস।'

নিজেকে প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেখেছে মঞ্জরী, দেখেছে যাচাই ক'রে ক'রে। পৌঁছেছে শেষ সিদ্ধান্তে। অভিমন্যুকে অস্বীকার ক'রে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন। অভিমন্যুকে বাদ দিলে মঞ্জরীর পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু নেই। সে পৃথিবী বোবা, বিস্বাদ, মৃত।

অভিমন্যুর অহঙ্কার আর ঈর্ষাকে কেন্দ্র করেই না এতোদিন বিভোর ছিলো মঞ্জরী উচ্ছৃঙ্খলতার আনন্দে, ধ্বংসের উল্লাসে। অভিমন্যুকে 'দেখিয়ে দেবার' জন্যেই তো খ্যাতি আর অর্থের কদর্য্য কুৎসিৎ বোঝাটা কুড়িয়ে তোলবার এই নির্লজ্জ প্রয়াস।

আবার অভিমন্যুর কাছে গিয়ে নিজেকে বিনীত নিবেদনে সমর্পণ ক'রে দেবার জন্যেই তো অন্তরাত্মার এতো মাথা কোটাকুটি।

এখন তবে আর লজ্জা অভিমানের সময় কোথা মঞ্জরীর?

'কে?'

চমকে মুখ ফিরিয়ে আরও একবার বুঝি অস্ফুটে উচ্চারণ করলো অভিমন্যু, 'কে?'

সরানো পর্দ্দার গায়ে একখানি ছবি ফুটে উঠেছে।

নির্ব্বাক, নিশ্চল।

বুঝি জীবন্ত হবার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করছে।

বিদ্যুৎবাতির তীব্র আলোয় শ্যামল মুখটা সাদা দেখাচ্ছে।

অভিমন্যু শুধু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। শুধু
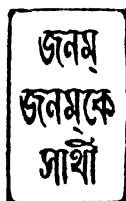
আরো অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'মঞ্জরী।'

আঁকা-ছবি ধীরে ধীরে কাছে এসে হেঁট হয়ে প্রণাম করলো।

এবারে যেন সচেতন হয়ে ওঠে অভিমন্যু, স্নিগ্ধ কোমল স্বরে বলে, 'বোসো।' ব'লে একটা চেয়ার একটু ঠেলে দিলো। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতাও ছিলোনা মঞ্জরীর, তাই বসেই পড়লো। মুখে কথা নেই, কথা শুধু দীর্ঘ পল্লবাচ্ছন্ন দুটি চোখে। দেখে ভয় হচ্ছে—ও বুঝি এখুনি বাষ্পে ফেটে পড়বে, আবেগে ভেঙে পড়বে, কাঁপবে থরথরিয়ে, কাঁদবে আকুল হয়ে। কাঁপছে ঠোঁট, কাঁপছে নাকের পাটা, কাঁপছে হাতের আঙুলগুলো। কিন্তু না। ফেটে পড়লোনা, উপছে পড়লোনা, ব্যস্ত করলোনা অভিমন্যুকে। শুধু চোখ নামিয়ে নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ব'সে থাকলো অন্যদিকে চেয়ে।

অভিমন্যু তেমনি মমতার গলায় আস্তে আস্তে বললো, 'হঠাৎ তোমার এমন ক'রে আসার ইচ্ছে হলো কেন, এ প্রশ্ন করবোনা মঞ্জরী, শুধু মনে হচ্ছে, ঈশ্বর তাহ'লে মাঝে মাঝে আমাদের কথা শুনতে পান। যাবার আগে তোমাকে একবার দেখবার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিলো।'

কেন এতো করুণা! কেন এমন মমতা-বিধুর কণ্ঠ!

মঞ্জরী তো প্রস্তুত হয়ে এসেছিলো সব মান বিসর্জ্জন দিয়ে বলবে, 'আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।' চোখে জল আসতে দেবেনা, দেবেনা গলার স্বরকে কেঁপে উঠতে। শুধু বলবে—'আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।'

শুধু এই কটি শব্দ।

জনম্ জনমকে সাথী

সহস্রবার জপ করেছে এই মন্ত্র। সহস্রবার উচ্চারণ করেছে মনে মনে। ভেবেছিলো চেষ্টা ক'রে আর বলতে হবেনা, ভিতরের উচ্চারিত ধ্বনি আপনিই ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

হলোনা।

তার বদলে শুধু ক্ষীণ রুদ্ধকণ্ঠের এক প্রশ্ন বেরিয়ে এলো, 'অতোদূরে চলে যেতে হচ্ছে কেন?'

'দূর আর কাছে কি! যেখানে হোক্ থাকলেই হলো।'

তা বটে। তা বটে।

কার কাছ থেকে দূরে?

অভিমন্যুই আর-একবার কথা বললো, 'কবে এলে?' মনে ভাবছিলো, সুরেশ্বরই অসাধ্য সাধন করেছে, এনেছে বিয়েতে।

'কাল।'

'ওরা ভালো আছে?'

'কারা?'

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মঞ্জরী।

'চঞ্চলারা?'

'ওদের কথা তো আমি জানি না।'

'ও! কিন্তু যাবার কথা কে বললো তাহ'লে?'

'শ্রীপদ।'

'শ্রীপদ?' মুহূর্ত্তে সকালবেলায় সেই গাড়ী দাঁড়-করানোর দৃশ্যটা মনে প'ড়ে গেলো। সব সরল হয়ে গেলো। সকালেই এসেছিলো মঞ্জরী, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। শ্রীপদ তাড়িয়ে দিয়েছে। নিশ্চয় তাই। করুণায় ভ'রে গেলো মন। তবু মঞ্জরী আবার এসেছে। কেন? ক্ষমা চাইতে? বিদায় সম্ভাষণ জানাতে? ভাবলো অনেক রকম, প্রশ্ন করলোনা।

মঞ্জরী হয়তো অপেক্ষা করছিলো, করছিলো আশা। হয়তো ভাবছিলো, অভিমন্যু শেষপর্য্যন্ত প্রশ্ন করবেই,

'তুমি এসেছো কেন বলো মঞ্জরী ?'

না, অভিমন্যুও চুপ ক'রে আছে।

সবলে সমস্ত দ্বিধা ঠেলে উঠে এলো মঞ্জরী, খুব কাছে। বললো, 'আমাকে সঙ্গে নেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ?'

মুহূর্ত্তের জন্য একবার চম্‌কে উঠলো অভিমন্যু।

চম্‌কে উঠে তাকিয়ে দেখলো মঞ্জরীর মুখের দিকে। দেখলো সামনের দেয়ালের আলোটা এসে পড়েছে ওর চুলে, কপালে, বাহু-মূলে। ঠিক যেমন ক'রে পড়তো অনেকদিন আগে, রাতে শুয়ে পড়বার আগে যখন হয়তো একটুখানির জন্যে বেতের এই চেয়ারটায় বসতো, আর বসা থেকে উঠে আসতো। তেমনি ঝুরো ঝুরো ক'টা চুল উড়ছে রগের পাশে, তেমনি সুগঠন কণ্ঠ ঘিরে সরু একটু হার, তেমনি সুকুমার ভঙ্গিটি।

তাকিয়ে দেখলো ঘরের চারদিকে। অবিকল তেমনি।

কোথাও কোনো পরিবর্ত্তন নেই। নতুন ক'রে কেউ গোছায়নি এ ঘর। দেয়ালের পাশে বইয়ের র‍্যাকটা আর ঘরের মাঝখানে টেবিলটা তেমনি অনড় হয়ে ব'সে আছে, এলোমেলো হাওয়ায় জানলার পর্দ্দাগুলো তেমনি ছুটোছুটি করছে। কোথাও কোনো বিচ্যুতি নেই। শুধু মঞ্জরী বিচ্যুত হয়ে গেছে এই কেন্দ্র থেকে।

কিন্তু সে কথা যেন এখন মনে ক'রে মনে আনতে হচ্ছে। মনে মনে বললো—'মঞ্জরী, এতো পরে এলে তুমি ? যখন সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে।'

জনম্ জনমকে সাথী

মুখে বললো আস্তে থেমে, 'সে কি ক'রে হয় ?'

'কিছুতেই হতে পারে না ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আর সময় কোথা ?

এতো পরে এলে তুমি ?'

মঞ্জরী প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছে কিছুতেই বিচলিত হবেনা, তাই স্বচ্ছ দুটি চোখ তুলে ঠাণ্ডাগলায় বললো, 'তুমিও তো কোনোদিন ডাকোনি !'

তাই বটে। তাই বটে।

অভিমন্যুও তো কোনোদিন ডাকেনি। বহে-যাওয়া অতীতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো অভিমন্যু। সেখানে কি সঞ্চিত ছিলো ? ঘৃণা ? বিতৃষ্ণা ? না, না, সেখানে ছিল খালি সর্ব্বগ্রাসী একটা লজ্জার যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার হাত এড়াতেই শুধু চেষ্টা করেছে এখান থেকে পালাবার—ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, আত্মীয়সমাজ ছেড়ে, পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে !

উত্তর দিতে ভুলে গেছে অভিমন্যু, শুধু জানলার দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তার গভীরে ডুবে। মনে হচ্ছে, পর্দ্দাটার ওই ছুটোছুটিই দেখছে বুঝি !

সময়সমুদ্রের কণা কণা জলবিন্দু ঝরে পড়ছে একটি একটি ক'রে। দেয়ালঘড়ির কাঁটাটায় তার সঙ্কেতধ্বনি।...

'যাই !'

একটু সরে গেলো মঞ্জরী।

চলে যাবে ? চলে যাবে ? এখনি মিলিয়ে যাবে ওই ছবিখানি। এখনি শূন্য হয়ে যাবে সব ? আর কোনোদিন এঘরে ওর ছায়া পড়বে না ?

ওই জলভারাবনত দুটি চোখ আরো নামিয়ে নিয়ে,

মাথা নীচু ক'রে চলে যাবে ঘর ছেড়ে। নেমে যাবে সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে রাস্তায়! থেমে যাবে ক্ষীণ অস্পষ্ট ভীরু পদশব্দটুকু, পথের অরণ্যে হারিয়ে যাবে পাত্‌লা হাল্‌কা ওই তনুখানি!

কী অদ্ভুত হবে সেই হারিয়ে যাওয়া!

অথচ এখনি সব সহজ হয়ে যেতে পারে।

না, তা হয়না।

সমস্ত প্রাণ আছ্‌ড়ে মরলেও হয়না।

সহজ হওয়াই বুঝি সবচেয়ে কঠিন।

কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে আর-একবার নীচু হয়ে প্রণাম করলো মঞ্জরী, ইতস্ততঃ করলো একটু, তারপর দরজার পর্দ্দাটা সরিয়ে বেরিয়ে গেলো আস্তে আস্তে।

'মঞ্জরী!'

সিঁড়ির শেষপ্রান্তে বাইরের দরজার কাছে এসে চম্‌কে পিছনে চাইলো মঞ্জরী। দেখলো ব্যাকুল দুটি চোখের কোমল দৃষ্টি।

'চলো! তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এবার একটু হাসলো মঞ্জরী।

'একলাই তো এসেছিলাম!'
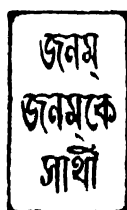
কিন্তু এ কী! এ কি ভূমিকম্প? সারা শরীরে এ কিসের আলোড়ন মঞ্জরীর। না, ভূমিকম্প নয়, কাঁধের উপর আল্‌তো একখানি হাতের স্পর্শ!

হাতের অধিকারীও কাঁপছে।

'একলাই তো এসেছিলাম!'

তাই বটে! তাই বটে! একলাই এসেছে ও।

আবার একলাই চলে যাবে ওই রাত-হয়ে-আসা ঝিম্‌ঝিমে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা রাস্তাটা ধ'রে। ধীর স্থির পুরুষচিত্তেও আলোড়ন ওঠে বৈ কি!

'মঞ্জরী, চলো—' আগ্রহ-ব্যাকুলস্বরে বলে অভিমন্যু, 'আমার সঙ্গেই চলো। নতুন পরিবেশে নতুন পরিচয়ে আবার নতুন ক'রে জীবন সুরু করি আমরা। নতুন ক'রে বেঁচে উঠি।'

মঞ্জরী একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'না! পালিয়ে গিয়ে নতুন ক'রে বাঁচতে চাওয়া তো হার মানা! হার মানতে চাইনা। পুরনো পরিচয়ের মধ্যে থেকেই নতুন ক'রে বাঁচতে চাই আমি। আগে বুঝতে পারিনি তাই বৃথা বিরক্ত ক'রে গেলাম তোমায়।'

'মঞ্জরী!'

সিঁড়ির রেলিঙে-রাখা মঞ্জরীর ডান হাতখানার উপর একটা হাত রাখলো অভিমন্যু, হৃদয়ের উত্তাল উত্তাপ যেন ওই আবেগ স্পর্শটুকুর মধ্যেই সীমায়িত হয়ে আছে।

'মঞ্জরী! আমি যাবোনা।'

মঞ্জরী সেই আরক্ত উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে চেয়ে দেখলো একবার, স্মরণ করলো অবিচলিত থাকার প্রতিজ্ঞা। অভিমানশূন্য শান্তগলায় বললো, 'তা হয়না। ঝোঁকের বশে এতোটা মূল্য দিতে চেয়োনা। তাতে দুঃখ আছে। করুণা নয়, দয়া নয়, কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজনে যদি কোনোদিন বিনা দ্বিধায় ডাক দিতে পারো, সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা করবো।'

জনম্ জনমকে সাথী

'বিশ্বাস করো মঞ্জরী, কোথাও কোনোখানে দ্বিধা নেই। শুধু তুমি এতো অসময়ে এলে—'

মঞ্জরী আস্তে আস্তে অভিমন্যুর ধরা হাতখানা টেনে নিয়ে মৃদুগলায় বললো, 'বিশ্বাস করছি। আর সময়ের জন্যে প্রস্তুত হবো।'

'এখন তবে তুমি কি করবে?'

'এখন? যে মঞ্জরী তোমার লজ্জার না হয়ে গৌরবের হ'তে পারবে, তাকে গড়বার সাধনায় সুরু করবো কর্ম্মের তপস্যা।'

বিরাট পক্ষীদেহ নিয়ে মাঠজোড়া ক'রে শুয়েছিলো আকাশচারি রথখানা। সময়ের সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগলো তার সর্ব্বাঙ্গে, জাগলো কম্পন। কাঁপতে কাঁপতে ঘুরতে সুরু করলো 'প্রপেলার' দু'খানা। বাতাস কেটে কেটে আকাশের বুক চিরে চালিয়ে নিয়ে যাবে ওরা বিরাট পক্ষীদেহটাকে।

একটু একটু ক'রে উঠছে মাটি ছেড়ে—উঁচুতে—আরো উঁচুতে। উঠবে মেঘ ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে!

এই আকাশরথে উঠে বসেছে অভিমন্যু, মঞ্জরী দেখছে দূরে থেকে। না, আর দেখা দেবে না। শুধু দেখবে।

অনেক দূরে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু ক'রে দেখছে—অনেক মানুষ আর অনেক বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত যন্ত্রটা কেমন সহজে উঠে গেলো আকাশে। এরপর দুরন্তবেগে এগিয়ে যাবে অনন্ত সমুদ্র ডিঙিয়ে, ডিঙিয়ে পাহাড় অরণ্য আর জনপদ।

পৌঁছে যাবে পৃথিবীর ও-প্রান্তে!

(শেষ)